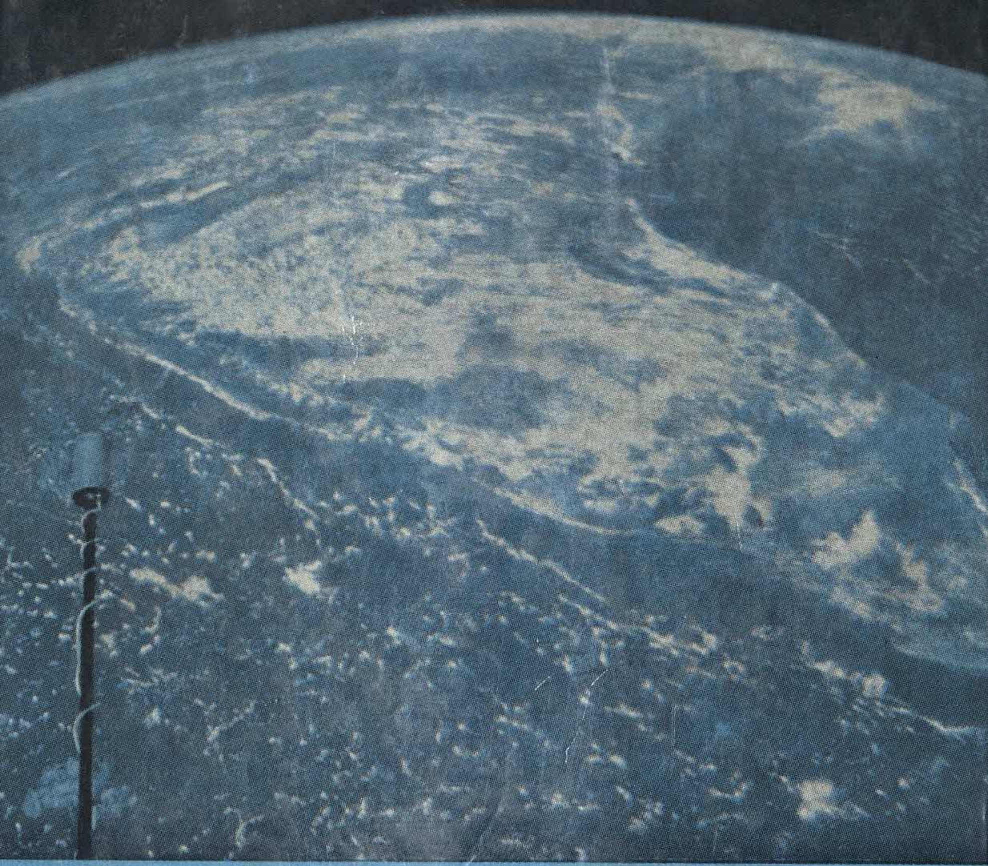


মহাকাশের কথা

শঙ্কর চক্রবর্তী

মহাকাশের কথা

শঙ্কর চক্রবর্তী

বেষ্ট বুক্‌স্

১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

Mahakasher Katha
By Sankar Chakrabarty

প্রথম প্রকাশ ঃ

ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮

প্রকাশক ঃ

বেস্ট বুক্‌স্
১এ কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর ঃ

শ্রীঅনাদিচরণ জানা
গুপ্তপ্রেশ
৩৭/৭, বেণিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯

কভার ছেপেছেন ঃ

দি মডার্ণ প্রসেস
১৩, কলেজ রো,
কলিকাতা-৭০০০০৯

ত্রিশ টাকা (৩০'০০)

উৎসর্গ

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের

পরম স্নেহভাজন তরুণ সহকর্মীদের

প্রচ্ছদপটে ভারত ভূখণ্ডের ছবিটি মহাকাশযান স্কাইল্যাবের ক্যামেরায় মহাকাশের বুক থেকে ধরা পড়েছিল।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

মহাকাশে মানুষের জয়যাত্রা

পৃথিবীর কথা (দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত)

মহাবিশ্বে আমরা কি নিঃসঙ্গ (” ” ”)

চন্দ্র অভিযান (” ” ”)

আকাশের কথা

মানুষ ও কয়েকটি সামাজিক প্রাণী (দ্বিতীয় সংস্করণ)

মহাকাশের বুকে পৃথিবী

ভূমিকা

মহাকাশের অতলান্ত রহস্য যুগের পর যুগ ধরে মানুষের মনকে নাড়া দিয়েছে। মহাকাশচারী হবার বাসনায় মানুষের প্রাথমিক প্রচেষ্টাগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রথমে সে জয় করল বায়ুমণ্ডলকে। তারপর রকেট যন্ত্রের মাধ্যমে শুরু হল তার বায়ুহীন মহাকাশে অভিযানের ক্রমপর্যায়।

মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে ১৯৫৭ সালের চৌঠা অক্টোবর তারিখটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, যেদিন মানুষ পৃথিবীর জল, মাটি ও বায়ুমণ্ডলকে পেরিয়ে মহাকাশে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহকে প্রতিষ্ঠা করেছিল। মহাকাশের অঙ্গন আজ কর্মমুখর। দুই সহস্রাধিক কৃত্রিম উপগ্রহ তাদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কার্যক্রমকে নিয়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করে চলেছে।

মহাকাশে মানুষের পদার্পণ ঘটল যেদিন, সেদিন থেকে শুরু হল আর এক নতুন অধ্যায়। মানুষের পদচিহ্ন পড়েছে চাঁদের বুকেও। অনুসন্ধানী মহাজাগতিক গবেষণাগার নেমেছে শুক্র ও মঙ্গলের জমিতে। বৃহস্পতি, শনি ও ইউরেনাসের পাশ কাটিয়ে ওরা হয়েছে আরো সুদূরের যাত্রী।

'মহাকাশের কথা' বইটিতে মহাকাশ বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি, কৃত্রিম উপগ্রহদের বৈজ্ঞানিক অবদান চাঁদে, অভিযান ও তার বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর তথ্যনির্ভর বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থটির পূর্বসূরী হল 'চন্দ্র অভিযান'। সে বইটির বিষয়বস্তু বহুলভাবে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আকারে এ গ্রন্থে প্রকাশিত হল। বইটি প্রকাশের ব্যাপারে আমার পরম স্নেহভাজন বেষ্ট বুক্‌সের স্বত্বাধিকারী শ্রীবিন্দু ভট্টাচার্য যে উদ্যোগ নিয়েছেন, তা বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ।

শঙ্কর চক্রবর্তী

২৮৯/সি বাপুজী নগর
কলিকাতা-৭০০০৯২

২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮

সূচীপত্র



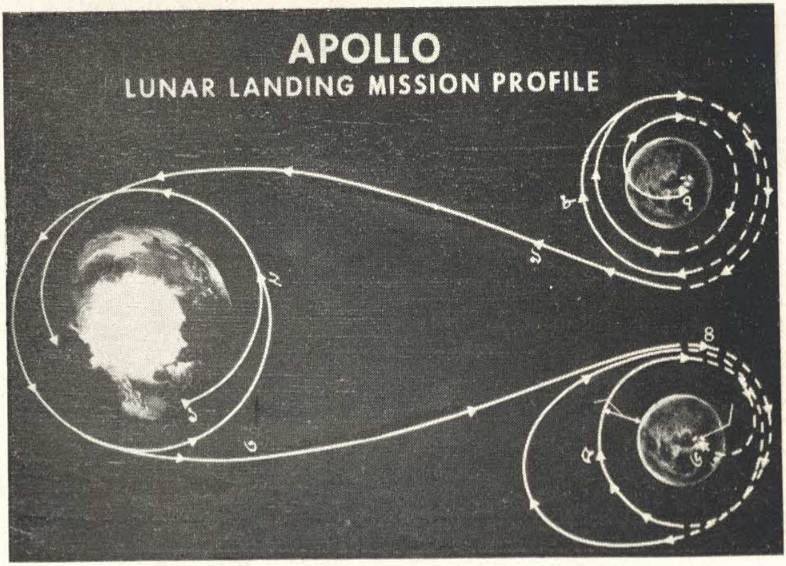
পৃথিবীর প্রথম মহাকাশযাত্রী ইউরি গাগারিন ও প্রথম নারী মহাকাশযাত্রী ভ্যালেন্তিনা তেরেসকোভা।



পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগ থেকে প্রায় ৮০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে পরিক্রমারত মহাকাশযান স্কাইল্যাবের ক্যামেরায় প্রায় গোটা হিমালয় পাহাড়টাই ধরা পড়েছিল।



মহাকাশের বুক থেকে তোলা ছবি। গঙ্গা নাবছে হিমালয় থেকে। দু-পাশ থেকে বিভিন্ন শাখানদী এসে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হচ্ছে।



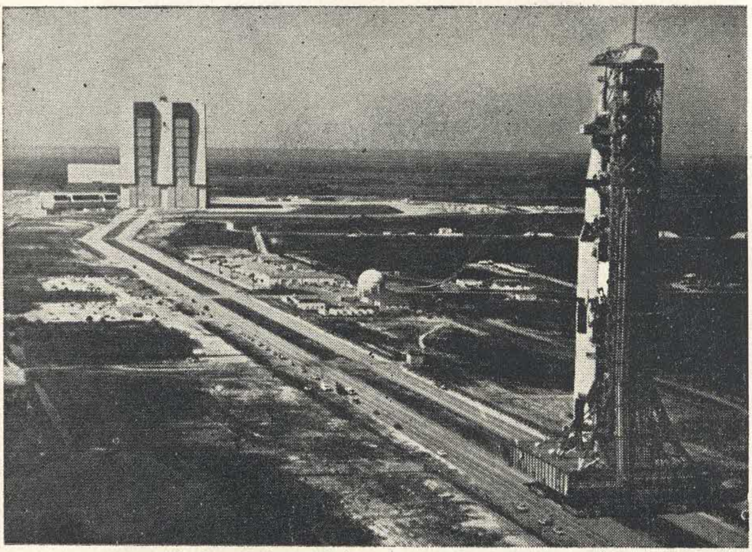
অ্যাপোলো মহাকাশযানকে এক লম্বা উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘণ্টায় ৪০০০০ কিলোমিটার বেগ নিয়ে পৃথিবী থেকে চাঁদে পাড়ি জমাতে হয়েছিল।



চাঁদের প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে পরিক্রমারত অবস্থায় চাঁদের বিশাল চেহারার মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখগুলো অভিযাত্রীদের কাছে যেভাবে ধরা পড়েছিল।



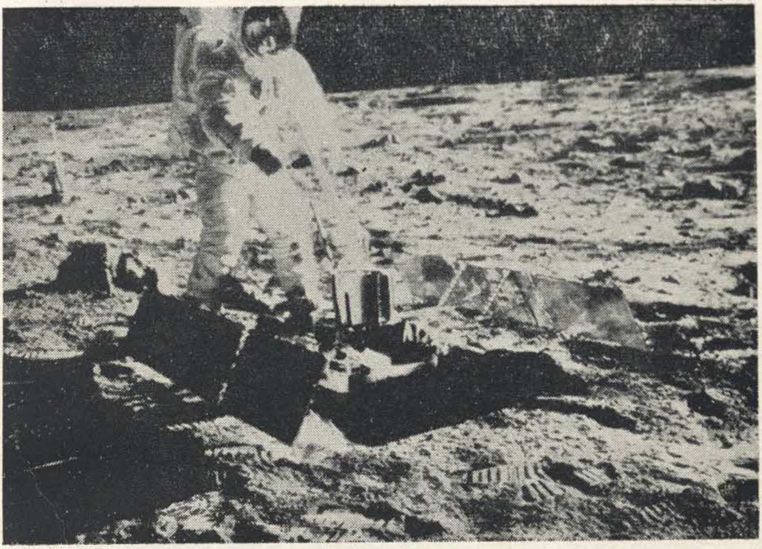
চাঁদের উল্‌টো পিঠের ওপর দিয়ে পরিক্রমার সময় এই বিশাল চেহারার মৃত জ্বালামুখটি ধরা পড়ে। এর ব্যাস প্রায় ১০০ কিলোমিটার এবং উচ্চতা চার কিলোমিটার।



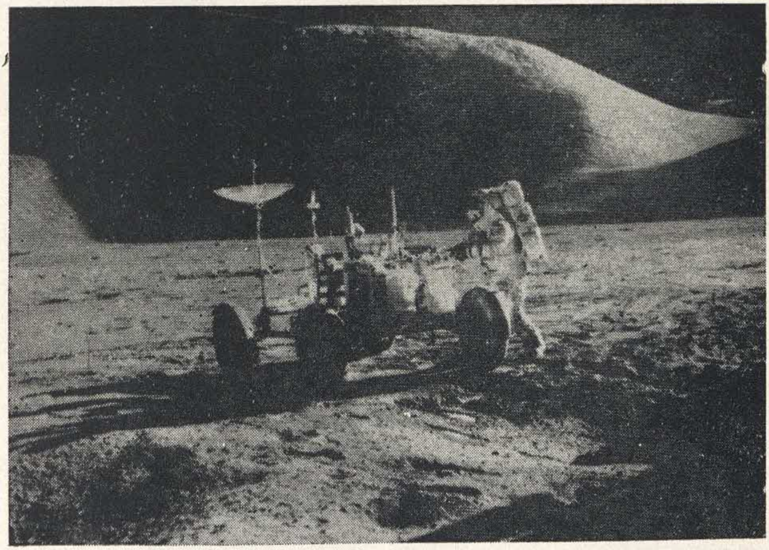
মহাকাশচারী স্যাটার্ন-৫ রকেট মহাকাশবন্দরে ক্ষেপণ মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। মহাকাশে মানুষকে পৌঁছে দিয়েছে এই রকেট।



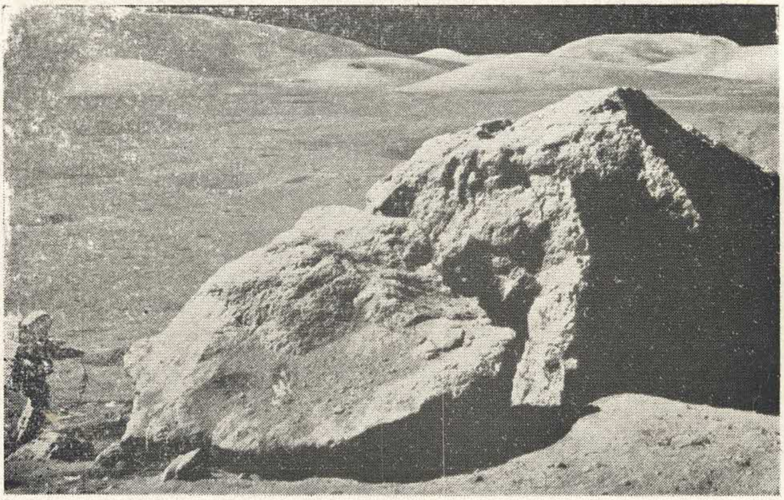
অ্যাপোলো-১১ মহাকাশযানের অভিযাত্রী অলড্রিন; চাঁদের বায়ুহীন পরিবেশে বিপদসংকুল মহাকাশ রশ্মিদের হাত থেকে প্রাণরক্ষার জন্যে এক বিচিত্র পোষাক তাঁকে পড়তে হয়েছে।



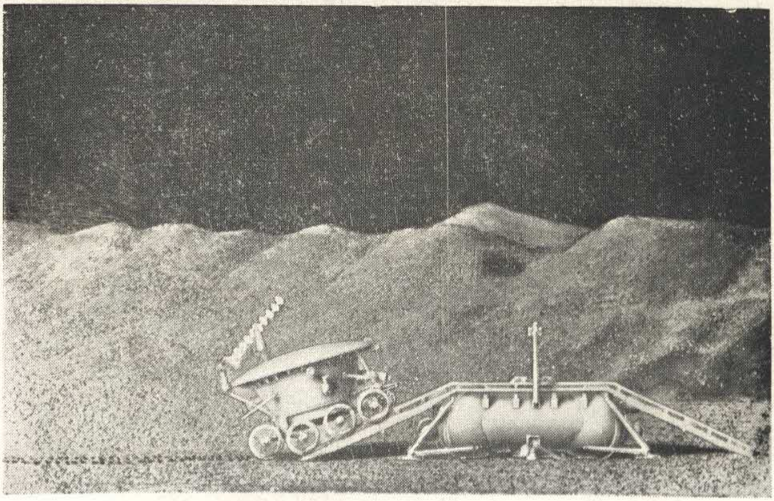
মহাকাশযাত্রী অলড্রিন ও চাঁদের জমিতে নামানো কিছু অনুসন্ধানী যন্ত্রপাতি। চাঁদের পৃষ্ঠভাগের ওপর মানুষের পদচিহ্ন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।



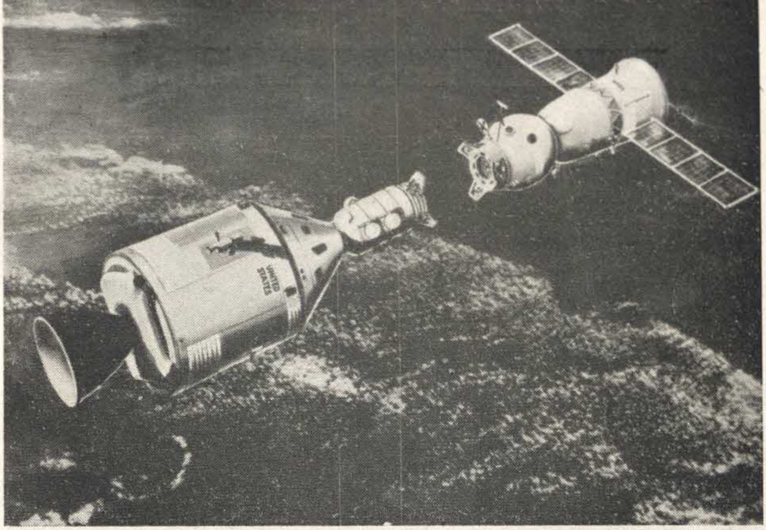
অ্যাপোলো-১৫-র অভিযাত্রী জেম্‌স্‌ আরউইন চন্দ্রপৃষ্ঠে লুনার রোভারের (চান্দ্র শকট) পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। এই শকটে চড়ে চাঁদের জমির এক বিস্তৃত অঞ্চলের ওপর তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। চাঁদের দিগন্তের কাছে হ্যাডলি পাহাড়।



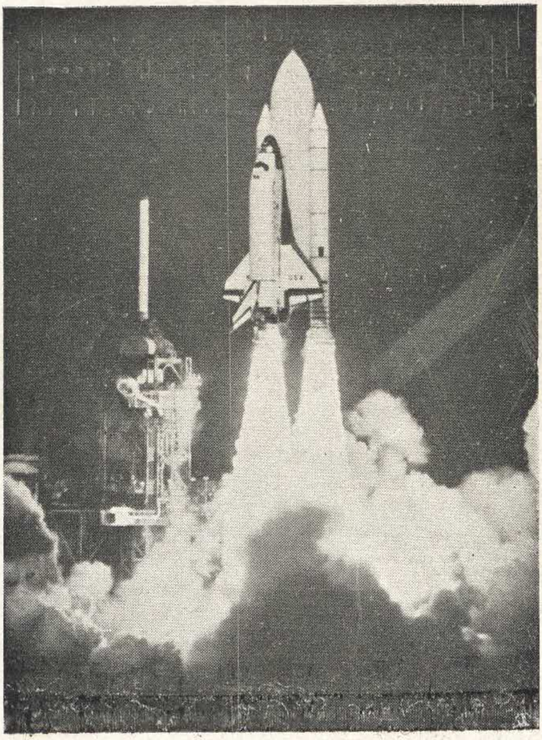
চন্দ্রপৃষ্ঠে অ্যাপোলো-১৭-র অভিযাত্রী স্মিট একটি বিশাল খণ্ডিত চান্দ্রশিলার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।



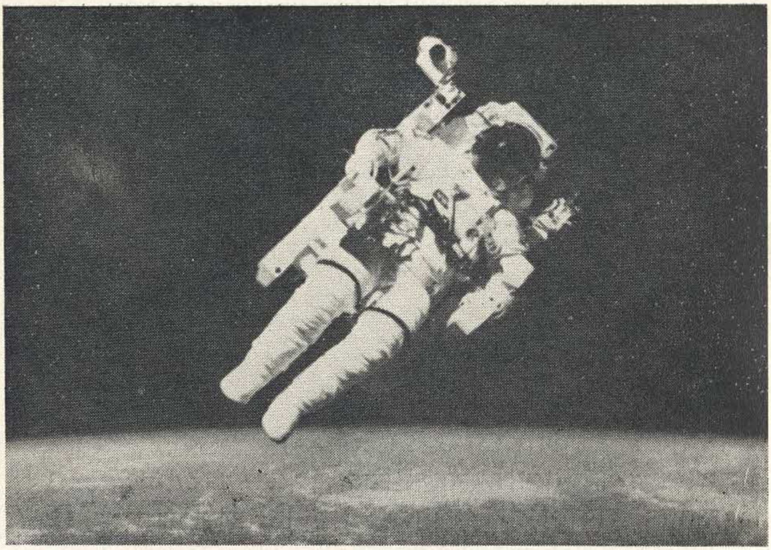
চন্দ্রযাত্রী স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযান লুনাখোদ-১ পৃথিবী থেকে বেতার সংকেতের নির্দেশে বাহক রকেটের ওপর থেকে চাঁদের জমিতে নেমে আসছে।



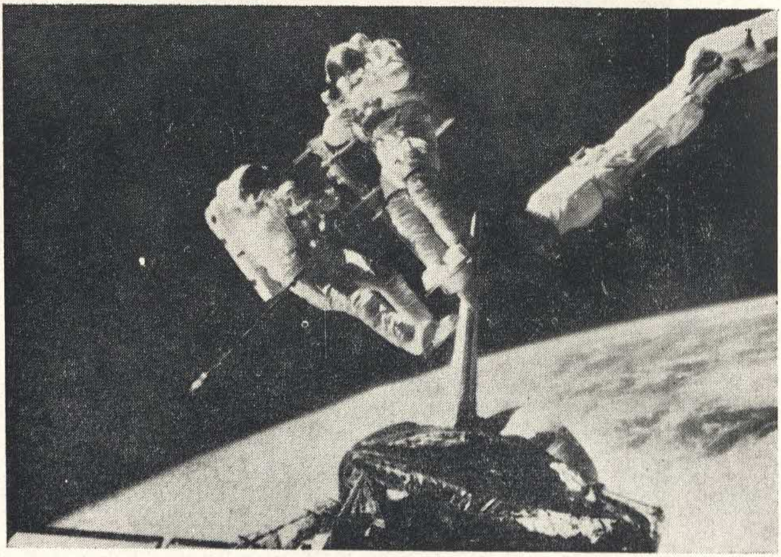
১৯৭৫ সালের ১৭ই জুলাই সোভিয়েট ইউনিয়ন ও আমেরিকার দুই মহাকাশ-যান সইয়ুজ ও অ্যাপোলোর মধ্যে সংযুক্তিসাধন ঘটে ও দুই দেশের অভিযাত্রীরা মিলিতভাবে মহাকাশে নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করেন।



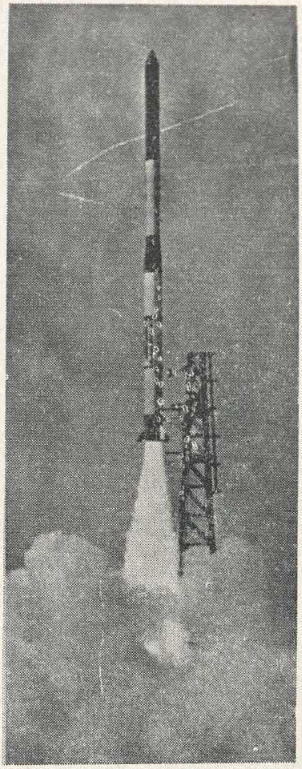
স্পেস সাট্‌ল্‌ (মহাকাশযান) কলম্বিয়া কেপ ক্যানাভেরাল মহাকাশ-বন্দর থেকে মহাকাশে পাড়ি জমাচ্ছে।



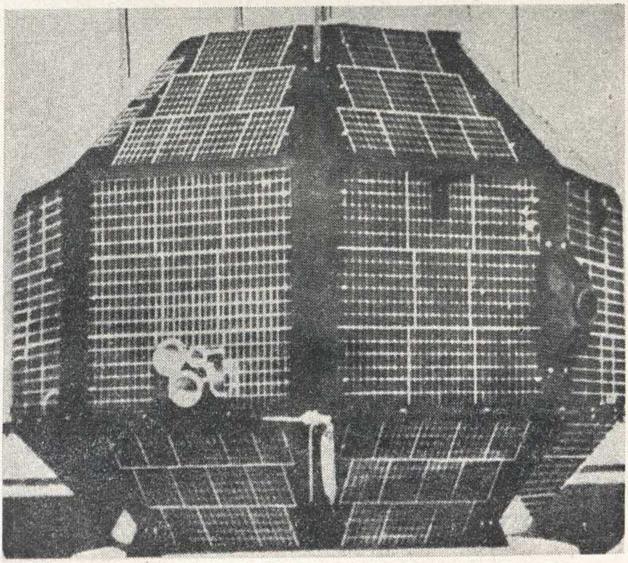
মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহরূপী প্রথম মানুষ। মহাকাশযান স্পেস সাট্‌লের অভিযাত্রী ব্রুস ম্যাকক্যাণ্ডলেস মহাকাশে হাঁটছেন ; ঘণ্টায় প্রায় ২৯০০০ কিলোমিটার বেগে পৃথিবীর চারদিকে পরিক্রমা করে চলেছেন তিনি।



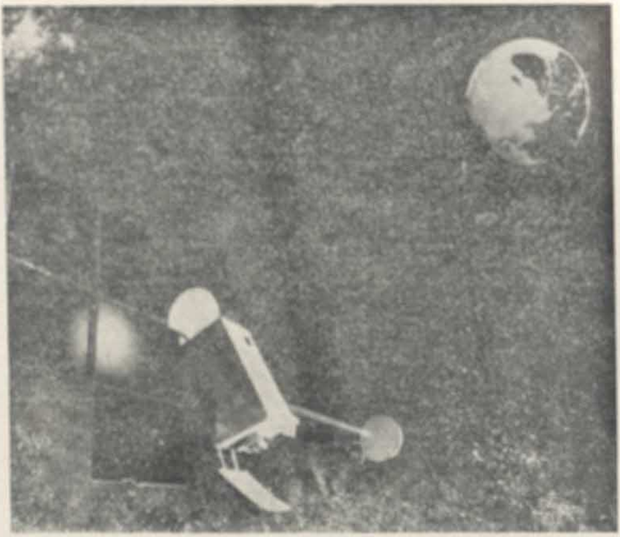
স্পেস সাট্‌লের দুই অভিযাত্রী ডেল গার্ডনার এবং জোসেফ অ্যালেন মহাকাশে ভাসমান অবস্থায় মহাকাশযানের যান্ত্রিক ত্রুটিকে মেরামত করছেন।



ভারতীয় বিজ্ঞানীদের নিজস্ব পরিকল্পনায় তৈরি এস-এল-ভি-তিন রকেট। ভারতের চতুর্থ ও পঞ্চম কৃত্রিম উপগ্রহ রোহিনী-১ ও রোহিনী-২-কে এ মহাকাশে পৌঁছে দেয়।



ভারতের প্রথম উপগ্রহ আর্যভট্ট। ১৯৭৫ সালের ১৯শে এপ্রিল একটি সোভিয়েট বাহক রকেটের সাহায্যে সোভিয়েট মহাকাশবন্দর থেকে এ পাড়ি জমায়।



ইনস্যাট-১-এ। পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩৬০০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এজাতীয় একটি ভূ-সমলয় (জিওসিনক্রোনাস) কৃত্রিম উপগ্রহ গোটা ভারতবর্ষের বেতার ও টেলিভিশন যোগাযোগ ব্যবস্থাকে চালু রাখতে পারে।



প্রথম ভারতীয় মহাকাশযাত্রী রাকেশ শর্মা ও তাঁর দুই সোভিয়েট সহযাত্রী ইউরি মালিসেভ এবং গেনাডি স্ট্রেকালভ।

১

গোড়ার কথা

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখটি বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরদিন সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। ঐদিন মানুষ সর্বপ্রথম পৃথিবীর জল মাটির ঊর্ধ্বে', বায়ুমণ্ডল পেরিয়ে মহাকাশে পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহকে প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটির কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা। তাঁরা ঐ কৃত্রিম উপগ্রহটির নাম দিয়েছিলেন 'ইস্কুস্ত্ভেনি স্পুত্নিক জেম্‌লি'। এটি রুশ ভাষার কথা, বাংলা অর্থ হল 'পৃথিবী-প্রদক্ষিণকারী কৃত্রিম সহযাত্রী'। পৃথিবীর একটি স্বাভাবিক সহযাত্রী বা উপগ্রহ হল চাঁদ। সেই চাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বস্তুটিকে ছোটানো হয়েছিল, তাই ওর নাম রাখা হয়েছিল 'কৃত্রিম সহযাত্রী'। ছোট একটি কথায় বস্তুটি সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে পরিচিতি লাভ করল। কথাটি হল স্পুট্‌নিক।

পৃথিবীর ঐ প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ এবং তারপর গত তিরিশ বছর ধরে প্রধানত সোভিয়েট ইউনিয়ন ও আমেরিকার বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় এ পর্যন্ত যে আড়াই হাজারেরও বেশি কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর বিভিন্ন কক্ষপথে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, ওরা সবাই হল উড়ন্ত গবেষণাগার। (পৃথিবীর আরো কয়েকটি দেশের মত ভারতীয় বিজ্ঞানীরাও সোভিয়েট ও আমেরিকার বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়েছেন।) ওদের ভেতরে ছিল নানাধরণের স্বয়ংক্রিয় অনুসন্ধানী যন্ত্রপাতি। ঐ সব যন্ত্রপাতির কলকাঠি নড়াচড়া করে কৃত্রিম উপগ্রহেরা পৃথিবী, সূর্য ও মহাকাশ সম্বন্ধে অগণিত বিজ্ঞানের তথ্য সংগ্রহ করে বেতার-সঙ্কেতে রূপান্তরিত করে মহাকাশ থেকে বিজ্ঞানীদের তথ্যসংগ্রহকারী কেন্দ্রগুলোতে ফেরত পাঠিয়েছে।

অসীম মূল্যবান অগণিত ঐ সব তথ্যের মাধ্যমে জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে নব-নব দিগন্ত উন্মুক্ত হয়েছে। নতুন জ্ঞানের ভগীরথরূপী কৃত্রিম উপগ্রহদের

দ্বারা সংগৃহীত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্যের মাধ্যমে বিজ্ঞানজগতের বহু পুরনো ধারণা আজ বাতিল হতে চলেছে। এতে আমাদের কোন আপত্তিই নেই। কারণ পুরনো জ্ঞানের ঝুলিকে চিরকাল আঁকড়ে বসে থাকব, এমন দাসখত আমরা কাউকেই লিখে দিই নি।

মহাকাশ অভিযানের যে যুগ তিরিশ বছর আগে শুরু হয়েছিল, আজ তা কী বিপুল পরিমাণেই না সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। পৃথিবী থেকে শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণার যন্ত্রপাতি নিয়ে কৃত্রিম উপগ্রহের দলই নয়, বহু অ্যাস্ট্রোনট বা মহাকাশযাত্রী মানুষ বিভিন্ন কক্ষপথে পৃথিবীকে পরিক্রমা করে নিরাপদে ফিরে এসেছেন। মহাকাশে সম্পূর্ণ ওজনবিহীন অবস্থায় মহাকাশযাত্রীদের দীর্ঘ সময় যাপনের মধ্য দিয়ে জীববিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বহু অজ্ঞাত প্রশ্নের উত্তরও খুঁজে পাওয়া গেছে।

মহাকাশ-অভিযানের এক পর্যায়ে পৃথিবীর স্বাভাবিক উপগ্রহ চাঁদ বিজ্ঞানীদের লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পৃথিবী থেকে একদল স্বয়ংক্রিয় বৈজ্ঞানিক স্টেশনকে তাঁরা রকেটের মাথায় চড়িয়ে পাঠালেন, যারা সোজা গিয়ে চাঁদের জমির ওপর আছড়ে পড়ল। এদেরই আর এক দলকে তাঁরা চাঁদের জমিতে অক্ষতভাবে নামিয়ে বসলেন এবং আরো কয়েকটিকে চাঁদেরই কৃত্রিম উপগ্রহ বা 'ক্ষুদে চাঁদ'রূপে চাঁদের চারপাশে বিভিন্ন কক্ষপথে বসিয়ে দিলেন।

চাঁদে রকেট পাঠিয়ে বিজ্ঞানীরা চাঁদ সম্বন্ধে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করছিল। বোঝা যাচ্ছিল, বিজ্ঞানীদের একটি বড় লক্ষ্য হল চাঁদের মাটিতে মানুষকে নামানো। তার প্রথম ধাপ হিসেবে ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার তিনজন মহাকাশযাত্রী অ্যাপোলো-৮ মহাকাশযানে চাঁদের জমির মাত্র ৯৬ কিলোমিটার উচ্চতায় চাঁদকে পরিক্রমা করে আবার পৃথিবীতে ফিরে এলেন। পরবর্তী মহাকাশ অভিযান অ্যাপোলো-১০ আর এক ধাপ এগিয়ে গেল। অ্যাপোলো-১০ মহাকাশযান চাঁদকে পরিক্রমার সময় অ্যাপোলোর দু-জন যাত্রী অ্যাপোলোর মূল অংশ থেকে 'লুনার মডিউল' নামে আর একটি ক্ষুদে মহাকাশযানকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে চাঁদের মাত্র ১৬ কিলোমিটারের মধ্যে নেমে এলেন।

এরপরে ঘটল সেই অবিস্মরণীয় ঘটনাটি। ১৯৬৯ সালের ২২শে জুলাই পৃথিবীর প্রথম মানুষের পদচিহ্ন পড়ল চাঁদের জমিতে। মানুষের বহুদিনের স্বপ্ন সেদিন বাস্তবে রূপলাভ করেছিল। সমগ্র পৃথিবীর মানুষ অবাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে ঐ দুঃসাহসিক বৈজ্ঞানিক অভিযানকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিল।

মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে আরো দুঃসাহসিক কর্মপ্রচেষ্টায় নেমেছেন

বিজ্ঞানীরা। চাঁদকে ছাড়িয়ে মঙ্গল, শুক্র, বৃহস্পতি ও শনি গ্রহের দিকে অনুসন্ধানী রকেটকে তাঁরা পাঠিয়েছেন। সৌরজগতে পৃথিবীর এই প্রতিবেশী গ্রহদের সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তথ্য আজ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি।

আরো বড় ঘটনার জন্যে বিজ্ঞানীরা তৈরি হচ্ছেন সন্দেহ নেই। মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত যে সব ঘটনা ঘটেছে আমরা এই গ্রন্থে ধারাবাহিকভাবে তাই নিয়ে আলোচনা করব। মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কর্মপ্রচেষ্টাও স্বভাবতই এই আলোচনার অংশীভূত হবে।

২

বায়ুমণ্ডল ও মহাকাশ

যে মহাকাশে বিজ্ঞানীরা অভিযান শুরু করেছেন, সেই মহাকাশ (স্পেস) বলতে আমরা ঠিক কোন জায়গাটা বোঝাচ্ছি তা গোড়াতেই বুঝে নেওয়া দরকার।

পৃথিবীর ওপরে বায়ুমণ্ডলরূপী যে গ্যাসীয় আবরণটি রয়েছে, সেটি যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত , তারপর থেকেই মহাকাশ অঞ্চল শুরু হয়েছে বলা যায়। প্রথমে বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে খানিকটা পরিচয় আমরা গ্রহণ করব।

বায়ুমণ্ডলের চারতলা বাড়িটা

বায়ুমণ্ডলের প্রথম স্তরটির নাম হল ট্রোপোস্‌ফিয়ার। পৃথিবীর ওপর এই স্তরটির উচ্চতা মেরু অঞ্চলে ৮ কিলোমিটার, নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রায় ১৮ কিলোমিটার। বায়ুমণ্ডলের শতকরা ৭৫ ভাগ গ্যাসীয় উপাদান এই স্তরটির মধ্যেই রয়েছে। এই গ্যাসীয় বস্তুদের মধ্যে শতকরা ৭৮ ভাগ হল নাইট্রোজেন, শতকরা ২১ ভাগ হল অক্সিজেন এবং বাকি শতকরা ১ ভাগ হল কার্বন ডাই-অক্সাইড, আর্গন, নিয়ন, ক্রিপটন, জেনন ও হিলিয়াম।

বায়ুমণ্ডলের আবহাওয়ার কারখানাটা এই ট্রোপোস্‌ফিয়ার অঞ্চলেই। মেঘ, বৃষ্টি, ঝড় সব কিছু তৈরির উপাদান রয়েছে এখানে।

পৃথিবীপৃষ্ঠের ৮ কিলোমিটার ওপরেই বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা হল ৩০ ডিগ্রি ফারেনহিট। সূর্যের তাপে পৃথিবী দিনের বেলা তপ্ত হয়ে ওঠে। সেই তাপ রাত্রিবেলা ওপরে ছড়িয়ে গিয়ে মিলিয়ে যায়। ট্রোপোস্‌ফিয়ারের কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসই সেই তাপকে মাটির কাছাকাছি ধরে রাখে।

বায়ুমণ্ডলের দ্বিতীয় স্তর হল স্ট্র্যাটোস্‌ফিয়ার। এ স্তরটি পৃথিবীর জমির ওপর ১৬ থেকে ৫৬ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। ৩৯ কিলোমিটার ওপরে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা হল ৭০ ডিগ্রি ফারেনহিট।

সূর্যদেহজাত বেগনিপারের (আল্‌ট্রাভায়োলেট) আলো পৃথিবীর ৩২ থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরবর্তী বায়ুমণ্ডলের এলাকার সঙ্গে সঙ্ঘাতের ফলে সেখানকার অক্সিজেন পরমাণুদের ওজোন গ্যাসের অণুতে রূপান্তরিত করে।

(একটি ওজোন গ্যাসের অণু গড়ে উঠেছে তিনটি অক্সিজেন পরমাণুর সমবায়ে।) ফলে ঐ বেগনিপারের আলোর প্রাথমিক তেজ ও ক্ষমতা যায় হারিয়ে। এরপর ঐ আলোর ছিটেফোঁটাই পৃথিবীর জমি পর্যন্ত এসে পৌঁছয়। তা নাহলে, ওর প্রভাব আমাদের জীবদেহের ওপর খুবই মারাত্মক হয়ে দেখা দিত। চামড়ার দুরারোগ্য ক্যানসার ব্যাধিতে আক্রান্ত হতাম আমরা সবাই।

বায়ুমণ্ডলের তৃতীয় স্তরটি হল আয়নস্‌ফিয়ার, পৃথিবীর জমির ৮০ থেকে ৪৮০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত এ বিস্তৃত। সূর্যদেহজাত বেগনিপারের আলো, রঞ্জন রশ্মি ও সৌরকণিকাস্রোতের সংঘাতে এখানকার পরমাণুগুলোর স্বাভাবিক চেহারা বদলে গিয়ে আয়ন তৈরি হয়। আয়নেরা বিদ্যুৎপরিবাহী। এই স্তরটির বেতার তরঙ্গ প্রতিফলনের ক্ষমতা রয়েছে, যার ফলে পৃথিবীর এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশ পর্যন্ত বেতার-বার্তার আদান-প্রদান ব্যবস্থা সম্ভবপর হতে পেরেছে।

আয়নমণ্ডলে বায়ুর ঘনত্ব অত্যন্ত পাতলা হওয়া সত্ত্বেও এখানকার তাপমাত্রা খুবই বেশি। পৃথিবীর ১৭৫ কিলোমিটার দূরে এই তাপমাত্রার পরিমাণ হল ৭৮০ ডিগ্রি ফারেনহিট, ৩০০ কিলোমিটার দূরে এই তাপমাত্রা ১৩৮০ ডিগ্রি ফারেনহিটের কোঠায় এসে দাঁড়ায়। এই অঞ্চলে তাপমাত্রা বেশি হলেও তাপের পরিমাণ কিন্তু খুবই কম।

কোন মাধ্যমের তাপমাত্রা সেখানকার অণুদের গতির ওপরই নির্ভর করে। মাধ্যমটির ঘনত্ব যত কম হবে, অণুদের পরস্পরের মধ্যে দূরত্বও তত বাড়বে। অর্থাৎ পরস্পরের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়বার আগে ওরা অনেকটা লম্বা রাস্তা দৌড়তে পারছে। অণুদের দৌড়োবার রাস্তা যত ফাঁকা হচ্ছে, ওদের বেগও তত বাড়ছে। ফলে, যে অঞ্চলের ওরা বাসিন্দা, তার তাপমাত্রাকেও ওরা বাড়িয়ে তুলছে।

পৃথিবীর জমির ওপর প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার ক্ষেত্রে বায়ুর অণুর সংখ্যা যেখানে ৫০০ কোটির মত, আয়নমণ্ডলের উচ্চতায় একই পরিমাণ ক্ষেত্রে সে সংখ্যা মাত্র ১৫ থেকে ৬০-র মধ্যে হওয়ার জন্যে বায়ুর অণুদের মধ্যে সংঘাত খুব অল্পই ঘটে থাকে। তাই ওখানকার তাপমাত্রা এত বেশি। কিন্তু ঐ অঞ্চলে তাপের পরিমাণ হবে খুবই কম, কারণ ওখানকার ঘনত্ব অতি অল্প বলে তাপ ধারণ বা শোষণ করবার মত বস্তুর পরিমাণও খুবই সামান্য। কোন মাধ্যমের তাপের পরিমাণ তার বস্তুর ঘনত্বের ওপরেই নির্ভর করে থাকে।

পৃথিবীর ৪৮০ কিলোমিটার দূর থেকে শুরু হল বায়ুমণ্ডলের চতুর্থ স্তর

এক্সস্ফিয়ায়। এখানে বায়ুর ঘনত্ব আরো কম ; এই অঞ্চলের তাপমাত্রা হল ৫০০০ ডিগ্রি ফারেনহিটের মত।

এক্সসফিয়ার অঞ্চল থেকে বায়ু ক্রমে মিলিয়ে যেতে যেতে নিকষ কালো অসীম মহাকাশের বায়ুশূন্য প্রদেশের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে।

মহাকাশ

পৃথিবীর জমির ৬০০ থেকে ৭০০ কিলোমিটার দূরে যে অঞ্চল শুরু হল, তাকে আমরা বায়ুহীন মহাকাশ অঞ্চল বলতে পারি। অবশ্য পৃথিবীর ২০০০ কিলোমিটার দূরেও রকেটের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বায়ুর ছিটে-ফোঁটার সন্ধান নাকি পাওয়া গেছে।

মানুষের পক্ষে মহাকাশ অঞ্চল পৃথিবীর জমির ৬ থেকে ৭ কিলোমিটার দূর থেকেই শুরু হয়েছে বলা যায়। এই দূরত্বে বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব এতটাই কমে আসে যে মানুষের পক্ষে আর স্বাভাবিকভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চালানো সম্ভবপর হয় না। ঐ অঞ্চলে পাড়ি জমাতে হলে তাকে কৃত্রিম অক্সিজেন সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে যেতেই হবে।

মানুষের পক্ষে পুরোপুরি মহাকাশ অঞ্চল হল পৃথিবীর জমির ৪০ কিলোমিটার দূরবর্তী জায়গা থেকে। এখানে একটি ওজোন গ্যাসের পরিমণ্ডল রয়েছে। এটি পেরোলেই মানুষকে মহাকাশের এক মারাত্মক রশ্মি বেগনি-পারের আলোর শিকারে পরিণত হতে হবে। এরপর মানুষ যত দূরে যাবে তত সে রঞ্জন রশ্মি, গামা রশ্মি, মহাজাগতিক রশ্মি জাতীয় মারাত্মক মহাকাশ রশ্মিদের প্রভাবিত এলাকার মধ্যে এসে পড়বে। এদের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে মানুষের দেহের জীবকোষগুলোর কেন্দ্রক (নিউক্লিয়াস) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে জীবদেহকে তেজস্ক্রিয়া-জনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত করে তুলবে। প্রতিরক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ছাড়া মানুষের পক্ষে এখানে বাঁচাই অসম্ভব।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল যেন মায়ের স্নেহের আঁচলের মত মহাকাশের বিভিন্ন প্রাণঘাতী রশ্মির সরাসরি সংঘাত থেকে পৃথিবীর মানব সমাজ ও অন্যান্য প্রাণী-কুলকে রক্ষা করে চলেছে।

মহাকাশে কেন যাব ?

মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রতিষ্ঠার প্রথম এবং প্রধান কারণ হল, যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি তাকেই ভাল করে জানা। এছাড়া সূর্য সম্বন্ধে গবেষণা এবং

মহাকাশ অঞ্চল সম্বন্ধে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা ছিল আরো দুটি প্রধান উদ্দেশ্য।

কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠাবার আগেও রকেটেরা ওপরের দিকে হানা দিচ্ছিল, তবে সেটা ছিল নিতান্তই বায়ুমণ্ডলের এলাকায়। কিছু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে ওপরে ওঠা ও নেমে আসার সময় বায়ুর ঘন স্তরের সঙ্গে ঘর্ষণে জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হওয়া—এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এই প্রাথমিক রকেটগুলোর জীবন। তারই ফাঁকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির কলকাঠির নড়াচড়ায় ওপর আকাশে বায়ুর ঘনত্ব, চাপ, গঠনপ্রকৃতি ও সূর্যদেহজাত বিভিন্ন রশ্মির চরিত্র সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য সংগৃহীত হত, বেতার-ঢেউয়ের মাধ্যমে তারা এসে পৌঁছত বিজ্ঞানীদের গ্রাহককেন্দ্রগুলোতে।

এরকম ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানীরা খুশি হতে পারছিলেন না। পৃথিবী সম্বন্ধে অনেক বড় প্রশ্নের উত্তর আজও তাঁদের জানা হয় নি। যেমন, পৃথিবীর জলবায়ু সত্যিসত্যি বদলাচ্ছে কি? সূর্যের আলো ও তেজ পৃথিবীর বাতাস ও সমুদ্র কিভাবে ভাগ করে নেয় নিজেদের মধ্যে? মেরু অঞ্চলের জমাটবাঁধা বরফের স্তূপ গলতে কি পারে কোনদিন? বরফাবৃত কুমেরু মহাদেশ বা অ্যান্টার্কটিকা পৃথিবীর আবহাওয়াকে প্রভাবিত করছে কি? সামুদ্রিক ঝড়ঝঞ্ঝা মহাদেশের উপকূলে এসে আছড়ে পড়বার আগেই খবরটা জানা যায় কিভাবে? পৃথিবীর সব অঞ্চলের আবহাওয়ার খবর আগে থেকেই বলে দেওয়া কি সম্ভব নয়? মহাকাশের গহন অভ্যন্তর থেকে অবিচ্ছিন্ন ধারায় যে মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌঁছচ্ছে, কোথা থেকে আসে তারা? অতিতনু ঊর্ধ্বাকাশে আয়নমণ্ডল গড়ে ওঠার পেছনে কী রহস্য লুকিয়ে আছে? মহাদেশগুলো কি আসলে মহাসাগরের বুকে ভেসে বেড়ায়? পৃথিবী কি সূর্যের করোনা বা কিরীটিকার গ্যাসীয়মণ্ডলের জালে বাঁধা পড়ে আছে? প্রশ্নের যেন আর শেষ নেই।

বিজ্ঞানের বহু অগ্রগতি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু পৃথিবীর জল, মাটি ও বায়ুমণ্ডলের এলাকা সম্বন্ধে সঠিকভাবে অতি অল্প খবরই আমরা আয়ত্ত করতে পেরেছি। এ যেন বিরাট এক নাটমঞ্চ জুড়ে অগণিত ঘটনার সমাবেশ, আর পৃথিবীর মানুষ অবাক দৃষ্টিতে তারই দু-একটা টুকরো ছবি দেখে চলে। সে অল্প দেখায় তার তৃপ্তি নেই। মহাকাশের প্রাণঘাতী রশ্মিদের সংঘাতের বিরুদ্ধে বায়ুমণ্ডল এক রক্ষী-দুর্গের মত দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু বায়ুর তলায় পরম নিশ্চিন্ত স্বাচ্ছন্দ্যে যে কালযাপন, সে যেন ঘরবন্দী জীবন। সেখানে বসে ঘরের বাইরের জীবনের সঙ্গে ঘরের সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টায় বড় কিছু

প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই। জানলাটা তার যেন বড় ছোট, বাইরের খবর বেশি পৌঁছয় না। সেজন্য প্রয়োজন ঘরের ছাদরূপী এই বায়ুমণ্ডলটার বাইরে গিয়ে মহাকাশের পটভূমিতে বসে ঘর বা পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ করা। আর সে সন্ধানেই মিলবে মুক্তো। বিজ্ঞানীরা তাই মহাকাশে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কাজের জন্যে এত বেশি ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন।

আ-ভূ-বর্ষ

কৃত্রিম উপগ্রহেরা পৃথিবীকে ব্যাপকভাবে পর্যবেক্ষণ করার এক বিরাট দৃষ্টি সর্বপ্রথম উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। মহাকাশের বুকে এই যে প্রাথমিক জয়যাত্রা তা কিন্তু বিজ্ঞানীদের একটি বিচ্ছিন্ন কার্যসূচী ছিল না। এ ছিল পৃথিবীব্যাপী এক বিরাট বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার অঙ্গস্বরূপ, যার নাম দেওয়া হয় 'আন্তর্জাতিক ভূপদার্থবিজ্ঞান বর্ষ' (ইণ্টারন্যাশনাল জিওফিজিক্যাল ইয়ার) বা আ-ভূ-বর্ষ। ১৯৫৭ সালের ১লা জুলাই থেকে ১৯৫৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর, মোট এই আঠারো মাসব্যাপী ছিল আ-ভূ-বর্ষের কার্যকাল। পৃথিবীর ৬৭টি দেশের দশ হাজারেরও বেশি বিজ্ঞানী এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপদান করার জন্যে কাজে নেমেছিলেন। এ উপলক্ষে সারা পৃথিবী জুড়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার তৈরী হয়েছিল দু-হাজারেরও বেশি।

এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবী সম্বন্ধে অজানা প্রশ্নগুলোর সমাধানের একটা চেষ্টা এবং পুরোনো জ্ঞান ও তথ্যগুলোর নতুন বিচার ও সংস্কারের মধ্য দিয়ে এই পৃথিবী, সূর্য ও মহাকাশকে আরো ভাল করে জানা। শুধু পৃথিবীকে জানার বিষয়গুলোই এত বড় যে একটি দেশের মুষ্টিমেয় কিছু বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টায় সে কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। তার জন্যে প্রয়োজন সারা পৃথিবীর মহাদেশ, মহাসাগর ও বরফের এলাকা জুড়ে অগণিত বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠা এবং সমগ্র লব্ধ তথ্যকে একটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে পাঠানো। সেখানে ওদের বিশ্লেষণ চলবে দীর্ঘদিন ধরে। আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ছাড়া এত বড় একটি কাজ সম্ভবপর হতে পারে না।

সুষ্ঠুভাবে রূপ দেবার জন্যে সমগ্র পরিকল্পনাটিকে তেরোটি গবেষণাক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছিল। তাদের নাম হল ঃ—(১) হিমবাহবিদ্যা (২) সমুদ্র-বিদ্যা (৩) আবহবিদ্যা (৪) সৌরদেহের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া (৫) মেরুজ্যোতি ও নৈশাকাশদীপ্তি (৬) মহাজাগতিক রশ্মি (৭) আয়নমণ্ডলীয় পদার্থবিদ্যা (৮) ভূ-চৌম্বকত্ব (৯) অভিকর্ষ তত্ত্ব (১০) ভূকম্প তত্ত্ব (১১) তেজষ্ক্রিয়া-

বিষয়ক গবেষণা (১২) অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা ও পৃথিবীর পরিমাপ সংক্রান্ত গবেষণা ও (১৩) রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে ঊর্ধ্বাকাশ সংক্রান্ত গবেষণা।

এক বিরাট পটভূমি জুড়ে এত বড় তথ্যসংগ্রহ পর্ব পৃথিবীর ইতিহাসে এর আগে কখনো ঘটে নি। সমগ্র ঘটনাচক্রের নায়ক হল সূর্য। পৃথিবীর প্রতিটি প্রাকৃতিক ঘটনার সঙ্গে সূর্যদেহের বিভিন্ন ক্রিয়া প্রক্রিয়ার একটি নিগূঢ় যোগাযোগ বহুদিন ধরেই বিজ্ঞানীদের নজরে পড়ছিল। প্রতি এগার বছর অন্তর অন্তর বিশেষ করে দেখা যেত, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রটা হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে পরিবর্তনশীল আর গোলমেলে হতে চাইছে। মেরু অঞ্চলে চলমান জাহাজ ও বিমানের কম্পাসের কাঁটা যেন এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে অনড় হয়ে পড়ছে, ফলে দিক্‌নির্ণয়ের স্থিরতা হারিয়ে নৌ-বিমান চলাচল-ব্যবস্থা বিপদসঙ্কুল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ঝড় আর সাইক্লোন সৃষ্টি হচ্ছে মহাসাগরের বুকে ও প্রচণ্ড ধ্বংস আর মৃত্যুর রূপে এসে আছড়ে পড়ছে মাটির ওপরে। পৃথিবীর এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশ পর্যন্ত বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে আদান-প্রদান ব্যবস্থা মাঝরাস্তায় কোথায় যেন বিপর্যস্ত হয়ে বসে আছে। আরো ছোট-বড় নানা পরিবর্তন সম্বন্ধে অনুসন্ধানরত বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছিলেন, বিভিন্ন ঘটনার মূলে রয়েছে সূর্যের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-প্রক্রিয়া।

সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে এই যে সম্পর্ক, বিজ্ঞানীরা তার ছবিটি স্পষ্টভাবে জানতে চাইছিলেন। মহাকাশে বিজ্ঞানীদের দূতরূপী কৃত্রিম উপগ্রহেরা এ কাজে যেমন তাঁদের সাহায্য করেছে, তেমনি পৃথিবী-সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুসন্ধানক্ষেত্রে তথ্যসংগ্রহের ব্যাপারেও ওরা বিপুলভাবে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

৩

রকেটের কথা

মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্পুটনিকদের পাঠাবার বাহক হল রকেট। রকেটের পুরনো ইতিহাস যথেষ্ট ঘটনাবহুল। ১২০০ খ্রীস্টাব্দে চীনদেশে সর্বপ্রথম রকেটের আবিষ্কার হয় এবং ১২৩২ সালে চীনের মানুষ এই বস্তুটিকে মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য লড়াইয়ের হাতিয়ার রূপে সার্থকভাবে কাজে লাগায়। ভারতবর্ষেও টিপু সুলতানের সেনাবাহিনী ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় এক ধরনের রকেট ব্যবহার করেছিল, যার কার্যকারিতা ইংরেজ সৈন্যদের মনোবল অনেকখানিই ভেঙে দিতে পেরেছিল।

এরপর বিভিন্ন বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টায় রকেটের আরো উন্নতি সাধিত হয়। মহাকাশবিজ্ঞানের জনকরূপে যদি কারো নাম করতে হয়, তিনি হলেন রুশ বিজ্ঞানী জিওলকভ্স্কি। মহাকাশ অভিযানের তত্ত্বগত ভিত তিনিই প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। অনেকে ভাবতে পারেন জিওলকভ্স্কির অনেক আগেই তো জুল ভার্ন চাঁদে যাবার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাই তিনিই বা মহাকাশবিজ্ঞানের জনক উপাধিটা পাবেন না কেন? আসলে জুল ভার্নের রচনার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল শিল্পীর কল্পনা। জিওলকভ্স্কি তাঁর স্বপ্নকে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মধ্যে রূপ দিয়েছিলেন। জুল ভার্নের রচনায় বর্ণিত কামান নয়, জিওলকভ্স্কির পরিকল্পিত রকেটই ভবিষ্যতে মহাকাশ অভিযানের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।

রকেটের যান্ত্রিক উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে আরো দু-জন বিজ্ঞানীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। তাঁরা হলেন আমেরিকার গডার্ড ও রুমানিয়ার ওবার্থ।

জিওলকভ্স্কি, গডার্ড, ওবার্থ—ওদেরও আগে আর একটি মানুষ প্রতিঘাতজনিত একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা ভেবেছিলেন—তিনি হলেন রুশ বিজ্ঞানী ও বিপ্লবী কিবালচিচ্। ১৮৮১ সালে রাশিয়ার জারের বিরুদ্ধে বিপ্লবাত্মক কাজে অংশগ্রহণ করার জন্যে কিবালচিচ্ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। সেন্ট পিটার্সবুর্গ (পরবর্তীকালে লেনিনগ্রাড) শহরে পিটার ও পল দুর্গে তিনি যখন অন্তরীণ অবস্থায় মৃত্যুর প্রতিক্ষা করছেন, তখন তাঁর ঘরের দেওয়াল

জুড়ে রকেট-চালিত প্রোজেকটাইলরূপী একটি বস্তুর নক্সা এঁকেছিলেন। মৃত্যুপথযাত্রী একটি মানুষের পক্ষে এজাতীয় একটি সৃষ্টিকাজ—ঘটনাটির মানবিক আবেদন এতই অসাধারণ যে আমাদের গভীরভাবে অভিভূত না করে পারে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি 'ভি-২' রকেটের আবিষ্কার করেছিল এবং এই রকেটের মাথায় বিধ্বংসী বোমা চাপিয়ে ৩২ থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে পাঠিয়ে ইংলণ্ডের উপকূলবর্তী শহরগুলোর, বিশেষ করে লণ্ডনের প্রচুর ক্ষতিসাধন করে। 'ভি-২' রকেটের প্রধান আবিষ্কর্তা ওয়ার্নার ভন্ ব্রাউনের তত্ত্বাবধানেই আমেরিকার মার্শাল মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্রে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে শক্তিশালী একটি রকেট স্যাটার্ন-৫ তৈরি হয়েছিল। এই রকেটই অ্যাপেলো-১১ মহাকাশযানকে ঘাড়ে চড়িয়ে মহাকাশে পাড়ি জমায়, যে অ্যাপোলোর দু-জন যাত্রী চাঁদের মাটিতে নেমে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন ১৯৬৯ সালের ২০শে জুলাই তারিখে।

রকেটের কাজের নিয়ম

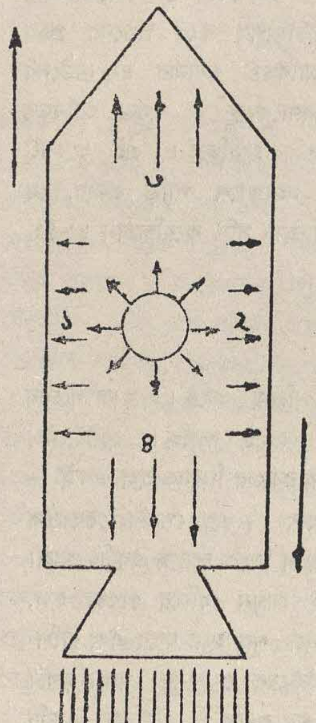
একটি ক্ষুদে রকেটের সঙ্গে আমাদের সকলেরই পরিচয় আছে। কালীপূজোর দিনে যে হাউইবাজি আমরা ছুঁড়ি, তার কথাই বলছি। হাউইবাজি বিজ্ঞানের যে নিয়মে কাজ করে, আধুনিক রকেটের কাজের নিয়মও হল একই।

হাউইবাজি কিভাবে কাজ করে দেখা যাক। এর পেটের ভেতরটায় ঠেসে কঠিন বারুদ পুরে দেওয়া হয়। এর পেছন দিকে রয়েছে একটি খোলা মুখ বা ছিদ্রপথ। কঠিন বারুদের মধ্যে যেই আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল, অমনি বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে ওর দহনকাজ শুরু হয়ে যাবে এবং রাশি-রাশি গ্যাস জন্মাতে থাকবে। গ্যাস জন্মেই হাউইয়ের পেছনের খোলা মুখটা দিয়ে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মেরে বেরিয়ে আসতে শুরু করবে। একদিকে একটি ধাক্কার সৃষ্টি হলে বিপরীত দিকে একটি সমপরিমাণ প্রতিধাক্কার সৃষ্টি হবে, যার ফলে হাউইটি সোজা ওপরের দিকে পাড়ি জমাবে। কিন্তু ওর ওপরের দিকে পাড়ি জমানোর ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। কঠিন বারুদরূপী সামান্য জ্বালানির সঞ্চয় ফুরিয়ে গেলেই হাউইটি আবার মুখ থুবড়ে মাটির ওপর এসে আছড়ে পড়ে।

একদিকে একটি কাজ বা ধাক্কার সৃষ্টি হলে বিপরীত দিকে একটি সমপরিমাণ কাজ বা প্রতিধাক্কা তৈরি হয়ে থাকে—গতিবিজ্ঞানের এই নিয়মটি মহাবিজ্ঞানী নিউটন প্রায় আড়াইশো বছর আগে আবিষ্কার করেছিলেন। হাউইবাজি থেকে শুরু করে সর্বাধুনিক রকেট—সবাই এই একই নিয়ম

অনুযায়ী কাজ করে থাকে। এই নিয়মটি নিউটনের গতিবিজ্ঞানের তৃতীয় নিয়ম নামে পরিচিত।

মনে করা যাক, একটি রকেটের মধ্যে কঠিন বারুদরূপী জ্বালানি ভর্তি করা হয়েছে। অক্সিজেনের সঙ্গে সেই জ্বালানির দহনকাজের ফলে গ্যাস জন্মাবে এবং পেছনদিকের ছিদ্রপথ বা নিষ্ক্রামণ পথ দিয়ে বেরিয়ে এসে একমুখী ধাক্কার সৃষ্টি করবে। অনেকের মনে হতে পারে যে, গ্যাসের স্রোত বেরিয়ে এসে হাওয়ার ওপর ধাক্কা মারছে এবং হাওয়া সেই ধাক্কাটা ফিরিয়ে দিচ্ছে। আসলে, ব্যাপারটা মোটেই তা নয়! কারণ রকেট খুব অল্প সময়ের মধ্যে যে অঞ্চলে গিয়ে হাজির হবে, সেখানে বাতাসের ঘনত্ব এতই কম যে তার স্বল্প পরিমাণ অক্সিজেনের সাহায্যে দহনকাজ কোনমতেই পরিচালনা করা যাবে না। দহনকাজের জন্যে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন রকেটকে তাই আধারে করে বয়ে নিয়ে যেতে হয়।



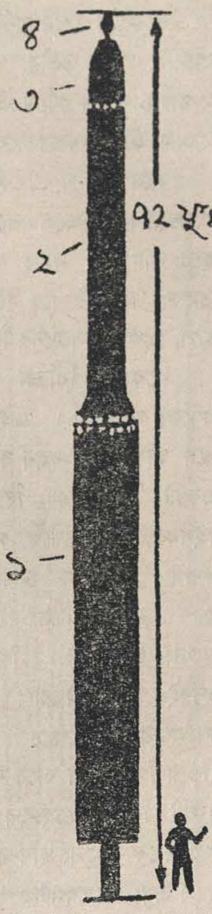
১নং ছবি: রকেটের দহন-কাজের ঘর। ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে কিভাবে রকেটের সম্মুখ-গতি তৈরি হচ্ছে, ছবিতে তাই দেখানো হয়েছে।

আর একটি ঘটনা থেকেও ঐ ভুল ধারণাটির সৃষ্টি হতে পারে। মাঝিকে যখন অল্প জলে নৌকো বাইতে হয়, তখন সে একটি বড় লগির সাহায্যে জলের নিচে মাটির ওপর ধাক্কা মারে। যেদিকে সে ধাক্কা মারছে, নৌকোটা ঠিক তার উল্টোদিকে চলতে থাকে। এ থেকে মনে হতে পারে যে, একটি শক্ত বস্তুর ওপর ধাক্কা না পড়লে বোধ হয় উলটোদিকে প্রতিধাক্কার সৃষ্টি হতে পারে না। এ ধারণাটিও ঠিক নয়।

আসলে ব্যাপারটা কিভাবে ঘটছে দেখা যাক। এক নম্বর ছবিতে আমরা দেখছি একটি রকেটের দহনকাজের ঘরকে। এর নিচের দিকে একটি ছিদ্রপথ রয়েছে। এর মধ্যে কঠিন বারুদ পুরে তাতে আগুন ধরিয়ে

দহনের কাজ শুরু করা হল। তার ফলে রাশি-রাশি গ্যাস জন্মাবে এবং চারদিকের দেয়ালে ধাক্কা মারতে শুরু করবে। দু-পাশের দেয়ালে গ্যাসের যে ধাক্কা পড়ছে (ছবিতে ১ ও ২ দ্বারা যাদের চিহ্নিত করা হয়েছে), ওরা একে অপরের সমান এবং বিপরীত দিকে কাজ করছে, তাই পরস্পরকে সামলে রাখবে। কিন্তু নিচের দিকে (৪) গ্যাসের বেরিয়ে যাবার রাস্তা তৈরি করে দেবার ফলে সেদিকে গ্যাসের কোন চাপ কাজ করবে না। ফলে, ওপরের দিকে (৩) গ্যাসের চাপকে সামলাবার জন্যে বিপরীত দিকেও কোন গ্যাসের চাপই আর থাকছে না।

ঊর্ধ্বমুখী গ্যাসের চাপের ফলে রকেটটি ওপরের দিকে উঠতে শুরু করবে। নিচের দিকে গাসের স্রোত বেরিয়ে এসে একমুখী একটি ধাক্কা তৈরি করা বা কাজের ফলে বিপরীতমুখী সমপরিমাণ আর একটি প্রতিধাক্কা বা কাজের জন্যেই কিন্তু রকেটটি ওপরের দিকে উঠছে। হাওয়ার ঘাড়ে ধাক্কা মারার সঙ্গে রকেটের এই ঊর্ধ্বগতির কোন সম্পর্কই নেই। বরং রকেটের চারপাশে হাওয়া থাকার জন্যেই গ্যাসের স্রোত রকেট থেকে অনেক বেশি দ্রুতবেগে বেরিয়ে আসতে পারছে না ; বায়ুমণ্ডলের ঘন স্তর ঐ বেগের অনেকখানিই আত্মসাৎ করে নিচ্ছে। রকেট যতই বায়ুশূন্য প্রদেশে গিয়ে পৌঁছবে, ততই ওর গ্যাসীয় স্রোতের নির্গমন বেগ বেড়ে উঠবে এবং সামনের দিকে ছুটটাও যাবে বেড়ে।



২ নং ছবি—একটি তিন পর্যায়-বিশিষ্ট রকেট। একটির ওপর আর একটি পর্যায় চাপানো ; একেবারে মাথায় রয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহ (৪)।

একটি আধুনিক রকেট

২ নম্বর ছবিতে আমরা একটি তিন পর্যায়-বিশিষ্ট আধুনিক রকেটকে দেখছি। একটির ওপর আর একটি পর্যায় চাপানো, অনেকটা যেন তেতলা বাড়ির মত। রকেটের চেহারাটা ছুঁচলো এবং সুঠাম, কেননা বাতাস কেটে একে পথ তৈরি করতে হবে। রকেটের মাথায় চাপানো

রয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্পুটনিক, যাকে ঘাড়ে করে মহাকাশে পৌঁছে দিতে হবে রকেটকে।

রকেটের প্রথম পর্যায়ের ভর সবচেয়ে বেশি, দ্বিতীয় পর্যায়ের ভর সে তুলনায় অনেক কম, তৃতীয় পর্যায়ের ভর আরো কম এবং সবচেয়ে হালকা হল মাথায় চাপানো কৃত্রিম উপগ্রহ বা মহাকাশযান। ভরের এই হিসেব নিয়ে পরে আমরা আরো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব।

মনে করা যাক, কেউ একটি রকেটের গঠনমূলক পরিকল্পনা তৈরি করতে বসেছেন। তাহলে রকেটের পেছনের ছিদ্রপথ দিয়ে যে গ্যাসের স্রোত নির্গত হবে, তার বেগ যাতে যথেষ্ট বেশি পরিমাণে তৈরি করা যায়, তার ওপরই তাকে নজর রাখতে হবে সবচেয়ে বেশি। কারণ গ্যাসের নির্গমন-বেগ যত বেশি হবে, রকেটের সামনের দিকের ছুটটাও হবে তত বেশি।

রকেটের বিভিন্ন পর্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হল ওদের দহন-কাজের ঘরগুলো। এই দহনকাজের ঘরের মধ্যে কঠিন বা তরল জ্বালানির সঙ্গে অক্সিজেনের দহন ঘটলে প্রচণ্ড তাপ ও চাপযুক্ত গ্যাস তৈরি হয়। এই গ্যাস একটি ছিদ্রের মধ্য দিয়ে (৩নং ছবি) স্রোতের আকারে বাইরে বেরিয়ে আসে দহনকাজের ঘর থেকে গ্যাস যখন বেরিয়ে আসছে, তখন ওরা বেশি চাপযুক্ত জায়গা থেকে কম-চাপযুক্ত জায়গা বা প্রায়-বায়ুশূন্য জায়গার মধ্যে এসে পড়ছে। এর ফলে গ্যাসের স্রোত বাইরে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার চেষ্টা করে (৩নং ছবি-ক)। কিন্তু আমরা শুধু গ্যাসের পেছন দিকের ধাক্কাটার ওপরই গুরুত্ব আরোপ করছি ; দু-পাশে যে ধাক্কা তৈরি হচ্ছে, তা রকেটের কার্যকারিতার ক্ষেত্রে কোন প্রয়োজনেই আসবে না। দু-পাশে গ্যাস ছড়িয়ে গিয়ে চাপ যাতে নষ্ট না হয়, তার জন্যে রকেটের পেছন দিকে কোণাকৃতি একটি বিশেষ চেহারার ছিদ্রপথ বা প্রসারণ কোণ (এক্সপ্যানশন কোণ) সংযুক্ত করা থাকে (৩নং ছবি-খ)। ফলে গ্যাসের স্রোত একটিমাত্র দিকেই বেরিয়ে আসে এবং ওর বেগটাও কমে যাবার সম্ভাবনা থাকে না।

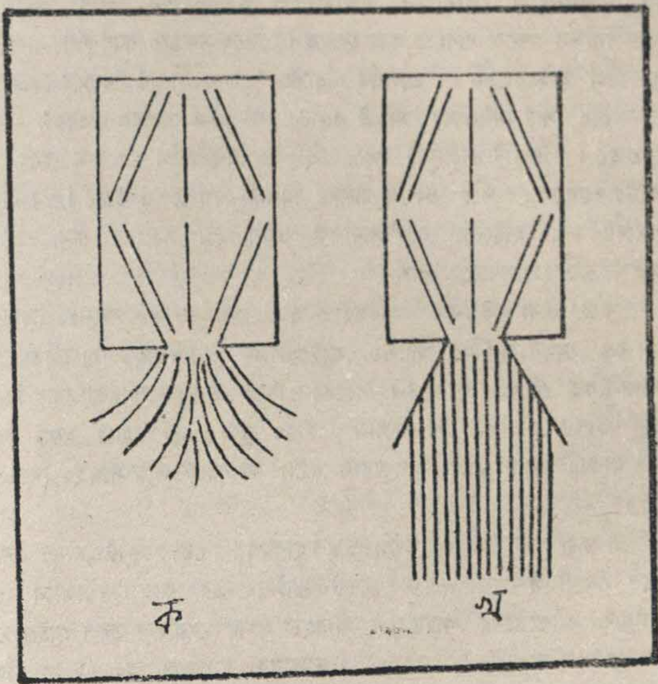
রকেটের জ্বালানি

রকেটের এঞ্জিনের কাজটা হল রাসায়নিক শক্তিকে গতিশক্তিতে রূপান্তরিত করা এবং তারই মধ্য দিয়ে একটি সঞ্চালনের বেগ বা ধাক্কাকে তৈরি করা। এই রাসায়নিক শক্তির উৎস হল জ্বালানি। রকেটের দহনকাজের ঘরে কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় যে-কোন জ্বালানিকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

পূজোর দিনে যে হাউইবাজি ছোঁড়া হয়, তার মধ্যে কঠিন জ্বালানিকে

ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কঠিন জ্বালানিরূপে হয়ত কাঠকয়লাকে ব্যবহার করা হল এবং ওকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করবে যে অক্সিজেন, তার উৎসরূপে ব্যবহার করা হল পটাসিয়াম নাইট্রেটকে। কঠিন জ্বালানি-যুক্ত রকেটে জ্বালানি ও অক্সিজেনের উৎসরূপী উপাদানটি সাধারণত একটিমাত্র বস্তুর মধ্যেই সন্নিবেশ করা থাকে।

কঠিন জ্বালানিপূর্ণ এইসব রকেটের একটি সুবিধে হল এই যে এরা গঠনপ্রকৃতিতে হয় খুবই সরল এবং কাজের দিক দিয়েও যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য



৩নং ছবি

(ক) প্রসারণ কোণবিহীন দহনকাজের ঘর।

(খ) প্রসারণ কোণযুক্ত দহনকাজের ঘর।

হয়ে থাকে। কৃত্রিম উপগ্রহগুলো পাঠানোর সময় বাহক রকেটের তৃতীয় স্তরে কোন-কোন ক্ষেত্রে কঠিন জ্বালানিকে ব্যবহার করা হয়েছিল। কঠিন জ্বালানির যেমন একটি মস্ত সুবিধে হল যে এর দহনকাজ খুব দ্রুতগতিতে চলতে পারে, তেমনি এর একটি বড় অসুবিধে হল এই যে এর দহনকাজ একবার

শুরু হলে তাকে বন্ধ করার কোন উপায় থাকে না এবং তরল জ্বালানিপূর্ণ রকেটের তুলনায় একে নিয়ন্ত্রণ করার কাজটাও অনেক বেশি শক্ত।

গ্যাসীয় জ্বালানিপূর্ণ রকেটকে কখনো-কখনো গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এই জ্বালানিকে ধরে রাখবার পাত্রগুলোকে হতে হয় বিশাল বড়, ফলে রকেটের আকার বিরাট না হয়ে উপায় থাকে না। গ্যাসকে জ্বালানিরূপে রকেটে আজকাল বড় একটা ব্যবহার করা হয় না।

রকেটের পথ চলবার পাথেয়রূপে আদর্শস্থানীয় হল তরল জ্বালানি। তরল জ্বালানিরূপে কেরোসিন, ডাইমিথাইল হাইড্রেজাইন, তরল অ্যামোনিয়া জাতীয় বিভিন্ন বস্তুকে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে সবচেয়ে কার্যকরী জ্বালানিটি হল তরল হাইড্রোজেন। জ্বালানি হিসেবে কোন্ বস্তুটি সবচেয়ে ভালভাবে কাজ করবে, সেটি নির্বাচনের সময় ঐ বস্তুটির আণবিক ওজনের বিষয়টা বিচার করতে হয়। একটি জ্বালানির ক্ষেত্রে এই আণবিক ওজন যত কম হবে, তত রকেটের দহনকাজের ঘরে উৎপন্ন গ্যাসের নির্গমন-বেগ বেড়ে উঠবে। মৌলিক পদার্থদের মধ্যে হাইড্রোজেনের আণবিক ওজন হল সবচেয়ে কম, তাই এর কার্যকারিতাও হল সবচেয়ে বেশি।

রকেটের মধ্যে দুটি বিভিন্ন আধারে তরল জ্বালানি ও অক্সিজেনের আধাররূপী কোন বস্তু, যেমন নাইট্রিক অ্যাসিড, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড বা হয়ত তরল অক্সিজেনকেই রেখে দেওয়া হল। এদের দুটিকে আলাদা করে রাখবার বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয় রকেটের মধ্যে। কারণ দুয়ের তাপমাত্রার মধ্যে বিস্তর তফাত থাকার জন্যে একে অপরের সংযোগে আসবার সঙ্গে-সঙ্গেই বিস্ফোরণ ঘটবে।

মনে করা যাক, যে অ্যাপোলো-১১ মহাকাশযান থেকে দুটি মানুষ চাঁদের মাটিতে নেমেছিল তার বাহক রকেট স্যাটার্ন-৫-এর কথা। এখানে তরল জ্বালানি ও অক্সিজেনের আধাররূপে ব্যবহার করা হয়েছিল তরল হাইড্রোজেন ও তরল অক্সিজেনকে। তরল অক্সিজেনের তাপমাত্রা হল—২৯৩ ডিগ্রি ফারেনহিট, কিন্তু তরল হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে এই তাপমাত্রাও হল অনেক বেশি, কেননা ওর স্বাভাবিক তাপমাত্রাই হল—৪২৩ ডিগ্রি ফারেনহিট। তরল অক্সিজেনের সংযোগে আসার সঙ্গে সঙ্গে এ গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বসবে। কাজেই পরস্পরের সান্নিধ্য থেকে এদের দূরে সরিয়ে না রেখে উপায় নেই।

তরল জ্বালানি ও অক্সিজেনকে রকেটের দহনকাজের ঘরে নিয়ন্ত্রিতভাবে ঢোকানো হয়। এরা পরস্পরের সংযোগে আসার সঙ্গে সঙ্গেই জ্বলে ওঠে এবং

দহনকাজ শুরু হয়ে যায়। অনেক সময় অন্য কোন ব্যবস্থায় এদের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিয়েও এ কাজটা শুরু করতে হয়।

রকেটের দহনকাজের ঘরে সব সময়েই চাপযুক্ত গ্যাস থাকার ফলে জ্বালানি ও অক্সিজেনকে সেখানে প্রবেশ করানোর জন্যে আরো বেশি চাপ প্রয়োগ করতে হয়। এ কাজটা সাধারণত মোটরচালিত পাম্পের সাহায্যেই করা হয়ে থাকে।

দহনকাজের ঘর

দহনকাজের ঘরটা যেন রকেটের উনুনের মত। জ্বালানি ও অক্সিজেনের জোগান যতক্ষণ থাকবে, এর কাজেরও ততক্ষণ বিরাম নেই। দহনকাজের ঘর থেকে যে প্রচণ্ড তাপ ও চাপযুক্ত গ্যাস বেরিয়ে আসছে, তার নির্গমন-বেগটাও নির্ভর করে দহনকাজের ঘরের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রার ওপর। এই তাপমাত্রা সাধারণত ৫০০০ থেকে ৬০০০ ডিগ্রি ফারেনহিটের কোঠায় গিয়ে পৌঁছতে পারে। এই তাপমাত্রার পরিমাণ যত বাড়বে, গ্যাসের নির্গমন বেগটাও তত বেড়ে উঠবে। পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গেছে জ্বালানি ও অক্সিজেনের রাসায়নিক শক্তির চেয়ে দহনকাজের ঘরের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রাই গ্যাসের নির্গমন-বেগের প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী হয়ে দাঁড়ায়।

একটা উদাহরণ নিলে ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি যে ভি-২ রকেট ব্যবহার করেছিল, তাতে এথিল অ্যালকোহল ও তরল অক্সিজেনকে দহনকাজের উপাদানরূপে ব্যবহার করা হয়েছিল। এই দুটি উপাদানের রাসায়নিক কার্যকারিতাকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারলে রকেট থেকে নির্গত গ্যাসের নির্গমন-বেগ ঘণ্টায় ১৪৫০০ কিলোমিটারের কোঠায় পৌঁছতে পারত। কিন্তু তার জন্যে দহন-কাজের ঘরের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রাকে পৌঁছে দিতে হত প্রায় ১৬২০০ ডিগ্রি ফারেনহিটের কোঠায়। যেখানে ইস্পাত ২৩৭২ ডিগ্রি ফারেনহিট তাপমাত্রায় গলে যায়, সেখানে অন্য আর যে-কোন বস্তুর পক্ষেই এত বিপুল তাপমাত্রা ধারণ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

রকেটের দহনকাজের ঘরটাকে ঠাণ্ডা রাখার যদি একটা ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে পরীক্ষামূলকভাবে দেখা যাচ্ছে রকেটের মোটরগুলোকে ৫৫০০ ডিগ্রি ফারেনহিট তাপমাত্রায় চালানো যেতে পারে। এই তাপমাত্রায় রকেটের মোটরগুলোর ক্ষতিগ্রস্ত হবার কোন সম্ভাবনা নেই। ভি-২ রকেটের ক্ষেত্রে অ্যালকোহলের জোরালো রাসায়নিক শক্তিকে কমানোর জন্যে এমন একটি

তরল পদার্থকে তার সঙ্গে মেশাতে হয়েছিল, দহনকাজের ব্যাপারে যার ভূমিকাটা হবে নিষ্ক্রিয়। মোটরগুলোকে বাঁচাবার জন্যে এরকম একটি ব্যবস্থা না করে উপায় ছিল না। ফলে, রকেট থেকে গ্যাসের নির্গমন-বেগটা ঘণ্টায় ১৪৫০০ কিলোমিটারের জায়গায় ঘণ্টায় মাত্র ৮০০০ কিলোমিটারে এসে দাঁড়িয়েছিল।

দহনকাজের ঘরকে ঠাণ্ডা রাখাটা একটা মস্ত বড় সমস্যার ব্যাপার। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তরল জ্বালানিকে দহনকাজের ঘরে প্রবেশ করানোর আগে ঐ ঘরের চারপাশের দেওয়ালগুলোর ওপর বসানো নালীর মধ্য দিয়ে তাকে নিয়ে আসা হয়। এভাবে দহনকাজের ঘরের তাপমাত্রাকে একটা সমতার মধ্যে রাখার ব্যবস্থা যেমন করা হচ্ছে তেমনি খানিকটা তাপ সঞ্চয় করে নিয়ে জ্বালানির শক্তির মাপটাও যাচ্ছে বেড়ে। ফলে দহনকাজটাও ভালভাবে চলতে পারে। তাপমাত্রাকে ঠাণ্ডা করার এই ব্যবস্থার মধ্যে যদি কোনরকম গোলযোগ বা ত্রুটি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তাহলে রকেট জ্বলে পুড়ে ধ্বংস পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। তাই এ ব্যাপারে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থার অবলম্বন করতেই হয়।

দহনকাজের ঘরের তাপমাত্রা যদি ৫৫০০ ডিগ্রি ফারেনহিটের মধ্যে রাখা সম্ভব হয়, তাহলে তরল হাইড্রোজেন এবং তরল অক্সিজেনকে দহন-কাজের উপাদানরূপে ব্যবহার করে রকেট থেকে নির্গত গ্যাসের সর্বোচ্চ বেগ ঘণ্টায় ১৬০০০ কিলোমিটারে পৌঁছে দেওয়া সম্ভবপর হতে পারে। তরল হাইড্রোজেন সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি, এ হল সবচেয়ে হালকা মৌলিক পদার্থ। কাজেই একে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করলে এ পরিমাণেও যেমন বেশি লাগবে, তেমনি রকেটের আয়তন এবং ওজনও খুব বেড়ে উঠবে।

তরল হাইড্রোজেন আবার—৪৮৭ ডিগ্রি ফারেনহিট তাপমাত্রায় ফুটতে থাকে। যে তাপমাত্রায় বাতাস জমে কঠিন হয়ে যায়, এ তার চেয়েও ৪০ ডিগ্রি নিচের তাপমাত্রা। একে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতেই বিজ্ঞানীদের হিমসিম খেয়ে যাবার মত অবস্থা হয়েছিল। সে যাই হোক, বিভিন্ন কার্যকরী সুবিধের জন্যে আদর্শস্থানীয় জ্বালানিরূপে তরল হাইড্রোজেনকেই নির্বাচন করা হয়েছে।

মোটামুটিভাবে আমরা দেখলাম, রকেটের দহনকাজের ঘর থেকে নিচের দিকের ছিদ্রপথ দিয়ে যে গ্যাসের স্রোত বেরিয়ে আসছে, তার নির্গমন-বেগ কয়েকটি অবস্থার ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। ওরা হল :—

(১) রকেটের দহনকাজের ঘরের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা

(২) জ্বালানিরূপী বস্তুটির আণবিক ওজন

(৩) রকেটের নির্গমন-পথের জ্যামিতিক চেহারা ।

ওপরে উল্লিখিত বিশেষত্বগুলো সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি এবং দেখেছি রকেটের সামনের দিকে ছুট্‌টা কিভাবে ওদের ওপর নির্ভরশীল ।

রকেটের বেগ

এখন প্রশ্ন হল, মহাকাশে যাবার জন্যে রকেটকে কি পরিমাণ বেগ অর্জন করতে হবে । এ হবে এমন একটি বেগ, যার সাহায্যে রকেট ওর মাথায় চাপানো কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্পুট্‌নিককে পৃথিবীর কাছাকাছি একটি বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার কক্ষপথে প্রতিষ্ঠা করতে পারে । দেখা যাচ্ছে, সেই বেগের ন্যূনতম পরিমাণ হল ঘণ্টায় ২৮৮০০ কিলোমিটার বা সেকেণ্ডে ৮ কিলোমিটার । এই বেগ কিভাবে অর্জন করা যেতে পারে, দেখা যাক ।

মনে করা যাক, এক পর্যায়ের একটি রকেট থেকে গ্যাসের নির্গমন-বেগ হল ঘণ্টায় ৮৮০০ কিলোমিটার । রকেটের তাহলে কত জোরে সামনের দিকে ছোটা উচিত ? সেটা জানতে হলে আগে অন্য দু-একটি কথা আমাদের আলোচনা করে নিতে হবে ।

সাধারণত রকেটগুলো মোটামুটি তিন ধরনের অংশ নিয়ে তৈরি হয় । এরা হল ঃ—

(১) জ্বালানি ও অক্সিজেন বা অক্সিজেনের আধাররূপী কোন বস্তু (২) রকেটের মূল গঠন, যার মধ্যে রয়েছে রকেটের দহনকাজের ঘর, পাম্পরূপী যন্ত্রব্যবস্থা, জ্বালানির ট্যাংক বা পাত্র এবং অন্যান্য যান্ত্রিক কলকব্জা এবং (৩) রকেটের প্রয়োজনীয় অংশ বা মাথায় চাপানো কৃত্রিম উপগ্রহরূপী বোঝাটি— যার মধ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার যন্ত্রপাতিও থাকতে পারে আবার ঐ বোঝাটিই হতে পারে মহাকাশযাত্রীদের মহাকাশ-কক্ষ ।

রকেটের সামনের দিকে চূড়ান্ত বেগ বা ছুট যেমন নির্ভর করে পেছনদিকে গ্যাসের নির্গমন-বেগের ওপর, তেমনি যাত্রাকালীন অবস্থায় রকেটের সমগ্র ভরের কতখানি অংশ জুড়ে ওর জ্বালানিরা রয়েছে—বা সোজা কথায়, জ্বালানির মোট পরিমাণের ওপরেও কিছুটা নির্ভরশীল । রকেটের মধ্যে আমরা যত বেশি পরিমাণে জ্বালানিকে মজুত করতে পারব, জ্বালানি সম্পূর্ণভাবে জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবার পর ওর সামনের দিকে বেগ বা ছুটও হবে তত বেশি ।

এই ছুটা প্রধানত যার ওপর নির্ভর করে, তা হল ভর-অনুপাত (mass ratio)। যাত্রাশুরুর সময় জ্বালানিপূর্ণ অবস্থায় রকেটের ভরের সঙ্গে যাত্রাশেষে জ্বালানিশূন্য অবস্থায় ভরের যে সম্পর্ক, তাই হল ওর ভর-অনুপাত।

মনে করা যাক, জ্বালানীর ভর=ক, রকেটের গঠনের ভর=খ এবং রকেটের মাথায় চাপানো বোঝাটি বা কৃত্রিম উপগ্রহের ভর=গ ; তাহলে,

$$\text{ভর-অনুপাত} = \frac{\text{ক}+\text{খ}+\text{গ}}{\text{খ}+\text{গ}}$$

যদি ভর-অনুপাত হয় ৪, তাহলে বুঝতে হবে, এক পর্যায়ের একটি রকেটের জ্বালানিপূর্ণ অবস্থ'য় যে ভর দাঁড়াচ্ছে, তা জ্বালানিশূন্য অবস্থায় একই মাপের চারটি রকেটের মোট ভরের সমান !

রকেট থেকে গ্যাসের নির্গমন-বেগ যদি ঘণ্টায় ৮৮০০ কিলোমিটারের মত তৈরি করা যায়, তাহলে এক পর্যায়ের একটি রকেট বিভিন্ন ভর-অনুপাতকে কাজে লাগিয়ে বায়ুশূন্য জায়গায় কি পরিমাণ সামনের দিকে ছুট অর্জন করবে, তা অঙ্ক কষে সহজেই বার করে ফেলা যায়। দেখা যাচ্ছে, ভর-অনুপাত যেখানে ৪ এবং গ্যাসের নির্গমন-বেগ হল ঘণ্টায় ৮৮০০ কিলোমিটারের মত, সেখানে রকেটের সামনের দিকে ছুট ঘণ্টায় ১২০০০ কিলোমিটারে এসে দাঁড়ায়। অবশ্য এই বেগটা আবার অন্য কতকগুলো কারণের জন্যে কিছুটা পরিমাণে কমে আসে। একটি হল, পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলের নিচুটান, আর একটি হল বায়ুমণ্ডলের ঘন স্তর-রকেটের গ্যাসের নির্গমন-বেগ যা খানিকটা পরিমাণে আত্মসাৎ করে নেয়। তৃতীয়টি হল বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে ঘর্ষণজনিত বাধা।

আমরা আগেই আলোচনা করেছি, পৃথিবীর চারপাশে একটি কক্ষপথে যদি রকেটটিকে পৌঁছতে হয়, তাহলে জ্বালানি নিঃশেষ হয়ে যাবার সময় রকেটের বেগ ঘণ্টায় ২৮,৮০০ কিলোমিটারে পৌঁছতেই হবে। পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলের নিচুটান এবং বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে ঘর্ষণজনিত বাধার ফলে এই বেগের পরিমাণ কিছুটা কমার সম্ভাবনা রয়েছে, সে কথা আগেই বলেছি। তাই, প্রাথমিকভাবে আরো খানিকটা বেগ হাতে রেখে ঘণ্টায় ৩২০০০ কিলোমিটারের মতন একটি কার্যকরী বেগ তৈরি করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

এখন এক পর্যায়ের একটি রকেটকে কাজে লাগিয়ে যদি ঘণ্টায় ৩২০০০ কিলোমিটারের মত একটি বেগ তৈরি করতে হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে রকেটের ভর-অনুপাত দাঁড়াবে ৩৮-এর কাছাকাছি। অর্থাৎ, জ্বালানিপূর্ণ অবস্থায় রকেটটির ভর দাঁড়াবে জ্বালানিশূন্য অবস্থার একই মাপের ৩৮টি রকেটের মোট ভরের সমান। অঙ্ক কষে ব্যাপারটা হিসেব করে ফেলা হয়ত খুবই

সোজা, কিন্তু আসলে ঘটনাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে জমির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় রকেটের দৈহিক কাঠামো এবং কৃত্রিম উপগ্রহরূপী বোঝাটির প্রতি এক পাউণ্ড বস্তু মহাকাশে পাঠানোর জন্যে ৩৭ পাউণ্ডের মত জ্বালানি রকেটে মজুত করতে হচ্ছে। কথাটা লেখা যত সোজা, কাজে রূপ দেওয়া কিন্তু ভয়ানক কঠিন।

কিছুকাল আগে পর্যন্তও রকেটের ক্ষেত্রে কার্যকরীভাবে ৪-এর বেশি ভর-অনুপাত পাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। তার মানে হল এই যে, রকেট থেকে গ্যাসের নির্গমন-বেগ ঘণ্টায় ৮৮০০ কিলোমিটারের মত তৈরি করতে পারলেই এক পর্যায়ের একটি রকেট ঘণ্টায় ১২০০০ কিলোমিটারের মত সম্মুখগতি বা ছুট লাভ করে বসবে। কিন্তু এই যে বেগটা তৈরি হল, তা একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবীর কক্ষপথে বসাতে হলে ঘণ্টায় যে ৩২০০০ কিলোমিটারের মত বেগ অর্জন করা দরকার, সে তুলনায় কিন্তু খুবই কম।

এখন প্রশ্ন হল, প্রয়োজনীয় বেগের এই বিরাট ব্যবধানকে কিভাবে পূরণ করা যায়। এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখলেন, এক পর্যায়ের রকেট দিয়ে কাজ হবে না, সে জায়গায় ব্যবহার করতে হবে একের অধিক পর্যায়-বিশিষ্ট রকেটকে।

পর্যায় বিশিষ্ট রকেট

একের চেয়ে বেশি পর্যায়যুক্ত রকেটের কাজের কথায় এবারে আমরা আসব। সেখানে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে দেখা যাক। তিন পর্যায়ের একটি রকেটে দহনকাজ শুরু হয়েছে। রকেটের প্রথম পর্যায়ের জ্বালানি ও অক্সিজেন দহনকাজের পর যখন জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে, তখন স্বভাবতই ওর অপ্রয়োজনীয় আধারটি, বা সোজা কথায় মরা খোলটাকে বয়ে নিয়ে যাবার কোন প্রয়োজন নেই। সেটাকে বাকি রকেটটার গা থেকে খসিয়ে নিচে ফেলে দেওয়া হল। ফলে বাদবাকি রকেটটা আগের তুলনায় অনেক হালকা হয়ে দাঁড়ায়।

মনে করা যাক, রকেটের প্রথম পর্যায়ের গ্যাসের নির্গমন-বেগ হল ঘণ্টায় ৮৮০০ কিলোমিটার এবং ভর-অনুপাত হল ৪। দহনকাজ নিঃশেষ হয়ে যাবার পর এর বেগ দাঁড়াচ্ছে ঘণ্টায় ১২০০০ কিলোমিটার। প্রথম পর্যায়ের ঘাড়ে চাপানো রয়েছে রকেটের দ্বিতীয় পর্যায়। এবার ওর এঞ্জিনের কাজ শুরু হল এবং প্রথম পর্যায়ের মরা খোলটিকে খসিয়ে নিচে ফেলে দেওয়া হল।

রকেটের দ্বিতীয় পর্যায়ের ভর-অনুপাতও যদি হয় ৪ তাহলে এই পর্যায়ের

দহনকাজ থেকে রকেটের বাকি অংশের (তৃতীয় পর্যায় ও কৃত্রিম উপগ্রহ) যে কার্যকরী বেগ তৈরি হবে তার পরিমাণ দাঁড়াবে প্রতি ঘণ্টায় ২×১২০০০ =২৪০০০ কিলোমিটার বা প্রথম পর্যায়ের দ্বিগুণ। এভাবে রকেটের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শেষ হবার পর ওর মরা খোলটিকেও নিচে ফেলে দেওয়া হবে এবং বোঝার মত ঘাড়ে চাপানো রকেটের তৃতীয় পর্যায়ের দহনকাজ শুরু করা হবে। এর ভর-অনুপাতও হল ৪। জ্বালানি ও অক্সিজেন নিঃশেষ হয়ে যাবার পর রকেটের তৃতীয় পর্যায়ের কার্যকরী বেগ বা সম্মুখগতি দাঁড়াবে প্রতি ঘণ্টায় ৩×১২০০০=৩৬০০০ কিলোমিটার বা প্রথম পর্যায়ের তিন গুণ। রকেটের তৃতীয় পর্যায়ের মাথায় চাপানো রয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহ।

পৃথিবীর কক্ষপথে একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে এই বেগ যে যথেষ্ট তা আমরা সহজেই বুঝতে পারছি, কারণ এই কাজের জন্যে ন্যূনতম বেগের পরিমাণ হল ২৮৮০০ কিলোমিটার।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এক পর্যায়ের রকেটকে ব্যবহার করে যেখানে মহাকাশে যাবার প্রয়োজনীয় বেগ তৈরি করা সম্ভব হচ্ছিল না, সেখানে তিন পর্যায়ের রকেটকে ব্যবহার করা হল, যার প্রতিটি পর্যায়ের ভর-অনুপাত হল ৪ এবং গ্যাসের নির্গমন বেগ হল ঘণ্টায় ৮৮০০ কিলোমিটার। এভাবে একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশে পাঠাবার প্রয়োজনীয় বেগ অর্জন করা সম্ভব হল বটে, কিন্তু এক পর্যায়ের রকেটের জায়গায় তিন পর্যায়ের রকেট ব্যবহার করার ফলে গোটা রকেটের ভর গেল বেড়ে।

রকেটের ভর বেড়ে কি অঙ্কে দাঁড়াচ্ছে, একটা উদাহরণ নিলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। মনে করা যাক, এক টন ভরের একটি কৃত্রিম উপগ্রহরূপী বোঝাকে পৃথিবীর কোন কক্ষপথে বসাতে হবে। রকেটের তৃতীয় পর্যায়ের কাঠামোর ভরটাও ধরা গেল এক টনের মত, যদিও এটা সাধারণত এর চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। এই কাঠামোটাও কৃত্রিম উপগ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর কক্ষপথে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। রকেটের তৃতীয় পর্যায়ের ভর-অনুপাত হল ৪, কাজেই ২০ পৃষ্ঠার ভর-অনুপাতের সূত্রের সাহায্যে আমরা দেখছি, ভর-অনুপাত=

$$\frac{\text{জ্বালানির ভর}+\text{রকেটের কাঠামোর ভর}+\text{কৃত্রিম উপগ্রহের ভর}}{\text{রকেটের কাঠামোর ভর}+\text{কৃত্রিম উপগ্রহের ভর}}$$

$$\text{অথবা } ৪=\frac{\text{জ্বালানির ভর}+১\text{ টন}+১\text{ টন}}{১\text{ টন}+১\text{ টন}}$$

অথবা জ্বালানিসমেত গোটা রকেটের ভর=৪×২=৮ টন।

তাহলে জ্বালানিসমেত রকেটের তৃতীয় পর্যায়ের ভর দাঁড়াল ৮ টন। রকেটের দ্বিতীয় পর্যায়ের ঘাড়ে চাপানো তৃতীয় পর্যায়টি হল ওর কৃত্রিম উপগ্রহ-রূপী বোঝার মত, কাজেই দ্বিতীয় পর্যায়ের কাঠামোর ভরও হবে ৮ টন এবং ভর অনুপাতের সূত্র ধরে জ্বালানিপূর্ণ অবস্থায় রকেটের দ্বিতীয় পর্যায়ের ভর হবে ৪×১৬=৬৪ টন। এ আবার রকেটের প্রথম পর্যায়ের ঘাড়ে চাপানো বোঝার মত। কাজেই রকেটের প্রথম পর্যায়ের কাঠামোর ভরটাও হবে ৬৪ টন।

অতএব আমরা দেখছি, জ্বালানিপূর্ণ অবস্থায় জমির ওপর দাঁড়ানো তিন পর্যায়ের রকেটটির ভর হল (ভর-অনুপাতের সূত্র ধরে) ৪×১২৮=৫১২ টন। ভর অনুপাতকে ৪-এর অঙ্কে রাখতে গিয়ে ১ টন ভরের একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবীর কক্ষপথে বসানোর জন্যে একটি বাহক রকেটের প্রয়োজন হচ্ছে, যার ভর হল ৫১২ টনের মত। এটা যদিও মোটামুটি একটা হিসেব, তাহলেও আমরা বুঝতে পারছি, কৃত্রিম উপগ্রহের ভেতরকার ছোট বড় প্রতিটি বস্তুর ভরের হিসেবটা বিজ্ঞানীদের কতটা খুঁটিয়ে বিচার করতে হয়। মহাকাশযাত্রীদের শরীরের ভরটাও এ হিসেবের বাইরে যাবার উপায় নেই। কাজেই আমাদের মধ্যে যাঁরা একটু বেশি মোটা আছেন, তাঁরা চট করে মহাকাশে যাবার ছাড়পত্র পাবেন বলে মনে হয় না।

বহু-পর্যায়ের রকেটের ব্যবহার করে মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠাবার জটিল সমস্যাগুলি বিজ্ঞানীরা কিভাবে সমাধান করতে পেরেছেন, আগের আলোচনা থেকে তা আমরা বুঝতে পারলাম। এক পর্যায়ের রকেটের পক্ষে সবচেয়ে বড় অসুবিধেগুলোর মধ্যে একটি ছিল এই, ভর-অনুপাতের সীমাবদ্ধতার জন্যে এর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে জ্বালানি মজুত করা যাচ্ছিল না, ফলে প্রয়োজনীয় বেগটা তৈরি হচ্ছিল না, আবার বহু-পর্যায়ের রকেটের তুলনায় এর ভরটাও হয়ে দাঁড়াচ্ছিল অনেক বেশি। বহু-পর্যায়ের রকেট, ওর এক একটি পর্যায়ের কাজ শেষ হবার পর সেগুলোর খোলগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে যেমন হালকা হয়ে নিচ্ছিল, তেমনি প্রয়োজনীয় বেগটাও ধাপে ধাপে তৈরি করে চলছিল।

গোড়া থেকেই যদি প্রয়োজনীয় বেগে রকেটটাকে ছোটানোর চেষ্টা করা হত, তাহলে বায়ুমণ্ডলের ঘন স্তরের সঙ্গে ঘর্ষণে রকেটটা জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যেত। সেই দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্যেই বহু-পর্যায়ের রকেটের সাহায্যে রকেটের বেগ ধাপে ধাপে বাড়িয়ে রকেটের মাথায় চাপানো কৃত্রিম উপগ্রহের বায়ুহীন মহাকাশে পৃথিবী পরিক্রমার জন্যে প্রয়োজনীয় মোক্ষম বেগটা তৈরি করা হচ্ছে।

বহু-পর্যায়ের রকেটের মধ্যে বিজ্ঞানীরা মহাকাশে পাড়ি জমানোর এক চমৎকার বাহকের সন্ধান পেয়ে গেলেন, আর তাই নিয়ে শুরু হল তাঁদের এক বিচিত্র কর্মপ্রচেষ্টা।

রকেটের জাত-বিচার

মহাকাশে একটি বস্তু পাঠাবার জন্যে আধুনিক রকেটকে কি পরিমাণ মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয় তাই হল ওর শক্তি-বিচারের মাপকাঠি। যে বোঝাটাকে রকেট ঘাড়ে করে পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছে দিচ্ছে, মনে করা যাক সেটি সমেত জ্বালানিপূর্ণ অবস্থায় রকেটের মোট ভর দাঁড়াল ১০০,০০০ পাউণ্ড। তাহলে গায়ে গতরে ব্যথা ধরে গেলেও এই বিরাট বোঝাটিকে মহাকাশে পাঠাতে রকেটকে ১৫০,০০০ পাউণ্ডের মত এক ধাক্কা তৈরি করতে হবে। পাউণ্ডের সাহায্যে রকেটের ধাক্কা মাপার এই যে ব্যবস্থা, তা যেন অনেকটা কিল-চড় ঘুসির জোর কতটা, তাই মাপার মত একটা ব্যাপার।

যে-কোন রকেটের জাত-কুল-বংশ ঠিক হয়, ওর এঞ্জিনগুলোর 'পাউণ্ডের ধাক্কার' **(pound of thrust)** জোরটা কত, তার বিচারের মধ্য দিয়ে। দশাসই চেহারার যে স্যাটার্ন-৫ রকেট অ্যাপোলো মহাকাশযানগুলোকে নিয়ে চাঁদের দেশে পাড়ি জমিয়েছিল, তার প্রথম পর্যায়ের রকেটে পাঁচটি এঞ্জিনের প্রত্যেকটি ১৫,০০,০০০ পাউণ্ডের মত ধাক্কা বা মোট ৭৫,০০,০০০ পাউণ্ডের ধাক্কা তৈরি করছিল। একটি রকেট এঞ্জিনের কাছ থেকে এই বিরাট বিপুল ধাক্কা আদায় করে নেবার জন্যে বিজ্ঞানীদের গবেষণা-কাজে বছরের পর বছর ধরে কম কাঠ-খড় পোড়াতে হয় নি।

জোরালো মাপের পাউণ্ডের ধাক্কা তৈরির জন্যে রকেটের হাত পাততে হয় জ্বালানির কাছে। জ্বালানিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করছে অক্সিজেন। কি ধরনের জ্বালানি ও অক্সিজেন জুটি বা মিশ্রণকে (যাদের এক কথায় বলে **propellant**) ব্যবহার করলে সবচেয়ে বেশি জোরের ধাক্কা তৈরি করা যাবে তাই দিয়ে আবার ঐ জুটির গুণাগুণের বিচার চলে। এই বিচারের মাপকাঠি হল 'আপেক্ষিক প্রবাহ' **(specific impulse)** এবং একে সেকেণ্ডে প্রকাশ করা হয়।

বিজ্ঞানীরা যখন বলেন যে একটি বিশেষ জ্বালানি-অক্সিজেন জুটির আপেক্ষিক প্রবাহ হল ২৫০ সেকেণ্ড, তখন তার মানেটা দাঁড়ায় এই যে ঐ জুটির প্রতি এক পাউণ্ড পরিমাণ এক সেকেণ্ডে জ্বলে নিঃশেষ হয়ে ২৫০ পাউণ্ডের মত ধাক্কা তৈরি করছে।

মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে 'আপেক্ষিক প্রবাহ' কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বড় আকারের কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠানো এবং ওদের ক্রমেই বেশি বেগে ছোটানোর প্রয়োজনটা বিজ্ঞানীদের সামনে যত দেখা দিতে শুরু করছিল, ততই তাঁরা বেশি 'আপেক্ষিক প্রবাহ' বা জোরালো মাপের জ্বালানি-অক্সিজেন জুটি আবিষ্কারের তাগিদ অনুভব করতে থাকেন। এ অনুসন্ধান-কাজে যে জুটি তাঁদের চাহিদাকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে মেটাতে পেরেছে, তা হল তরল হাইড্রোজেন ও তরল অক্সিজেনের মিশ্রণ। চন্দ্রগামী তিন-পর্যায়ের রকেটে স্যাটার্ন-৫-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞানীরা ঐ জুটিকে ব্যবহার করে এক মস্ত বড় সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন।

আরো জোরালো মাপের জ্বালানির সন্ধান-কাজে বিজ্ঞানীদের ক্লান্তি নেই। পারমাণবিক জ্বালানি-চালিত রকেটের দিকে তাঁরা হাত বাড়িয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কিছু কথা আমরা পরে আলোচনা করব।

ভর ও ওজন

রকেট সম্পর্কে আলোচনার সময় ইতিপূর্বে আমরা প্রায় সব ক্ষেত্রেই ওজন কথাটা ব্যবহার না করে ভর কথাটা ব্যবহার করেছি। এটা কেন করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আলোচনাটা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। কেননা, এ প্রসঙ্গটা পরে ঘুরে ফিরে এসে পড়বে।

ভর ও ওজন এক ব্যাপার নয়। প্রথমে ভরের কথাতেই আসা যাক। একটি পদার্থের ভর বলতে আমরা কী বুঝি? অনেকে বলবেন, পদার্থটির মোট বস্তুর পরিমাণই হল ওর ভর। সাধারণভাবে ব্যাপারটাকে আমরা এভাবেই বুঝে থাকি কিন্তু সঠিকভাবে বুঝতে হলে ব্যাপারটা তা নয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করা যাক।

আমরা একই পরিমাণ ব্যাসযুক্ত দুটো বল নিলাম। একটি বল কঠিন লোহার তৈরি, আর একটি খুব পাতলা কাঠের তৈরি। বল দুটোকে একটি কঠিন অথচ মসৃণ ক্ষেত্রের ওপর রাখা হল। ওদের যদি ধাক্কা মারা যায়, তাহলে আমরা দেখব লোহার বলটি স্থানচ্যুত হতে কাঠের বলের তুলনায় অনেক বেশি বাধাকে প্রয়োগ করছে এবং ওকে ঠেলে গড়িয়ে দিতে তুলনায় অনেক বেশি বলের **(force)** প্রয়োজন হচ্ছে। একটি বস্তু কোন বলের প্রভাবে গতিশীল বা সচল হতে যে বাধা প্রয়োগ করে, তাই হল ওর ভর।

একটি স্থিতিশীল বস্তুর স্থিতির প্রতি ঝোঁক বা একটি গতিশীল বস্তুর গতির প্রতি ঝোঁক বা প্রবণতাকে বলা হয় জাড্য **(inertia)**। একটি

লোহার বলের জাড্যজনিত ভর একটি কাঠের বলের তুলনায় বেশি বলে সেটি আমাদের ঠেলা বা ধাক্কাকে বেশি পরিমাণে প্রতিহত করছে। বলদুটোর কোন ধাক্কাকে বাধা দেবার এই যে প্রবণতা, তার সঙ্গে ওর ওজন এবং পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলের কোন সম্পর্কই নেই।

এ প্রসঙ্গে ওজন সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা যেতে পারে। পৃথিবী তার জমির ওপরকার প্রতিটি বস্তুকে কেন্দ্রের দিকে অভিকর্ষ-বলের দ্বারা টানছে, কিন্তু প্রতিটি বস্তুর ওপর ওই অভিকর্ষরূপী নিচু টান সব সময়েই জমির দ্বারা বাধা পাচ্ছে এবং সেইজন্যেই প্রতিটি বস্তুর ওজনের অনুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে। পৃথিবীর অভিকর্ষ-বল কোন কিছুর দ্বারা বাধা পেলে একটি বস্তুর ওজনের অনুভূতি আসে। যদি এই অভিকর্ষ বল বাধা না পায় অর্থাৎ একটি বস্তু যদি অবাধে পৃথিবীর জমির দিকে পড়বার সুযোগ পায়, তাহলে ঐ বস্তুর কোন ওজন অনুভূত হবে না।

একটি বস্তুর ওজন এবং মহাকাশে ওজনবিহীন অবস্থা সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আলোচনার সুযোগ আমাদের পরে আসবে।

পৃথিবীর জমিতে যখন আমরা লোহার এবং কাঠের বলটাকে মাটি থেকে ওপরের দিকে তোলবার চেষ্টা করছি তখন লোহার বলটাকে বেশি ভারি মনে হয়, বা সোজা কথায় ওর ওজনটা কাঠের বলের তুলনায় বেশি মনে হয়। বলদুটোর এই যে ওজন, তা কিন্তু পৃথিবীর জমির ওপর সব জায়গায় সম-পরিমাণে অনুভূত হবে না। নিরক্ষীয় অঞ্চলে বলদুটোর যে ওজন, মেরু অঞ্চলে ওজনটা সে তুলনায় বেশি অনুভূত হবে। এর কারণ পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চলে অভিকর্ষ-বলের জোরটা মেরু অঞ্চলের তুলনায় খানিকটা কম, যেহেতু পৃথিবীর মেরু অঞ্চলের ব্যাসার্ধ নিরক্ষীয় অঞ্চলের ব্যাসার্ধের তুলনায় সামান্য পরিমাণে কম। অভিকর্ষ-বলের জোরটা খানিকটা কম বলেই তার বিরুদ্ধে টেনে তুলতে গিয়ে নিরক্ষীয় অঞ্চলে বলদুটোর ওজন কম অনুভূত হচ্ছে।

লোহার ও কাঠের বলদুটোকে মনে করা যাক আমরা চাঁদে নিয়ে হাজির করলাম। চাঁদের অভিকর্ষ-বলের জোরটা পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলের ১/৬ ভাগ, কাজেই চাঁদে একটি বস্তুর ওজন ওর পৃথিবীর ওজনের ১/৬ ভাগ হয়ে দাঁড়াবে। তাই চাঁদে লোহার বলটাকে হাতে করে ওপরে তুলতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না, আর কাঠের বলটাকে প্রায় একটা রবারের বেলুনের মত হালকা মনে হবে।

কিন্তু এবারে যদি আমরা বলদুটোকে ধাক্কা বা ঠেলা মেরে স্থানচ্যুত করে চাঁদের জমির ওপর ওদের গতিশীল করে তুলতে চেষ্টা করি, তাহলে পৃথিবীর

জমির ওপর ওদের গতিশীল করে তুলতে যে পরিমাণ বল বা প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়েছিল, চাঁদেও ঠিক সেই একই পরিমাণ বলকে প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ, বলদুটোর গতিশীল হতে বাধা দেবার যে ক্ষমতা বা সোজা কথায় ওদের ভর পৃথিবীতে যেমন ছিল, চাঁদেও তাই থাকবে।

আগের আলোচনা থেকে আমরা যেটা বুঝতে পারছি তা হল এই যে, যদিও বিভিন্ন বস্তুর ওজন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পরিবর্তিত হতে দেখা যায়, কিন্তু ওদের জাড্যজনিত ভর, বা সোজা কথায় ভরের মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেখানেই আমরা যাই না কেন, বস্তুর এই ভর সব জায়গাতে একই থাকবে। পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চলে একটি বস্তুর যে ওজন, তা যদিও মেরু-অঞ্চলে বস্তুটির ওজনের তুলনায় খানিকটা বেশি হবে, কিন্তু দু-জায়গাতেই একটি মসৃণ আনুভূমিক (horizontal) ক্ষেত্রের ওপর বস্তুটিকে যখন আমরা গতিশীল করার চেষ্টা করব, তখন ওরা সমপরিমাণ বাধাকে প্রয়োগ করবে। অর্থাৎ কিনা, দু-জায়গাতেই বস্তুটির ভরের মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটবে না।

কাজেই একটি পদার্থের মধ্যে কতটা বস্তু রয়েছে, তার মাপ বা পরিমাণকে নির্দেশ করার জন্যে আমরা সব সময়েই বস্তুটির ওজনের কথা না বলে ওর জাড্যজনিত ভর বা ভর কথাটি ব্যবহার করব। তার মানে অবশ্য ব্যাপারটা এই দাঁড়াল না যে, বস্তুর পরিমাণই হল ভর। তবে একটি বস্তুর ভর যে বস্তুর পরিমাণের ওপর নির্ভরশীল তা আমরা সহজেই বুঝতে পারছি। পরিমাণে বেশি হলে একটি বস্তু গতিশীল হতেও বেশি বাধা প্রয়োগ করবে, অর্থাৎ ওর ভরটা বেড়ে উঠবে।

আসল কথাটা তাহলে হল এই যে, বস্তুর ওজন হল পরিবর্তনশীল একটি ব্যাপার, কিন্তু বস্তুর ভর হল অপরিবর্তনীয়।

৪

মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ

কৃত্রিম উপগ্রহ বা মহাকাশযানের মহাকাশে পাড়ি জমানোর বাহক হল পর্যায়যুক্ত রকেট। পর্যায়যুক্ত রকেটের কাজের পদ্ধতি সম্বন্ধে আগের অধ্যায়ে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। এই রকেট ধাপে ধাপে ঘণ্টায় ২৮৮০০ কিলোমিটারের (১৮০০০ মাইল) প্রয়োজনীয় বেগ তৈরি করে কৃত্রিম উপগ্রহের হাতে তুলে দিচ্ছে। সেই বেগের সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহের মহাকাশে পৃথিবী পরিক্রমার কাজ শুরু হচ্ছে। প্রশ্নটা হল, কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর চারপাশে এক বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরপাক খাচ্ছে কিভাবে? আমরা এবারে সে আলোচনাতেই আসব।

যাত্রী রকেট

একটি ঘটনা থেকেই আলোচনা শুরু করা যাক। সমুদ্রের ধারে একটি মহাকাশ-বন্দর। সেখানকার এক ক্ষেপণ-মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছে এক তিন-পর্যায়ের রকেট। রকেটের মাথায় চাপানো এক কৃত্রিম উপগ্রহ—বৈজ্ঞানিক গবেষণার নানা যন্ত্রপাতি ওর মধ্যে রয়েছে। মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র থেকে সঙ্কেতের নির্দেশ পাওয়ামাত্র রকেটের প্রথম পর্যায়ের এঞ্জিনঘরে দহনকাজ শুরু হয়ে যায়। প্রচণ্ড চাপ ও তাপযুক্ত গ্যাস রকেটের পেছনদিকের নিষ্ক্রমণ-পথ দিয়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। এই ধাক্কার বিপরীতমুখী প্রতিধাক্কার ফলে গোটা রকেটটা ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠতে শুরু করে।

তিন-চার মিনিটের মধ্যে রকেটের প্রথম পর্যায়ের জ্বালানি ও অক্সিজেনের সঞ্চয় দহনকাজের ফলে নিঃশেষ হয়ে আসে। রকেট তখন পৃথিবীর জমি ছাড়িয়ে প্রায় ৬৪ কিলোমিটার ওপরে গিয়ে পৌঁছেছে এবং ওর ছোটাব বেগ দাঁড়িয়েছে ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার। রকেটের প্রথম পর্যায়ের অকেজো খোলটাকে এখন আর বয়ে নিয়ে যাবার কোন প্রয়োজন নেই। প্যারাশুটের সাহায্যে সেটাকে ফেলে দেওয়া হল সমুদ্রের জলে। রকেটের প্রথম পর্যায়ের ভরই ছিল সবচেয়ে বেশি। সেই বিরাট বোঝাটা ঘাড় থেকে নেমে যাওয়ার

ফলে বাদবাকি রকেটযা বেজায় হালকা হয়ে দাঁড়ায়। হালকা হয়ে যাবার ফলে ওর ছুটটাও বেড়ে চলে।

রকেটের দ্বিতীয় পর্যায় বা দোতলার এঞ্জিনের কাজ এবারে শুরু হল। এতক্ষণ রকেটের গতিপথটা ছিল খাড়া বা ওপরের দিকে। দোতলার রকেটের ভেতরে বসানো নিয়ন্ত্রক যন্ত্রের সাহায্যে গোটা রকেটের মুখটাকে ধীরে ধীরে বাঁকানো শুরু হল এবং ওর চলবার রাস্তাটা পৃথিবীর বাঁকা পিঠের সমান্তরাল-ভাবে তৈরি হতে থাকল।

দ্বিতীয় পর্যায়ের জ্বালানি ও অক্সিজেনের সঞ্চয় নিঃশেষ হতে সময় লাগবে আরো দু-তিন মিনিটের মত। তারপর ওর অকেজো খোলটিকেও বাকি রকেটের গা থেকে খসিয়ে নিচে ফেলে দেওয়া হল। এটিও প্যারাশুটের সাহায্যে সাগরের জলে এসে নামবে এবং প্রথম পর্যায়ের খোলের মত একেও কোন হেলিকপ্‌টার জল থেকে তুলে নেবে। রকেটের বিভিন্ন পর্যায়ের এই খোলগুলো খুব দামি মিশ্র ধাতু বা অ্যালয় দ্বারা তৈরি। বাইরের পৃথিবীর ঘন বায়ুস্তরের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে এবং ভেতরে দহনকাজের ঘরে যে প্রচণ্ড তাপ জন্মায় তার ফলেও এরা কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। একবার ব্যবহার করেও খোলগুলোকে ভবিষ্যতে অন্য কোন রকেটের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যেতে পারে।

রকেটের দোতলার খোলটা যখন খসে নিচে নেমে গেল, তখন বাকি রকেটটা পৃথিবী (সাগরের পৃষ্ঠ) থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে গিয়ে পৌঁছেছে ; ও আগের চেয়ে যেমন আরো হালকা হয়েছে, তেমনি ওর চলার বেগ দাঁড়িয়েছে ঘণ্টায় প্রায় ১৭,৫০০ কিলোমিটার। রকেটের চলবার রাস্তাটাও এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে পৃথিবীর বর্তুলাকৃতি পিঠের প্রায় সমান্তরাল।

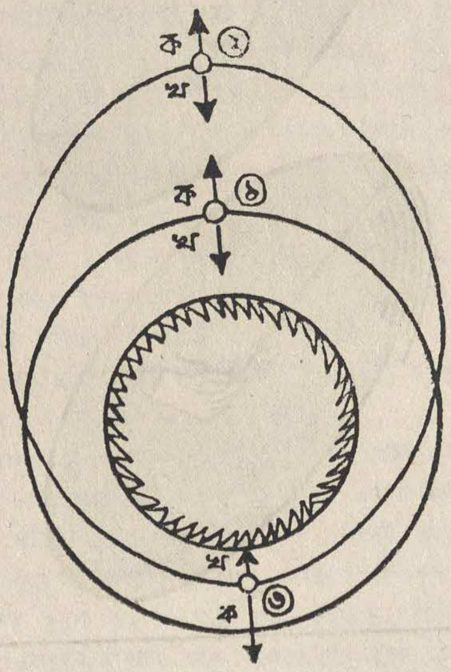
রকেটের তৃতীয় বা সর্বশেষ পর্যায়ের কাজ এবারে শুরু হল। এরও অক্সিজেন ও জ্বালানির সঞ্চয় নিঃশেষ হতে আরো দু-তিন মিনিট সময় লাগবে। তারপর এর অকেজো খোলটিও যাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে। ফলে একেবারে গা-হাত-পা-ঝাড়া অবস্থায় কৃত্রিম উপগ্রহের এক নতুন জীবন শুরু হবে মহাকাশে। বাহক রকেটের সর্বশেষ পর্যায়ের চালিকা শক্তিটুকু নিয়ে ওর এখন বেগ দাঁড়িয়েছে ঘণ্টায় ২৮,৮০০ কিলোমিটার ; পৃথিবীর জমি থেকে ওর দূরত্ব দাঁড়িয়েছে হয়ত ৩০০ থেকে ৪০০ কিলোমিটার এবং চলবার পথটা সম্পূর্ণভাবে পৃথিবীর বর্তুলাকৃতি পিঠের সমান্তরাল হয়ে উঠেছে।

কৃত্রিম উপগ্রহের দেহে যে বিরাট ছুট তৈরি হল, তা নিয়ে ওর আসলে সোজা মহাকাশের মধ্য দিয়ে ছুটে বেরিয়ে চলে যাবার কথা ছিল। কিন্তু

চলবে। যে দুটি বলের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া একটি কৃত্রিম উপগ্রহের ওপর কাজ করছে এবার সে আলোচনায় আমরা আসব।

কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ বল

একটি কৃত্রিম উপগ্রহ যে একটি কক্ষপথে পৃথিবীকে পরিক্রমা করে চলে তার মূলে রয়েছে দুটি বলের খেলা। একটি হল পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলরূপী নিচুটান, পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে যেটি কাজ করছে। একে কেন্দ্রানুগ বল (বা **centripetal force**) বলা হয়ে থাকে। এই কেন্দ্রানুগ বলের বিপরীত দিকে সমপরিমাণ আর-একটি বল সব সময়েই কৃত্রিম উপগ্রহটির



৫ নং ছবি

এখানে ক ও খ হল যথাক্রমে কৃত্রিম উপগ্রহের ওপর ক্রিয়াশীল কেন্দ্রাতিগ ও ও কেন্দ্রানুগ বল। (১)-এ ক ও খ পরস্পরের বিপরীত ও সমান হওয়ার জন্যে কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথের চেহারা হয়েছে বৃত্তাকার। আবার (২) ও (৩)-এ যথাক্রমে ক-এর পরিমাণ খ-এর চেয়ে বেশি এবং খ-এর পরিমাণ ক-এর চেয়ে বেশি হওয়ায় পৃথিবীর চারদিকে কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথের চেহারা হয়ে দাঁড়িয়েছে উপবৃত্তাকার।

ওপর কাজ করছে, সেটি হল কেন্দ্রাতিগ বল **(centrifugal force)** অর্থাৎ, পৃথিবী যে পরিমাণ বলের দ্বারা কৃত্রিম উপগ্রহটিকে আকর্ষণ করছে, কৃত্রিম উপগ্রহটিও ঠিক সেই একই পরিমাণ বলের দ্বারা পৃথিবীকে আকর্ষণ করছে। কিন্তু পৃথিবীর ভর কৃত্রিম উপগ্রহটির ভরের তুলনায় অনেক বেশি হওয়ার জন্যে পৃথিবীর স্থানচ্যুতি ঘটে স্বল্পাতিস্বল্প, অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যেও যার পরিমাপ করে ওঠা প্রায় এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

মনে করা যাক, একটি কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর জমির খুব কাছাকাছি থেকে তার বাঁকা পিঠের এক সমান্তরাল পথে পরিক্রমা করে চলেছে। কৃত্রিম উপগ্রহটি যদি ওর কক্ষপথে যথেষ্ট বেগের সঙ্গে, বা সোজা কথায় ঐ পথ-পরিক্রমার জন্যে ওর যে বেগ বরাদ্দ হয়ে আছে তা যদি আয়ত্ত করে উঠতে না পেরে থাকে তাহলে পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের টান কৃত্রিম উপগ্রহের নিজস্ব বেগের তুলনায় শক্তিশালী হয়ে দাঁড়াবে। ফলে কৃত্রিম উপগ্রহটি জমির ওপর এসে আছড়ে পড়বে। পৃথিবীর জমির কাছাকাছি এই ন্যূনতম বেগের পরিমাণ হল ঘণ্টায় ২৮,৮০০ কিলোমিটার।

কোন কৃত্রিম উপগ্রহ যখন পৃথিবীর চারদিকে এমন একটি বেগের সাহায্যে ঘুরে চলে যাতে ওর কেন্দ্রাতিগ বলের পরিমাণ পৃথিবীর অভিকর্ষজনিত কেন্দ্রানুগ বলকে সামলাবার মত যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে দাঁড়ায় তখন কৃত্রিম উপগ্রহের পৃথিবী-পরিক্রমা-পথের চেহারাটা হবে বৃত্তাকার।

আবার, যদি পরস্পরের বিপরীত দিকে ক্রিয়াশীল কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রানুগ বল মাপে পরস্পরের সমান না হয়, অর্থাৎ মনে করা যাক কেন্দ্রাতিগ বল কেন্দ্রানুগ বা পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলের তুলনায় খানিকটা বেশি বা কম জোরালো হয়ে দাঁড়াল, তাহলে কৃত্রিম উপগ্রহের পৃথিবী-পরিক্রমা-পথের চেহারাটা হবে উপবৃত্তাকার।

একটি কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথের চেহারা যখন পরাবৃত্ত (parabola) বা অধিবৃত্তের **(hyperbola)** আকার লাভ করে বসে তখন সে কিন্তু আর পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলের টানে বাঁধা পড়বে না। সে অবস্থায় ঘটনাগুলো কি দাঁড়ায় সে আলোচনায় আমরা পরে আসব।

কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথ

পৃথিবীর চারপাশে পরিক্রমারত প্রায় প্রতিটি কৃত্রিম উপগ্রহেরই কক্ষপথের চেহারা হল উপবৃত্তাকার। উপবৃত্তের চেহারাটা হল ডিমের মত এবং একটি

উপবৃত্তের দুটি ফোকস বা কেন্দ্র থাকে। কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথের ক্ষেত্রে একটি ফোকস হল পৃথিবীর কেন্দ্র, আর একটি ফোকস রয়েছে পৃথিবীর জমির বাইরে মহাকাশে।

৫ নম্বর ছবিতে আমরা দেখছি, উপবৃত্তাকার কক্ষপথে পৃথিবীর চারদিকে পরিক্রমা করতে করতে কৃত্রিম উপগ্রহটি কখনো পৃথিবীর খুব কাছাকাছি আসছে আবার কখনো পৃথিবী থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। পৃথিবীর কাছাকাছি অবস্থান-বিন্দুটিকে বলা হয় অনুভূ (বা perigee) এবং সবচেয়ে দূরের অবস্থান-বিন্দুটিকে বলা হয় অপভূ (বা apogee)। অনুভূতে (৩) পৃথিবীর কাছাকাছি আসার ফলে কৃত্রিম উপগ্রহটির ওপর পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলের টান বা কেন্দ্রাতিগ বলটা যাচ্ছে বেড়ে। বিপরীত দিকে সমপরিমাণ কেন্দ্রানুগ বল তৈরি করতে গিয়ে কৃত্রিম উপগ্রহটির বেগও বেড়ে উঠছে। সোজা কথায় বলা যেতে পারে, পৃথিবীর টানটা সামলাবার জন্যে কৃত্রিম উপগ্রহের ছুটটা যাচ্ছে বেড়ে।

আবার অপভূতে (২) পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলের জোরটা খানিকটা কমে যাবার ফলে তাকে সামলাতে গিয়ে কৃত্রিম উপগ্রহের বেগটা সামান্য পরিমাণে কমে যাচ্ছে। পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের উপবৃত্তাকার কক্ষপথের অনুভূ ও অপভূর দূরত্ব পৃথিবীর জমি থেকে ছিল যথাক্রমে ২২৭ ও ৯৪৭ কিলোমিটার।

ঘণ্টায় ২৮,৮০০ কিলোমিটার বেগে কৃত্রিম উপগ্রহদের এই যে পৃথিবী পরিক্রমা, তা কি অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে ? একটি কৃত্রিম উপগ্রহের আয়ু সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ওর উপবৃত্তাকার কক্ষপথের চেহারার ওপর। কক্ষপথের অনুভূ বায়ুমণ্ডলের যদি অতিতনু অঞ্চলের মধ্যেও অবস্থিত থাকে, তাহলে অনুভূতে বায়ুর অণু পরমাণুদের সঙ্গে কৃত্রিম উপগ্রহের যে সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে, তার ফলে ওর কক্ষপথের চেহারাটা পালটাতে থাকবে। অনুভূর অবস্থানের কোন পরিবর্তন হবে না, কিন্তু অপভূ বা সবচেয়ে দূরের অবস্থান-বিন্দু ধীরে ধীরে পৃথিবীর জমির দিকে নেমে আসতে থাকবে।

এভাবে কক্ষপথের উপবৃত্তাকার চেহারাটা ক্রমেই বৃত্তাকার হয়ে আসবে। বৃত্তাকার হবার পর কক্ষপথের দুই প্রান্তেই বায়ুর অতিতনু অঞ্চলের সঙ্গে কৃত্রিম উপগ্রহের সংঘাত ঘটতে থাকবে। ফলে কক্ষপথের চেহারা খুব দ্রুতবেগে ছোট হয়ে আসবে এবং অবশেষে বায়ুমণ্ডলের ঘন স্তরে প্রবেশ করে কৃত্রিম উপগ্রহ জ্বলে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।

পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ

সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশে পাঠিয়েছিলেন ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে। ওঁরা ওর নাম দিয়েছিলেন স্পুটনিক-১। কৃত্রিম উপগ্রহটিকে একটি উড়ন্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার বলা যেতে পারে, কেননা ওর ভেতরে বোঝাই করে দেওয়া হয়েছিল নানারকমের যন্ত্রপাতি। ওরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা আপনা-আপনি ওদের কলকাঠি নড়াচড়া করেছে এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করে বেতার-সঙ্কেতের রূপে বিজ্ঞানীদের কাছে ফেরত পাঠিয়েছে।

স্পুটনিকটির ব্যাস ছিল ৫৮ সেণ্টিমিটারের মত এবং ওজন ছিল ১৮৪ পাউণ্ড। ওকে এবং পরবর্তীকালে অন্য সব কৃত্রিম উপগ্রহকেই ছোঁড়া হয়েছিল পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে। এর কারণটা হল এই যে, পৃথিবীও পশ্চিম থেকে পূবে আপন অক্ষের ওপর ঘুরে চলেছে এবং এই ঘূর্ণনের বেগ হল ঘণ্টায় ১৭৬০ কিলোমিটার। একই দিকে যদি কৃত্রিম উপগ্রহকেও ছোঁড়া যায়, তাহলে পৃথিবীর এই ঘূর্ণন বেগটা বাহক রকেটের দেহে আপনা থেকেই যুক্ত হয়ে যাবে। এভাবে রকেটের পথ চলবার পাথেয় তরল জ্বালানি ও অক্সিজেন কিছুটা বাঁচাবার ব্যবস্থা করা যায় আর কি।

স্পুটনিকটির সমগ্র পৃথিবীর চারদিকে একবার পরিক্রমা সম্পূর্ণ করতে সময় লাগছিল ৯৬ মিনিটের মত। স্পুটনিকটি সমগ্র পৃথিবীকে এক চক্কর ঘুরে আসার পর পৃথিবীর যে জায়গা থেকে যাত্রা শুরু করেছিল আবার কিন্তু সে জায়গার ওপর ফিরে আসবে না। কেননা ততক্ষণে পৃথিবী আপন অক্ষের ওপর ঘূর্ণন-বেগের (ঘণ্টায় ১৭৬০ কিলোমিটার) জন্যে পশ্চিম থেকে পূবে ২২½ ডিগ্রি হেলে বা সরে গেছে। স্পুটনিকটির পৃথিবীকে প্রতিবার পরিক্রমার সময়ই এই ঘটনাটা ঘটতে থাকবে। ফলে পৃথিবীর সমগ্র অঞ্চলের ওপর দিয়ে পাড়ি জমাবার জন্যে স্পুটনিকটিকে ৩৬০°÷২২½° বা ১৬½ বার পৃথিবী পরিক্রমার কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে।

প্রথম স্পুটনিকের মধ্যে অবশ্য কোন ক্যামেরা-যন্ত্র বসানো ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে বহু কৃত্রিম উপগ্রহই ক্যামেরা-যন্ত্রে সজ্জিত হয়ে মহাকাশে পাড়ি জমায়। ২৪ ঘণ্টায় সমগ্র পৃথিবীকে এক চক্কর ঘুরে আসার মধ্য দিয়ে একটি কৃত্রিম উপগ্রহের ক্যামেরা-যন্ত্রের দৃষ্টিতে গোটা পৃথিবীর সমগ্র অঞ্চল ধরা দিয়ে বসে। ফলে পৃথিবীর কোথায় ঝোড়ো হাওয়া ঝোড়ো মেঘের দল নিয়ে জোট পাকাচ্ছে, সাগরের বুকে কোথায় ঝড়-তুফানের দল ষড়যন্ত্র আঁটছে—কোন কিছুই আর গোপন থাকে না। কৃত্রিম উপগ্রহেরা আবহাওয়া

নির্ণয়ের ব্যাপারে এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের কাজে কি ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে, সে আলোচনায় আমরা যথাসময়ে আসব।

পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং আমেরিকার বিজ্ঞানীরা গত আঠাশ বছরে এ পর্যন্ত প্রায় আড়াই হাজারের মত কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে বিভিন্ন কক্ষপথে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এরা জ্ঞান বিজ্ঞানের জগতে নতুন নতুন দিগন্তকে উন্মুক্ত করেছে এবং আজও করে চলেছে।

এই বিপুলসংখ্যক কৃত্রিম উপগ্রহদের মধ্যে কিছু ইতিমধ্যেই বায়ুমণ্ডলের ঘন স্তরে প্রবেশ করে ধ্বংস হয়ে গেছে। যেমন প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটি (যার কক্ষপথের অনুভূ ও অপভূ ছিল যথাক্রমে ২২৭ ও ৯৪৭ কিলোমিটার) মহাকাশে পাড়ি জমানোর পাঁচ মাসের মধ্যেই বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে ধ্বংস হয়ে যায়। যে সব কৃত্রিম উপগ্রহের অনুভূ যত দূরে প্রতিষ্ঠা করা যাবে, তাদের আয়ু তত বেড়ে যাবে। মহাকাশে বর্তমানে বহু কৃত্রিম উপগ্রহ রয়েছে যারা হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীকে পরিক্রমা করে চলবে, যদি না মহাকাশের সৌখীন ভ্রমণকারী কোন উল্কার সংঘাতে তার আগেই ওদের ভবলীলা সাঙ্গ করতে হয়।

অভ্রান্ত পথপ্রদর্শক

কৃত্রিম উপগ্রহ যে ওর বাহক রকেটের ঘাড়ে চড়ে মহাকাশে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৌঁছে নির্দিষ্ট পরিমাণ বেগে পৃথিবী পরিক্রমার কাজ শুরু করছে, তার পেছনে রয়েছে রকেটের আভ্যন্তরীণ নির্দেশক ও নিয়ন্ত্রক যন্ত্রের অভ্রান্ত কাজ।

সাধারণত দু-ধরনের পথ-নির্দেশক ব্যবস্থা রকেটে ব্যবহার করা হয়। একটি হল **Inertial guidance** বা জাড্যজনিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। অপরটি হল **Radar guidance** বা র‍্যাডার যন্ত্রের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা।

জাড্যজনিত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার মধ্যে একটি ইলেকট্রনিক 'ব্রেন' বা মগজ রয়েছে, যার কাজ হল রকেটটি কক্ষপথে পৌঁছনো পর্যন্ত সব সময়ে সে কোথায় থাকবে তার ওপর খবরদারি করা। নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার মধ্যে আর-একদল যন্ত্র রয়েছে যাদের কাজ হল, রকেটটি ছোটার সময় ডাইনে-বাঁয়ে এবং সামনে পেছনে কতটা নড়াচড়া করছে তাকে পরিমাপ করা। এই তথ্যগুলো নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার ইলেকট্রনিক ব্রেন বা কম্পিউটারের কাছে পৌঁছে যায়। কম্পিউটার সব সময়েই রকেটের বেগ, তার ছোটার দিক এবং কতটা দূরত্ব রকেট পাড়ি জমাল তার হিসেব রাখছে। কম্পিউটার রকেটটির বর্তমান অবস্থান এবং ওর আসলে

যেখানে থাকা উচিত এই দুটি অবস্থার মধ্যে সব সময়ে তুলনামূলক বিচার করে চলেছে।

রকেটটি যদি কোন কারণে ওর নির্দিষ্ট গতিপথ থেকে বিচ্যুত হয়, কম্পিউটারের নির্দেশে আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে সেই বিচ্যুতিটুকু শুধরে দেবে। মূল রকেটের দেহের সঙ্গে ছোট ছোট রকেট সংযুক্ত করা থাকে, যাদের মাঝে মাঝে চালু করে রকেটকে ঠিক পথে ছোটানো হয়। এ কাজটা অবশ্য অন্যরকমভাবে করার ব্যবস্থাও রকেটের মধ্যে থাকতে পারে।

কৃত্রিম উপগ্রহ যখন ওর কক্ষপথের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে, তখন কম্পিউটার-যন্ত্র বাহক-রকেটের শক্তি-ব্যবস্থাকে নিশ্চল করে দিয়ে ঘাড়ে চাপানো কৃত্রিম উপগ্রহ বা মহাকাশযানকে রকেট থেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলার যান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকরী করে তোলে।

র‍্যাডার-চালিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাতে বাহক-রকেটের মধ্যে একটি র‍্যাডার প্রেরকযন্ত্র থাকে। ঐ যন্ত্রটি থেকে ক্রমাগত সঙ্কেত মাটিতে কোন গ্রাহক-কেন্দ্রে এসে পৌঁছচ্ছে। গ্রাহক-কেন্দ্রে বসানো একটি কম্পিউটার এখানে ইলেকট্রনিক মগজের কাজটা করছে। রকেটের গতিপথের যা কিছু ত্রুটি, তা ঐ কম্পিউটারের নির্দেশে সংশোধিত হচ্ছে।

সোজা কথায়, একটি কৃত্রিম উপগ্রহ বা মহাকাশযানের আভ্যন্তরীণ প্রতিটি কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির সুষ্ঠুভাবে কাজ করে চলা সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত রয়েছে কম্পিউটারের হাতে। কম্পিউটার যদি কোন কারণে ভুল করে বসে, তাহলে আর রক্ষা নেই। একেবারে সর্বনাশ!

অবাধ পতনেদ মাঝে ঃ ওজন নেই

প্রতিটি কৃত্রিম উপগ্রহ বা মহাকাশযান পৃথিবীর চারপাশে এক উপবৃত্তাকার কক্ষপথে পৃথিবীর বাঁকা পিঠের সমান্তরাল পথে অবাধে পড়ে চলতে থাকে। আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি, অবাধে পতনশীল একটি বস্তুর কোন ওজনের অনুভূতি থাকে না। তার মানে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, প্রতিটি কৃত্রিম উপগ্রহ ও মহাকাশযান পৃথিবী-পরিক্রমাকালীন অবস্থায় এক সম্পূর্ণ ওজনবিহীন অবস্থার মধ্যে এসে পড়ছে।

একটি বস্তুর ওজন যে শুধু পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলের ওপর নির্ভর করে না, সে ব্যাপারটা আরো একটু বিশদভাবে আলোচনা করে দেখা ভাল। মনে করা যাক, একব্যক্তি একটি সাঁতার কাটার জলাশয়ের ডাইভিং বোর্ডের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন জলে ঝাঁপ খাবেন বলে এবং তার হাতের ওপর একটি ১০০ পাউণ্ড ওজনের

লোহার বার্বেল চাপানো রয়েছে। তিনি যতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন, বার্বেলটার পুরো ওজন হাতে অনুভব করবেন। কিন্তু যেই জলে ঝাঁপ খেলেন তখন কি বার্বেলটার ওজন হাতে অনুভব করবেন? একেবারেই না। শুধু বার্বেল নয়, নিজের শরীরটারও কোন ওজন তিনি অনুভব করবেন না। কিন্তু তা কতটুকু সময়ের জন্যে? যতক্ষণ তিনি বার্বেলটা নিয়ে অবাধে জলের দিকে পড়ছেন ততক্ষণের জন্যেই; কিন্তু যেই তার অবাধ পতনটা জলে এসে বাধা পেল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেমন হাতের বার্বেলটার ওজন অনুভব করবেন, তেমনি নিজের শরীরটারও ওজন অনুভব করবেন অবশ্য জলে সব বস্তুরই ওজন প্লবতার (buoyancy) জন্যে বেশ খানিকটা কমে যায়।

আগের দৃষ্টান্তটা থেকে আমরা যে ব্যাপারটা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি তা হচ্ছে এই যে, শুধু পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলের ওপর কোন বস্তুর ওজন নির্ভর করে না। যদি সেই অভিকর্ষ-বলের টানটা কোন কিছুর দ্বারা বাধা পায় (যেমন বার্বেল হাতে নিয়ে জলে এসে পড়বার সময় জলের দ্বারা সেই টানটা বাধা পাচ্ছে), একমাত্র তখনই আমরা ওজন অনুভব করি।

আমরা প্রত্যেকেই পৃথিবীর ওপর চলাফেরা করার সময় নিজেদের ওজন অনুভব করছি। এর কারণটা কী? পৃথিবী আপন অভিকর্ষ-বলের দ্বারা জমির ওপরকার প্রতিটি বস্তুকেই কেন্দ্রের দিকে টানছে, কিন্তু টেনে নামাতে পারছে কি? পারছে না, তার কারণ হল পায়ের তলার মাটির দ্বারা সেই টানটা বাধা পাচ্ছে। তাই আমরা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ নিজেদের ওজন অনুভব করছি, অন্য প্রতিটি বস্তুরও ওজন অনুভূত হচ্ছে।

কলার খোসায় পা পিছলে যদি কেউ কখনো পড়ে থাকেন, তাহলে পড়বার সময় শরীরটাকে কি বেশ হালকা মনে হয় না? এরকম মনে হবার কারণ হল এই—পৃথিবী তার যে কেন্দ্রের দিকে আমাদের টানছে আমরা সেদিকেই পড়ছি, টানটাকে বাধা দেবার চেষ্টা করলেও বাধা দিতে পারছি না। অবাধে পৃথিবীর দিকে পড়ছি বলেই শরীরটাকে হালকা মনে হচ্ছে।

তাহলে সোজা কথায় ওজন বলতে আমরা কী বুঝব? ওজন হল একটি বল, যে বলের দ্বারা পৃথিবী প্রতিটি বস্তুকে তার কেন্দ্রের দিকে টানছে। আমরা যে সব সময়েই এই বলটাকে অনুভব করছি তার কারণ হল এই যে, সেই বলটা পায়ের তলার মাটি বা অন্য কিছুর দ্বারা বাধা পাচ্ছে।

১০০ পাউণ্ড ওজনের একটি বস্তুকে যখন আমরা মাটি থেকে টেনে তুলি, তখন সেটা ১০০ পাউণ্ডের চেয়েও বেশি ওজনযুক্ত মনে হয়। তার কারণ হল এই যে, ১০০ পাউণ্ড পরিমাণ বলের দ্বারা পৃথিবী বস্তুটিকে তার কেন্দ্রের

দিকে টানছে। তাই তার ওপর ১০০ পাউণ্ডের চেয়ে বেশি বল প্রয়োগ করতে না পারলে বস্তুটিকে আদৌ মাটি থেকে তোলাই যাবে না। আবার ঐ ১০০ পাউণ্ডের বস্তুটিকেই যখন ওপর থেকে নিচে নামিয়ে রাখি, তখন সেটাকে ১০০ পাউণ্ডের চেয়ে অনেক বেশি হালকা মনে হয়। তার কারণ, পৃথিবী বস্তুটিকে যেদিকে টানছে, আমরা সেদিকেই ওকে নামিয়ে রাখছি; পৃথিবীর টানটাকে বাধা দেবার কোন চেষ্টা করছি না।

একটি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার সময় শরীরটার ওজন বেশি মনে হওয়া এবং সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসার সময় শরীরটাকে হালকা মনে হওয়ার মধ্যেও ঠিক একই ধরনের ব্যাপার ঘটছে।

কৃত্রিম উপগ্রহগুলোর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা যেভাবে ঘটছে তা হল এই যে, পৃথিবীর অভিকর্ষ-বল তাদের ওপর প্রায় পুরোমাত্রায় কজে করছে। পৃথিবী থেকে ওদের দূরত্ব অনুযায়ী এই অভিকর্ষ-বলের মাপটা খানিকটা কমবে সন্দেহ নেই (নিউটনের অভিকর্ষ-বলের সূত্র অনুযায়ী তার মাপটা সহজেই বার করে ফেলা যায়), তবে অভিকর্ষ-বলটা সব সময়েই রয়েছে। কিন্তু কৃত্রিম উপগ্রহগুলোর সামনের দিকে যে বিরাট ছুটটা, তা এমনই একটা মাপের যে সব সময়েই বিপরীত দিকে ক্রিয়াশীল কেন্দ্রাতিগ বলটা কেন্দ্রানুগ বলরূপী পৃথিবীর টানটাকে সামলে রাখছে। আর কৃত্রিম উপগ্রহগুলোর পৃথিবী-পরিক্রমা-পথের রাস্তাটাও তৈরি হয়েছে পৃথিবীর জমি থেকে এতটাই দূরে যে ওরা পৃথিবীর জমিটাকে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে অবাধে তার চারদিকে পড়েই চলবে। অবাধে পতনশীল একটি বস্তুর যে কোন ওজনের অনুভূতি থাকে না, তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

তাহলে আমাদের আলোচনা থেকে যে বক্তব্যগুলো পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে আসছে, সেগুলো হল ঃ—

(১) শুধু পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলের ওপর কোন বস্তুর ওজন নির্ভর করে না।

(২) পৃথিবীর অভিকর্ষ-বল যদি বাধা পায় (মাটি, জল বা অন্য কিছুর দ্বারা) তাহলেই কোন বস্তুর ওজন অনুভূত হয়।

(৩) অবাধে পতনশীল একটি বস্তুর কোন ওজনের অনুভূতি থাকে না।

সম্পূর্ণ ওজনবিহীন অবস্থায় মহাকাশযাত্রীদের কি ধরণের বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে এসে পড়তে হয়েছিল, সে আলোচনায় আমরা পরে আসব। তার আগে কৃত্রিম উপগ্রহেরা জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে যে নতুন দিগন্তকে উন্মুক্ত করেছে, তারই কিছু খবর আমরা সংগ্রহ করবার চেষ্টা করব।

৫

কৃত্রিম উপগ্রহদের বৈজ্ঞানিক অবদান

বহু অর্থব্যয় ও বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে যে কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্পুটনিকদের মহাকাশে পাঠানো হয়েছে, তা যে বিজ্ঞানীদের এক খামখেয়ালিপনা বা বৈজ্ঞানিক দুরূহ তত্ত্বের সমাধানের আত্মপ্রসাদ শুধু নয়, তা সবাই স্বীকার করবেন। নিছক বৈজ্ঞানিক গবেষণা যেমন মহাকাশ অভিযানের একটি বিশেষ অঙ্গ, তেমনি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কল্যাণ-সাধনের কাজেও এ এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

গবেষক ও কর্মী কৃত্রিম উপগ্রহ

এ-পর্যন্ত যত কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠানো হয়েছে, মোটামুটি দু-ভাগে তাদের ভাগ করা যায়। এক দলের নাম দেওয়া যেতে পারে 'গবেষক' কৃত্রিম উপগ্রহ, আর একদল হল 'কর্মী' কৃত্রিম উপগ্রহ। গবেষক কৃত্রিম উপগ্রহেরাও কিছু কিছু কাজ করে থাকে, তবে এই দু-দল কৃত্রিম উপগ্রহদের কাজের প্রকৃতির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর যে কৃত্রিম উপগ্রহটি মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল, সেটি ছিল একটি গবেষক কৃত্রিম উপগ্রহ। এর ওপরে একটি কাজ ন্যস্ত করা হয়েছিল। সেটি হল—বায়ুমণ্ডলের একেবারে ওপরতলার বায়ুর বাধার পরিমাণকে পরিমাপ করা। এর আরও একটি অনুসন্ধানের দায়িত্ব ছিল, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে মহাকাশে কি ধরনের বিকিরণ কতটা পরিমাণে রয়েছে তা আবিষ্কার করা। কৃত্রিম উপগ্রহটি দুটি কাজই সুষ্ঠুভাবে পালন করেছে।

আমরা প্রথমে গবেষক কৃত্রিম উপগ্রহদের দু-একটি কাজের বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

পিয়ার (বা ন্যাসপাতি)-আকৃতি পৃথিবী

১৯৬০-এর দশকে আমেরিকার একটি কৃত্রিম উপগ্রহের পৃথিবীর চারদিকে

ঘোরবার ধরনধারণকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরে-ছিলেন পৃথিবীর চেহারাটা ঠিক কমলালেবুর মত গোল নয়, অনেকটা পিয়ার বা ন্যাসপাতি ফলের মত। পৃথিবীর উত্তর মেরু অঞ্চলে খানিকটা জায়গা যেন আবের মত ঠেলে বেরিয়ে আছে আবার দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে সমপরিমাণ একটি জায়গা যেন ঠেলে ভেতরে বসানো রয়েছে।

পৃথিবীর এই নতুন চেহারার সন্ধান পেয়ে ভূবিজ্ঞানীরা খানিকটা বেকায়দায় পড়েছিলেন। কারণ পৃথিবীর জন্ম ও বিবর্তন সংক্রান্ত স্থিতিস্থাপকতা তত্ত্ব (Plasticity theory) অনুযায়ী পৃথিবীর চেহারার মধ্যে এই বৈসাদৃশ্যের আপাতত কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। সে যাই হোক, এ বিষয়ে গবেষণার মাধ্যমে পৃথিবীর বিবর্তন ও গঠনপ্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু রহস্যের কিনারা সম্ভবপর হতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করছিলেন।

কৃত্রিম উপগ্রহ ও বিকিরণ বলয়

১৯৫৮ সালের ৩১শে জানুয়ারী আমেরিকার প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশ-চারণের সময় দুটি তেজস্ক্রিয় বিকিরণ-বলয় আবিষ্কার করে। পৃথিবী থেকে বলয়দুটির সবচেয়ে তেজস্ক্রিয় অংশের দূরত্ব হল যথাক্রমে ৩২০০ ও ১৬০০০ কিলোমিটার। কাছের বলয়টি পৃথিবীর ৬০০ কিলোমিটার দূর থেকে শুরু হয়েছে। তৃতীয় আর-একটি বলয়ের সন্ধানও পাওয়া গেছে। সেটি পৃথিবীর জমি থেকে প্রায় ১০০,০০০ কিলোমিটার দূরে পৃথিবীর চৌম্বক-ক্ষেত্র এবং আন্তর্গ্রহ মহাকাশ অঞ্চলের সীমান্ত বরাবর অবস্থিত।

সোভিয়েট ও আমেরিকার বিজ্ঞানীদের গবেষণায় জানা গেছে যে প্রথম বলয়টি প্রধানত প্রোটন কণিকার দ্বারা গঠিত, যাদের শক্তির পরিমাণ প্রায় ১০০ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টের (একটি ইলেকট্রন এক ভোল্ট পরিমাণ বৈদ্যুতিক চাপের বিভবযুক্ত কোন ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে যাবার সময় যে শক্তি অর্জন করে, তাই হল এক ইলেকট্রন ভোল্ট) কাছাকাছি। এর প্রান্তভাগ কখনো কখনো পৃথিবীর ২০০ থেকে ৩০০ কিলোমিটারের মধ্যে নেমে আসে। দ্বিতীয় বলয়টি প্রধানত ইলেকট্রন কণিকার দ্বারা গঠিত, যাদের শক্তির পরিমাণ হল ১ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টের কাছাকাছি।

বলয়গুলির কণিকার উৎস হল সূর্য। সূর্য থেকে যাত্রা শুরু করে এই কণিকাগুলির কিছু অংশ পৃথিবীর চুম্বকরশ্মির বেড়াজালে বন্দী হয়ে পৃথিবীর চারদিকে বিকিরণ-বলয়গুলিকে তৈরি করেছে। সূর্যদেহে সৌরকলঙ্কের সংখ্যা ও তীব্রতা যখন বেড়ে ওঠে, তখন সূর্য থেকে নিঃসৃত সৌরকণিকা-স্রোতের

তীব্রতাও বৃদ্ধি পায় এবং স্বভাবতই বিকিরণ-বলয়গুলির কণিকাসমূহের শক্তির মাত্রাও বেড়ে ওঠে।

বিকিরণ-বলয়গুলির আবিষ্কার ঘটবার পর বিজ্ঞানীরা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন এই কারণে যে অদূর ভবিষ্যতে মানুষ মহাজাগতিক রকেটের যাত্রীরূপে এই বিকিরণ-বলয়গুলির মধ্য দিয়ে যখন চাঁদ বা অন্য গ্রহের দিকে অভিযান করবে, তখন বলয়ের ইলেকট্রন কণিকার সংঘাতে রকেটের ধাতুর দেহ থেকে সৃষ্টিলাভ করবে এমন জোরালো জাতের রঞ্জন-রশ্মি, যার প্রভাব আরোহী মানুষের পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারে। তবে তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন পৃথিবীর মেরু অঞ্চল বরাবর এই বলয়দুটোর গঠনের মধ্যে কিছুটা ফাঁক রয়েছে এবং ওর কণিকাদের শক্তির তীব্রতাও সূর্যের শান্ত পর্যায়ে স্তিমিত হয়ে আসে। এই দুটো বিষয়কেই তাঁরা বিচারের মধ্যে রেখেছিলেন।

পৃথিবীর চৌম্বক-ক্ষেত্র ও সৌর বায়ু

কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে বিকিরণ-বলয়ের গবেষণার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর চৌম্বক-ক্ষেত্রের গঠন-প্রকৃতির রহস্য ও সৌর বায়ুর প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা গেছে।

পৃথিবীর চৌম্বক-ক্ষেত্রের গঠন যে কয়েকটি ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ভূমিকা হল সৌর বায়ুর—সূর্য থেকে নিঃসৃত তড়িতাবিষ্ট কণিকার সমবায়ে যা গঠিত। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষেত্রের মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে, যার নাম চৌম্বক মণ্ডল (Magnetosphere)। বিভিন্ন কৃত্রিম উপগ্রহের অনুসন্ধানে জানা গেছে, পৃথিবীর জমি থেকে প্রায় ১,৪০০০০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত এই চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তির মাত্রার মধ্যে বড় মাপের কোন পরিবর্তন ঘটে না। এই শক্তির মাত্রা হল ২০ গামার মত (এখানে গামা হল চৌম্বক শক্তির একক এবং এর পরিমাণ এক গসের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ)। চৌম্বক মণ্ডল একটি সদা-পরিবর্তনশীল অঞ্চলের দ্বারা আবদ্ধ যার নাম হল ম্যাগনিটোপজ (Magnetopause)।

সৌর বায়ুর প্রভাবে ম্যাগনিটোপজের চেহারা সদা অস্থির, চঞ্চল ও পরিবর্তনশীল। সৌর বায়ুর সংঘাতে পৃথিবীর অন্ধকার দিকে চৌম্বক মণ্ডলের মেরু অঞ্চলের চুম্বক-রশ্মিগুল বেঁকে গিয়ে একটি লম্বা লেজের আকারে প্রায় ৩০০,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে। চৌম্বক মণ্ডলের সূর্যালোকিত অংশের চেহারাটা মোটামুটি স্থির ও অপরিবর্তনশীল। কৃত্রিম

উপগ্রহের অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, চৌম্বকমণ্ডলের এই লেজের অংশ সৌর বায়ুর প্রভাবাধীন। এই অনুসন্ধানের কাজ এখনো সম্পূর্ণ হয় নি।

সৌরবায়ু সম্বন্ধে বিভিন্ন কৃত্রিম উপগ্রহের গবেষণায় ধরা পড়েছে যে, পৃথিবীর কাছাকাছি এর বেগ সেকেণ্ডে ৪০০ কিলোমিটারে এসে পৌঁছয়। এ সূর্য থেকে সোজা বেরিয়ে আসে—কখনো একটানাভাবে, কখনো ঝলকে ঝলকে। সৌরদেহে সূর্যকলঙ্ক দেখা দিলে এর চেহারাটা আরো বড় হয়ে দাঁড়ায় এবং গতিও বেড়ে ওঠে।

সৌর বায়ুর ঘনত্ব সম্বন্ধে তথ্যের ব্যাপারটা খুব পরিষ্কার নয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের মহাকাশচারী রকেট লুনিক-১ ও লুনিক-২-এর কাছ থেকে জানা গিয়েছিল যে, মহাকাশ অঞ্চলে সৌরবায়ুর প্রবাহের মাপ প্রতি সেকেণ্ডে প্রতি বর্গ-সেন্টিমিটার ক্ষেত্রে ১০০ মিলিয়ন প্রোটনের মত। আমেরিকার এক্সপ্লোরার-এক্স ও মেরিনার-২-এর সংগৃহিত তথ্য হল এই যে, পৃথিবীর কাছাকাছি অঞ্চলে সৌর বায়ুর গড় ঘনত্ব বেশির ভাগ সময়ে ১ থেকে ১০টি প্রোটনের মত হতে দেখা যায়।

মহাকাশচারী রকেটগুলির মাধ্যমে সৌর বায়ুর গঠন-প্রকৃতি ও বিভিন্ন পরিমাপ সম্বন্ধে সংগৃহীত নানা তথ্যের মাধ্যমে সূর্য সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের ওপর খানিকটা আলোকপাত করা সম্ভব হয়েছে। সেটি হল, সৌর বায়ু সূর্যের দেহ থেকে কি পরিমাণে বস্তু ও শক্তি মহাকাশে চালান করে দিচ্ছে। আঙ্কিক হিসেবে দেখা যাচ্ছে, এই পরিমাণ হল এক সেকেণ্ডে ১০ লক্ষ টনের মত। সূর্যের বিগত ৫০০ কোটি (আনুমানিক) বছরের আয়ুষ্কালের মধ্যে খোয়া যাওয়া এই বস্তুর ভরের পরিমাণটা হল সূর্যের মোট ভরের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। তেমনি, সৌর বায়ুর বেগ তৈরির কাজে সূর্যের করোনাকে প্রসারণের জন্যে যে পরিমাণ শক্তি ইতিমধ্যেই খরচ হয়ে বসে আছে, তা সূর্য থেকে নিঃসৃত মোট শক্তির দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র। কাজেই দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।

কৃত্রিম উপগ্রহ ও জ্যোতির্বিদ্যা

অসীম মহাকাশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কত ধরনের তরঙ্গ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওপর এসে পৌঁছচ্ছে। তারাজগত থেকে আসে আলো ও বেতার-তরঙ্গ, অনেক নক্ষত্র পাঠায় বেগনি-পারের আলো, রঞ্জন রশ্মি ও গামা রশ্মি। আবার কিছু নক্ষত্র এবং মহাকাশের নানা অঞ্চল থেকে আসে মহাজাগতিক রশ্মি। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পেরিয়ে প্রবেশের ছাড়পত্র জোটে শুধু আলো এবং বেতার-তরঙ্গের—অন্য সব রশ্মি মাঝ-রাস্তায় বন্দী হয়ে পড়ে। সূর্যের বেগনি-

পান্নের আলো এবং সৌরকণিকা-স্রোত বায়ুমণ্ডলের ওপরতলায় অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন অণু ও পরমাণুর সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি করে আয়নমণ্ডলকে গড়ে তোলে।

জ্যোতির্বিদদের দীর্ঘকালের আক্ষেপ, এই বাধার জন্যে তারাজগত এবং ব্রহ্মাণ্ডের বহু সংবাদ থেকে তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন। কিন্তু কৃত্রিম উপগ্রহগুলি জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এক সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

১৯৬৭ সালের ১৮ই অক্টোবর সূর্য-গবেষণার জন্যে Orbit:ng Solar Observatory নামে এক নতুন ধরনের কৃত্রিম উপগ্রহ আমেরিকার বিজ্ঞানীরা পাঠিয়েছিলেন। ঐ কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে সূর্যের ৪০০০টি ছবি তুলে বেতার-সঙ্কেতের মাধ্যমে ফেরত পাঠায়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে এই প্রথম আল্ট্রাভায়োলেট আলোতে সূর্যের ছবি তোলা সম্ভব হল। স্পুটনিকের মধ্যে আল্ট্রা-ভায়োলেট স্পেকট্রোমিটাররূপী যে দূরবীন-যন্ত্রটি ছিল, তা অন্য সব আলোকে বাতিল করে সূর্যের করোনার মধ্যে যে-পরমাণুগুলি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে বিকিরণ ঘটাচ্ছে, ওদের আলোকেই গ্রহণ করেছিল। সূর্যের অভ্যন্তরে তাপ-পারমাণবিক সংযোজন প্রক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থগুলি কি পরিমাণে তৈরি হচ্ছে, আল্ট্রাভায়োলেট আলোতে গৃহীত সূর্যের ঐ ছবিগুলির মধ্যে তা সর্বপ্রথম ধরা পড়ল। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাধার জন্যে পৃথিবী থেকে ঐ জাতীয় ছবি তোলা কোনদিনই সম্ভবপর হত না।

ছবিগুলি ছিল এমনই নতুন ও বিচিত্র ধরনের যে, ওদের পুরো বিশ্লেষণের কাজ সম্পূর্ণ হতে বেশ কিছুদিন সময় লেগেছিল। পৃথিবীতে তাপ-পারমাণবিক প্রক্রিয়াকে ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি এই গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানীদের করায়ত্ত হতে পারে।

১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার মহাকাশযাত্রী রিচার্ড গর্ডন তাঁর মহাকাশযান থেকে ক্যামেরা-যন্ত্রে কিছু তারার আল্ট্রাভায়োলেট আলোর ছবি তুলেছিলেন। সেই ছবিগুলি বিশ্লেষণের কাজ সম্পূর্ণ হতে দীর্ঘ সতেরো মাস সময় লেগেছিল। সেই ছবিগুলির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করল এক বিরাট ধূলিমেঘ, যার ব্যাস হল ১২০ মিলিয়ন আলোক-বর্ষ। এই ধূলিমেঘ পৃথিবী থেকে ৪০০ মিলিয়ন আলোক-বর্ষ দূরে Orion নক্ষত্রপুঞ্জকে বৃত্তের আকারে সম্পূর্ণভাবে ঘিরে রয়েছে।

অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ফলে ধরা পড়ল, মেঘের ধুলোর কণিকাগুলি বৃত্তের বাইরের প্রান্তের দিকে জড়ো হয়ে আছে, যেখানে কালক্রমে ওদের একটি নক্ষত্ররূপে গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা রয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি বিরাট রহস্য, এই

ধূলিকণারা ক্রমাগত এক জায়গায় জড়ো হয়ে কিভাবে একটি নক্ষত্ররূপে গড়ে উঠছে, সেই পদ্ধতির মূল ব্যাপারটা সম্বন্ধে হয়ত ছবিগুলি একদিন আলোকপাত করতে পারবে।

মহাকাশ থেকে নিম্ন কম্পনসংখ্যার বেশির ভাগ বেতার-তরঙ্গই পৃথিবীতে কোনদিন এসে পৌঁছতে পারে না। সূর্য, বৃহস্পতি, Milky Way বা ছায়াপথ এবং অন্যান্য তারাজগত থেকে এইজাতীয় তরঙ্গ এসে পৌঁছচ্ছে। ১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে আমেরিকার বিজ্ঞানীরা এক্সপ্লোরার-৩৮ নামে একটি রেডিও জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়েছিলেন। পৃথিবী থেকে ৫৯৬৮ কিলোমিটার দূরে একটি বৃত্তাকার কক্ষপথে ঐ বস্তুটি পৃথিবীকে পরিক্রমা করে চলেছে। এই কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পাওয়া সঙ্কেতের সাহায্যে জ্যোতির্বিদেরা সর্বপ্রথম ছায়াপথের নিম্ন-কম্পন-সংখ্যার বেতার-তরঙ্গের একটি মানচিত্র তৈরি করতে পারলেন।

গবেষক কৃত্রিম উপগ্রহগুলির কিছু-কিছু কাজের পরিচয় আমরা লাভ করবার চেষ্টা করলাম। এবারে কর্মী কৃত্রিম উপগ্রহগুলির কাজের কিছুটা পরিচয় গ্রহণ করা যাক।

আকাশে আলোকস্তম্ভ

সীমাচিহ্নহীন সাগরের জলে জাহাজের সঠিক অবস্থানকে নির্ণয় করবার কাজ বহুদিন পর্যন্ত এক জটিল সমস্যা ছিল। কোন জায়গার অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার সঠিক পরিমাপ ছাড়া এই অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। অক্ষাংশ পরিমাপের ব্যাপারে ধ্রুবতারার সাহায্যের প্রয়োজন হত, কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলেই সাগরবক্ষে ভাসমান কোন জাহাজ বা আকাশচারী বিমানের পক্ষে ওদের অক্ষাংশ এবং ফলে সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। বেতারবিজ্ঞানের আবিষ্কার হবার পর এই সমস্যার সমাধান অনেকখানি সহজসাধ্য হয়েছে।

মহাকাশচারী বিমান এবং সাগরবক্ষে ভাসমান জাহাজ—এরা আজ ওদের সঠিক অবস্থানকে সর্বক্ষণের জন্যে অনেক সহজভাবে নির্ণয়ের কাজে নতুন একটি বন্ধুকে লাভ করেছে—সে হল মহাকাশচারী কৃত্রিম উপগ্রহ। কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে যে বেতার-তরঙ্গ এসে পৌঁছচ্ছে, জাহাজ বা বিমানের চালক নিজেদের অবস্থান থেকে একটি ভার্টিকাল বা ঊর্ধ্বরেখা (পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে জাহাজ বা বিমান পর্যন্ত অঙ্কিত কল্পিত রেখা) টেনে, কৃত্রিম উপগ্রহ সে রেখার সঙ্গে কত ডিগ্রি কোণ রচনা করছে, তা নির্ণয় করবার কাজে ঐ বেতার-তরঙ্গের সাহায্য

গ্রহণ করেন। এই কাজের জন্যে অবশ্য বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। তবে এই ব্যবস্থার সুবিধেটা হল এই যে, মেঘ বা কুয়াশা, সব রকম প্রাকৃতিক বাধার মধ্যে জাহাজ বা বিমানের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে।

সমুদ্রের বুকে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে অবস্থান নির্ণয়ের জন্যে জাহাজ বা বিমানের চালক ডপলার এফেক্টের ওপরেও নির্ভর করেন। একটি শব্দের উৎস যদি শ্রোতার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে, তাহলে শব্দের কম্পন-সংখ্যা এবং তীব্রতা ক্রমেই বেড়ে উঠছে বলে মনে হবে। আবার, শব্দের উৎস যদি শ্রোতার কাছ থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যেতে থাকে, তাহলে শব্দের কম্পন-সংখ্যা ও তীব্রতা দুই-ই কমে আসছে বলে মনে হবে। ডপলার বুঝতে পেরেছিলেন, শব্দের মত আলোর ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতিকে প্রয়োগ করা যাবে এবং কম্পন-সংখ্যার এই পরিবর্তনকে শব্দ বা আলোর একটি উৎসের এগিয়ে আসা বা পিছিয়ে যাবার বেগ নির্ণয়ের কাজে প্রয়োগ করা যাবে। এই ব্যাপারটিই 'ডপলার এফেক্ট' নামে পরিচিত।

আলোর মত একটি কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পাঠানো বেতার-তরঙ্গের কম্পন-সংখ্যা বাড়া বা কমার পরিমাপের মধ্য দিয়ে জানা যাবে যে কৃত্রিম উপগ্রহটি এগিয়ে আসছে, না দূরে চলে যাচ্ছে। অবশ্য এর জন্যে জাহাজ বা বিমানের চালককে জানতে হবে কোন্ নির্দিষ্ট সময়ে কৃত্রিম উপগ্রহটি ঠিক কোথায় রয়েছে, অর্থাৎ কৃত্রিম উপগ্রহের গতিপথের একটি মানচিত্র তার হাতে থাকা দরকার।

বায়ুমণ্ডলের সর্বোচ্চ স্তরগুলির সঙ্গে সংঘাত ঘটলে একটি কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথের চেহারায় পরিবর্তন ঘটবেই। কিন্তু উপগ্রহটিকে যদি সম্পূর্ণভাবে বায়ুমণ্ডলের বাইরে কোন কক্ষপথে প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে আগামী একমাস-ব্যাপী এর গতিপথ এবং অবস্থানগুলি কি হবে, তা অনেক আগেই নির্ণয় করে ফেলা সম্ভব হবে।

যদি চারটি কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবী থেকে ৬৪০ কিলোমিটার দূরত্বে একই বৃত্তাকার কক্ষপথে পরস্পরের কাছ থেকে সমান দূরত্বে স্থাপন করা যায়, তাহলে ঐ উচ্চতায় বায়ুমণ্ডলের অতি স্বল্প ঘনত্বের জন্যে সেখানকার গ্যাসীয় বস্তুগুলির সঙ্গে সংঘাতে কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথে বিচ্যুতি ঘটবার সম্ভাবনা নেই। ঐ দূরত্বে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবী-পরিক্রমার জন্য প্রায় দেড় ঘণ্টার মত সময় নেবে এবং পৃথিবীর যে কোন জায়গায় আকাশ থেকে কোন কৃত্রিম উপগ্রহের অন্তর্ধান ঘটবার ঠিক পনেরো মিনিটের মধ্যেই আর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ দিগন্তের কাছে উঁকি মারতে শুরু করবে।

একটির বেশি স্পুটনিক থাকবার সুবিধে হল এই যে, শক্তি-ব্যবস্থায় বিপর্যয় ঘটবার ফলে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে বেতার-সঙ্কেত পাঠাবার কাজ যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে বাকি তিনটি কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে আলোকস্তম্ভের মত জাহাজ বা বিমানের চালকদের অবস্থান নির্ণয়ের ব্যাপারে সাহায্য করে চলবে।

আবহাওয়া নির্ণয়কারী কৃত্রিম উপগ্রহ

বায়ুমণ্ডলের প্রথম স্তরটির নাম ট্রপোস্‌ফিয়ার। বাতাস, মেঘ, ঝড়, বৃষ্টি আবহাওয়া তৈরির গোটা কারখানাটাই হল এখানে। ট্রপোস্‌ফিয়ারের সমস্ত অঞ্চল জুড়ে যে-সব পরিবর্তন ঘটে চলেছে, পৃথিবীর কোন জায়গা থেকে তার একটি টুকরো ছবিই আমাদের চোখে পড়ে।

একটি আবহাওয়া স্টেশন ১০ কিলোমিটার পরিমিত একটি জায়গার আবহাওয়ার তথ্য সঠিকভাবে জানাতে পারে। পর্যবেক্ষণ বিমানের ক্ষেত্রে এই এলাকার পরিমাণ দাঁড়াবে ৮০ থেকে ৪৮০ বর্গ-কিলোমিটারের মত। আবহাওয়া তৈরির সমগ্র অঞ্চলের তুলনায় আমাদের পরীক্ষার নাগালের মধ্যে যে অঞ্চলটুকু পাওয়া যাচ্ছে তা খুবই ছোট, তাই আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস প্রায়ই বেঠিক হতে দেখা যায়।

একটি কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে আবহাওয়া পরিমাপের যন্ত্রপাতি বসিয়ে তাকে পৃথিবী পরিক্রমার কাজে লাগিয়ে দিলে ঐ স্বয়ংক্রিয় সন্ধানী যন্ত্রগুলির নাগালের মধ্যে পৃথিবীর প্রায় ৮,০০০০০ বর্গ-কিলোমিটার এলাকা ধরা পড়বে। যন্ত্রগুলি যে সব প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করছে, কোন গ্রাহক স্টেশনের ওপর দিয়ে যাবার সময় সেই তথ্যগুলিকে বেতার-তরঙ্গে রূপ পাল্টে ওর হাতে তুলে দিচ্ছে। সেই তথ্যগুলি সঙ্গে সঙ্গে বিশ্লেষিত হচ্ছে এবং মূল কেন্দ্রে পৌঁছে যাচ্ছে।

কোন কৃত্রিম উপগ্রহ চব্বিশ ঘণ্টায় প্রায় সতেরো বার পৃথিবীকে পরিক্রমার মধ্য দিয়ে ওর সমগ্র অঞ্চলগুলির ওপর পাড়ি জমাচ্ছে। পৃথিবীর জমি, সমগ্র মেঘের স্তর—প্রত্যেকে কি পরিমাণ তাপ প্রতিফলিত করছে, কৃত্রিম উপগ্রহের পরিমাপক যন্ত্রে তা ধরা পড়ে যায়। সঠিকভাবে আবহাওয়া নির্ণয়ের ব্যাপারে এই তথ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এছাড়া পৃথিবীর কোথায় মেঘের দল জটলা বেঁধে ঝড়-তুফানের ষড়যন্ত্র আঁটছে, স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা-যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম পগ্রহ তার ছবিগুলি চটপট তুলে নেয়। এইসব ছবির দৌলতে মেঘের গঠন, আকৃতি ও বিস্তৃতির বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নেফ্যান্যালিসিস নামে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানাবার এক নতুন পদ্ধতিই গড়ে উঠেছে।

আজকাল সাগরের বুকে ঝড় দানা বাঁধবার আগেই আবহাওয়া নির্ণয়কারী কৃত্রিম উপগ্রহ তার ছবি তুলে আমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। আরবের মরুভূমির ওপর ধুলোর ঝড়ের ছবি, মধ্য-এশিয়ার ওপর দিয়ে পঙ্গপালের উড়ে যাবার ছবি, মেরু অঞ্চলে হিমবাহ ভেঙে পড়বার ছবি এবং ভারতের দিকে মেঘের দলসমেত মৌসুমী বায়ুর এগিয়ে আসবার ছবিও আবহাওয়া নির্ণয়কারী কৃত্রিম উপগ্রহের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি।

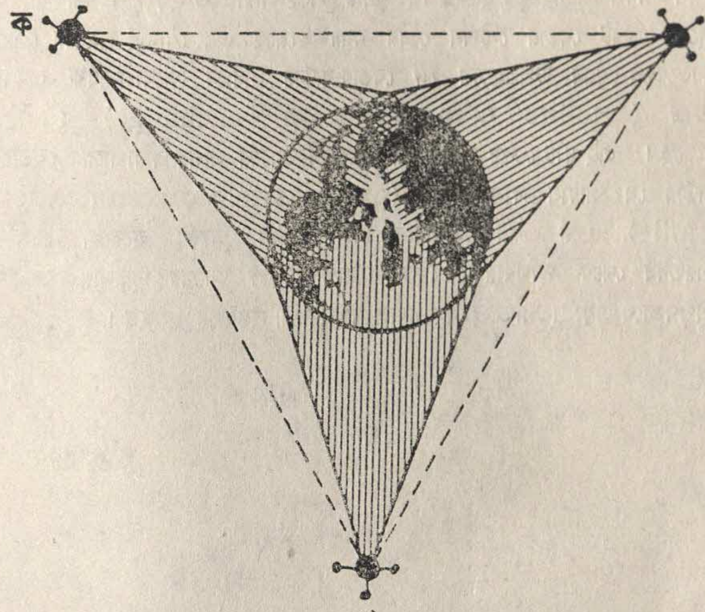
কৃত্রিম উপগ্রহ ও বেতারবিদ্যা

সূর্যের দেহের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাল রেখে আয়নমণ্ডলের গঠন-প্রকৃতির মধ্যে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এই পরিবর্তনের মাত্রা যখন অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে, তখন আয়নমণ্ডল বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলনের ক্ষমতা হারিয়ে বসে, বেতার-বার্তার আদান-প্রদান ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বানচাল হয়ে যায়।

বেতার-বিজ্ঞানীরা বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলকরূপে আয়নমণ্ডলের সঙ্গে কৃত্রিম উপগ্রহগুলিকেও কাজে লাগাতে শুরু করেছেন। Passive বা নিষ্ক্রিয় এবং **Active** বা সক্রিয়—দু-ধরনের কৃত্রিম উপগ্রহ এই কাজে নিযুক্ত রয়েছে। **Passive** কৃত্রিম উপগ্রহগুলির কাজ শুধু বেতার-তরঙ্গকে গ্রহণ করে তাকে প্রতিফলিত করা, কিন্তু **Active** কৃত্রিম উপগ্রহগুলি প্রতিফলনের সঙ্গে সঙ্গে বেতার-তরঙ্গের পরিবর্ধনের কাজও করে থাকে।

পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের পরিমাণ এত বিপুল পরিমাণে বেড়ে চলেছে যে এই কাজে নিযুক্ত প্রতিটি মাধ্যম ওদের কর্মক্ষমতার সর্বোচ্চ সীমায় চালু থেকেও সমগ্র চাহিদাকে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। বিজ্ঞানীরা এই সমস্যা সমাধানের জন্য এক অভিনব উপায়কে কার্যকরী করবার পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। তাঁরা জানতেন যে, পৃথিবী থেকে ৩৫,৮০০ কিলোমিটার দূরে পরস্পরের সঙ্গে সমান দূরত্ব বজায় রেখে যদি তিনটি কৃত্রিম উপগ্রহকে বসানো যায়, তাহলে ওদের কক্ষপথের বেগ পৃথিবীর আপন অক্ষের ওপর ঘূর্ণনবেগের সমান হবে এবং এদের এক-একটিকে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চল থেকে মাথার ওপরে সব সময়ে একই জায়গায় অবস্থান করতে দেখা যাবে। এই জাতীয় কৃত্রিম উপগ্রহের নাম দেওয়া হয়েছে **Synchronous satellite** বা পৃথিবীর আহ্নিক বেগের সমবেগসম্পন্ন কৃত্রিম উপগ্রহ। এরকম তিনটি উপগ্রহ মিলে সারা পৃথিবী জুড়ে বেতার-বার্তা ও টেলিভিশনের অনুষ্ঠান চলাচলের কাজ দিব্যি চালু রাখতে পারবে। ফলে,

প্রাকৃতিক বাধা, বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় এবং পর্বতপ্রমাণ যান্ত্রিক সমস্যা,—সব কিছুর হাত থেকে বেতার-বিজ্ঞানীরা রেহাই পাবেন।



পৃথিবী থেকে ৩৬০০০ কিলোমিটার দূরে দূরে পরস্পরের কাছ থেকে সমান দূরত্বে বসানো (একটি সমবাহু ত্রিভুজের আকারে) জিও-সিনক্রোনাস কৃত্রিম উপগ্রহ (ক, খ ও গ) সমস্ত পৃথিবীব্যাপী বেতার ও টেলিভিশনের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে চালু রাখতে পারে। ভারত-ভূখণ্ডের ওপর ইনস্যাট ১-বি হল এজাতীয় একটি কৃত্রিম উপগ্রহ।

বেতার-বার্তার আদান-প্রদান ব্যবস্থায় বিপুল উন্নতি সাধনের জন্যে তিনটি সিনক্রোনাস কৃত্রিম উপগ্রহ প্রতিষ্ঠার এই যে পরিকল্পনা, তাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্যে International Telecommunication Satellite Consortium নামে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে উঠেছে। এই সংস্থার ষাটটি সভ্য দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ অন্যতম। এই সংস্থা বেশ কিছুদিন আগেই প্রশান্ত, আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরের ওপর তিনটি সিনক্রোনাস কৃত্রিম উপগ্রহকে প্রতিষ্ঠা করেছে।

বেতার-বার্তার আদান-প্রদান ব্যবস্থায় যে নতুন দিগন্ত এভাবে উন্মুক্ত হতে চলেছে, তার সম্পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাবার জন্যে কর্মপ্রচেষ্টা ভারতবর্ষে অনেক দিন আগেই শুরু হয়েছে। পুণার কাছে আর্ভিতে ২৩০ একর জায়গা জুড়ে একটি বেতার স্টেশন তৈরি করা হয়েছে এবং বোম্বাই শহরের ফ্লোরা ফাউণ্টেনে কৃত্রিম উপগ্রহদের সঙ্গে বেতার-বার্তার মাধ্যমে সংযোগসাধক একটি কেন্দ্র (satellite communication exchange) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই দুটি কেন্দ্র চালু হবার ফলে ভারতবর্ষের সাগর-পারাপারের বেতার-বার্তার যে আদান-প্রদান ব্যবস্থা (overseas telecommunication traffic), তার ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ যেমন লাঘব হয়েছে, তেমনি ভারতবর্ষ থেকে পৃথিবীর যে-কোন জায়গার সঙ্গে আগের তুলনায় অনেক নিপুণভাবে এবং দ্রুতগতিতে যোগাযোগ সাধন করা সম্ভবপর হয়েছে।

৬

মহাকাশে মানুষ

কৃত্রিম উপগ্রহেরা দল বেঁধে মহাকাশে বৈজ্ঞানিক তথ্যসংগ্রহের কাজে নেমে পড়ার প্রায় সাড়ে তিন বছর বাদে মহাকাশে পাড়ি জমালেন পৃথিবীর প্রথম মানুষ। ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে। ঘটনার নায়ক ছিলেন সোভিয়েট ইউনিয়নের নাগরিক ইউরি গাগারিন।

পৃথিবী থেকে যাত্রা শুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাগারিনের মহাকাশযান ভোস্তক-১ তাঁকে পৌঁছে দিল মহাকাশে। ঘণ্টায় ২৮,৮০০ কিলোমিটার বেগে ৮৯ মিনিটে সমগ্র পৃথিবীকে একচক্কর ঘুরে এসে গাগারিন নিরাপদে স্বদেশ-ভূমিতে অবতরণ করেছিলেন।

গাগারিনের পৃথিবী পরিক্রমা-পথের চেহারা ছিল উপবৃত্তাকার, পৃথিবীর জমি থেকে যার অপভূ ও অনুভূ ছিল যথাক্রমে ২০০ ও ৩৩০ কিলোমিটার দূরে।

পৃথিবী থেকে যাত্রা শুরু করার সময় গাগারিনের মনে হচ্ছিল যেন তাঁর শরীরের চেয়ে দশগুণ ভারি একটি বোঝা কেউ তাঁর বুকের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলের টানের বিরুদ্ধে রকেটকে ছুটে বেরোতে হচ্ছে বলে মহাকাশযাত্রীকে এজাতীয় একটি পরিস্থিতির মুখোমুখি হতেই হবে। এজন্য বিস্তৃত প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে তাঁকে অবশ্য ইতিপূর্বেই তৈরি হতে হয়েছে।

গাগারিন যে মহাকাশযানের মধ্যে রয়েছেন, বাইরের অঞ্চলের সঙ্গে তার এতটুকু যোগাযোগ নেই। মহাকাশ-অঞ্চলে রয়েছে নানা ধরনের প্রাণঘাতী রশ্মি, কিন্তু ওরা তাঁর এতটুকু ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। এছাড়াও গাগারিনের পরিধানে রয়েছে মহাকাশ পোশাক। ঐ পোশাকের মধ্যে তাঁর প্রাণধারণের সমস্ত ব্যবস্থাই রয়েছে। কোন কারণে উল্কার সঙঘাতে মহাকাশযান ফুটো হয়ে গেলেও গাগারিনের বিপদগ্রস্ত হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। মহাকাশযানের মধ্যে যে বায়ুমণ্ডল রয়েছে, তার শতকরা ৪০ ভাগ হল অক্সিজেন, এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ছিল শতকরা এক ভাগেরও

কম। ঘরের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল ৬০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের মধ্যে।

ওজন নেই

যাত্রা শুরুর পাঁচ-ছ মিনিটের মধ্যে পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছলেন গাগারিন। তাঁর বাহক-রকেটের বিভিন্ন পর্যায়ের কাজ শেষ হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ এক ওজনবিহীন পরিস্থিতির মধ্যে এসে পড়লেন তিনি। তাঁর শরীরটা পালকের চেয়েও হালকা হয়ে বসে আছে।

পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছনোর পর কৃত্রিম উপগ্রহ বা মহাকাশযান কেন ওজনবিহীন পরিস্থিতির মধ্যে এসে পড়ে সে নিয়ে চতুর্থ অধ্যায়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলের নিচুটানকে মহাকাশযানের সামনের দিকের ছুট-জনিত বিপরীতমুখী কেন্দ্রানুগ বল সব সময়েই সামলে রেখেছে এবং মহাকাশযান অবাধে পৃথিবীর চারপাশে পড়ে চলেছে। অবাধে পতনশীল অবস্থায় কোন বস্তুর কিছুমাত্র ওজনের অনুভূতি থাকে না।

ওজনবিহীন পরিস্থিতিতে গাগারিন ঘরের মধ্যে প্রায় ভেসে বেড়াবার অবস্থা লাভ করেন। কোন নিচুটান না থাকার জন্যে গ্লাসভর্তি জল উপুড় করলেও একফোঁটা জল গলা দিয়ে গড়াবে না। উপায় কী? বাচ্চা ছেলেদের মত বোতলে পুরে চুষে খাওয়া বা খড় দিয়ে টেনে খাওয়া ছাড়া উপায় নেই। প্লেটের খাবার হাত বা চামচের ঠেলায় প্লেট থেকে ছিটকে বেরিয়ে জাড্য বা ইনার্শিয়ার ঝোঁকে ছুটতে ছুটতে ঘরের দেয়ালে বা ছাদে গিয়ে আটকে থাকতে পারে। খাবার জিনিসকে তরল করে নিয়ে বোতলে পুরে বা টুথপেস্টের মত পেস্টের আকারে টিউবে পুরে টিপে টিপে খাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

মহাকাশযাত্রীদের খাবার জন্যে যে ব্যবস্থাটা করা হয়েছিল তা হল এই—খাদ্যবস্তু থেকে জলীয় অংশ বার করে নিয়ে ওদের ছোট ছোট প্লাষ্টিকের প্যাকেটে পুরে রাখা হত। খাবার সময় ওদের আবার জলে নিষিক্ত করে নিয়ে মহাকাশযাত্রীরা খেয়েছেন। অবশ্যই নজর রাখতে হয়েছিল খাদ্যবস্তুরা যেন সুস্বাদু থাকে।

জীববিজ্ঞানীদের আগে একটি ভুল ধারণা ছিল যে ওজনবিহীন অবস্থায় খাবার-দাবার নাকি গলা দিয়ে পেটে নামতে চাইবে না, বরং পেটে যা কিছু আছে ওরা সবাই নিচুটানের অভাবে গলা দিয়ে ভাসতে ভাসতে বেরিয়ে চলে আসবে। খাবার জিনিস যে গলা দিয়ে পেটে নামে, তা কিন্তু ওজনের ওপর

আদৌ নির্ভর করে না। গলার খাদ্যনালীর চারপাশে চক্রাকার মাংসপেশী রয়েছে, যাদের সমবেত আন্দোলন এবং চাপের ফলেই খাবার পেটে গিয়ে পৌছোয়।

ওজনবিহীন অবস্থায় শরীরটা যেখানে সেখানে ভেসে বেড়াবার রাস্তা বন্ধ করার জন্যে গাগারিন বেল্ট দিয়ে বসবার আসনের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রেখেছিলেন। তবে মাঝে মাঝে অল্প সময়ের জন্যে তিনি যে গা-হাত-পা ভাসিয়ে তাঁর ছোট ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ান নি, এমন নয়। ওজনবিহীন অবস্থার বিচিত্র অনুভূতিগুলোর সঙ্গে পরিচয় অবশ্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে তাঁর পূর্বে অনেকবারই ঘটেছে।

ওজনবিহীন অবস্থায় মহাকাশযানের সব বস্তুই পালকের চেয়েও হালকা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ছাড়া অবস্থায় জিনিসগুলো ঘরের মধ্যে ভেসেও থাকতে পারে। কিন্তু ওদের জাড্যজনিত ভর পুরোমাত্রায়ই রয়েছে। অর্থাৎ, ওদের স্থানচ্যুত করতে হলে পৃথিবীতে যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করতে হত, মহাকাশযানের মধ্যেও ঠিক সেই একই পরিমাণ বলকে প্রয়োগ করতে হবে। আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি যে ভর ও ওজন কিন্তু এক ব্যাপার নয়।

বিচিত্র অভিজ্ঞতা

দেড়ঘণ্টার মহাকাশ-জীবনে গাগারিনের কয়েকটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা ঘটেছিল। দেড় ঘণ্টায় তিনি ৪৫ মিনিটের একটি দিন এবং ৪৫ মিনিটের একটি রাত পেয়েছিলেন। পৃথিবীতে ২৪ ঘণ্টায় একটি দিন ও রাত হয়। কিন্তু মহাকাশে গোটা পৃথিবীকে একচক্কর পাক খেতে গাগারিনের সময় লাগছিল মাত্র ৯০ মিনিট। পৃথিবীর সূর্যালোকিত পিঠটা তিনি পেরিয়ে যাচ্ছিলেন ৪৫ মিনিটের মধ্যেই। তার পরেই প্রবেশ করছিলেন অমানিশার কালো রাতের মত পৃথিবীর অন্ধকার পিঠটায়। সূর্যের আলোকে আড়াল করার জন্যে পৃথিবীর দেহের কালো ছায়াটা মহাকাশের বুকে ১৩,৭৬,০০০ কিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। সেই ছায়াটা বা অন্ধকার পিঠটা পেরোতেও সময় লাগছিল আরো ৪৫ মিনিট।

গাগারিন তাঁর স্বদেশভূমি থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন বুধবার দিন সকাল ন-টায়। তিনি যখন আমেরিকা মহাদেশের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সময়টা ছিল মঙ্গলবারের রাত্রিবেলা। গোটা পৃথিবীকে একচক্কর ঘুরে এসে তিনি যখন আবার নিজের দেশের মাটিতে নামলেন, তখন সময়টা ছিল বুধবারের সকাল এগারটা। তার মানে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে গাগারিন যেন পেছনে ফেলে আসা সময়টাকে ছুঁয়ে আবার বর্তমান সময়ে ফিরে এলেন।

ঘটনাটা এভাবে ঘটবার কারণ ছিল। পৃথিবীর আপন অক্ষের ওপর ঘূর্ণন-বেগ বা আহ্নিক গতির পরিমাণ হল ঘণ্টায় ১৭৬০ কিলোমিটার এবং এই বেগের জন্যেই পৃথিবীর দিন ও রাত হচ্ছে। গাগারিন ঘণ্টায় প্রায় ২৯,০০০ কিলোমিটার বেগে অর্থাৎ পৃথিবীর এই আহ্নিক গতির চেয়েও অনেক বেশি জোরে ছুটছিলেন বলেই পেছনে ফেলে আসা সময়টাকে ছুঁয়ে আসতে পারছিলেন। ঠিক এই একই কারণের জন্যে গাগারিন যখন পৃথিবীর দিকে তাকাচ্ছিলেন তখন দেখছিলেন, কী দ্রুতবেগে পৃথিবীর ভূ-ভাগের চেহারাটা পালটে যাচ্ছে। কখনো সমতল জমি, কখনো পাহাড়, কখনো সাগর বা মহাসাগরের অসীম জলরাশি তাঁর চোখে ধরা পড়ছিল।

গাগারিনই প্রথম মানুষের চোখ দিয়ে দেখলেন পৃথিবীর বর্তুলাকৃতি চেহারা। তাঁর চারদিকে মহাকাশের রঙ ছিল নিকষ কালো। এখানে বাতাস নেই বললেই চলে। পৃথিবী থেকে দিনের বেলা আমরা আকাশের রঙ নীল দেখি তার কারণ হল, সূর্যের আলোর সাতটা রঙের মধ্যে নীল রঙটাকে বাদ দিয়ে অন্য ছ-টা রঙকে বাতাসের অণু পরমাণুরা যে পরিমাণে ছড়ায়, তার চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃতভাবে (যে ব্যাপারটা পদার্থবিজ্ঞানে wide angle scattering নামে পরিচিত) ছড়ায় নীল রঙটাকে। নীল রঙটাই বেশি পরিমাণে আমাদের চোখের পর্দায় এসে ধরা পড়ে। কিন্তু বায়ুহীন মহাকাশে সূর্যের আলোর নীল রঙটাকে ছড়াবার কোন উপাদান নেই, তাই নিকষ কালো তার রঙ।

মহাকাশযানের যে দিকটা ছিল সূর্যের দিকে ফেরানো সে দিকটা প্রচণ্ড তাপে তপ্ত হয়ে উঠছিল, কিন্তু বিপরীত দিকটা ছিল শূন্য ডিগ্রিরও নিচে এক পরম শীতলতায় আচ্ছন্ন। এর কারণটা হল এই যে, সূর্যের আলো ও তাপকে প্রতিফলিত করে চারপাশে ছড়িয়ে দেবার মত বায়ুর উপাদান ঐ অঞ্চলে নেই। তাপের এই অসম অবস্থাকে মহাকাশযানের দেহে সমভাবে বণ্টনের জন্যে প্রতি এক ঘণ্টায় গ্যাস জেটের সাহায্যে ওকে এক পাক ঘোরানো হচ্ছিল।

পৃথিবীর পাহাড়, বন, শহর ও দ্বীপগুলোকে গাগারিন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন। একবার মনে হচ্ছে তিনি যেন পৃথিবীর ওপরে রয়েছেন, আবার মনে হচ্ছে পৃথিবীটা যেন তাঁর মাথার ওপরে ঝুলে রয়েছে। দিগন্তের কাছে রামধনুর সাতটা রঙ যেন হাত-ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে ছিল। বায়ুহীন শব্দহীন মহাকাশে কী অতলস্পর্শী নিস্তব্ধতা! পৃথিবী থেকে বায়ুমণ্ডলের বাধার জন্যেই নক্ষত্রগুলোকে যেমন আমরা মিটমিট করে জ্বলতে দেখি, তেমনি ওদের আসল উজ্জ্বলতার তুলনায় অনেক বেশি নিস্প্রভও মনে হয়। মহাকাশ থেকে সূর্যকেও দেখাচ্ছিল অনেক বেশি উজ্জ্বল।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গাগারিনের মহাকাশ-অভিযান সম্পূর্ণভাবে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল। গাগারিনকে এক মুহূর্তের জন্যে একটি যন্ত্রেরও কলকাঠি নাড়াচাড়া করতে হয়নি। বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সব সময়েই তাঁর যোগাযোগ রক্ষিত হচ্ছিল। যন্ত্রপাতির সংগৃহীত তথ্যগুলো শুধু তিনি বিজ্ঞানীদের জানিয়ে দিচ্ছিলেন। সমগ্র পৃথিবীকে একচক্কর ঘুরে গাগারিন যখন ঘন বায়ুস্তরের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর দিকে নেমে আসছেন, তখন মহাকাশযানের ঘণ্টায় ২৮,৮০০ কিলোমিটারের বেগটা কমানোর জন্যে রেট্রো-রকেট ব্যবস্থাকে চালু করে পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলের নিচুটানের উলটো দিকে একটা বেগ তৈরি করা হল। এ যেন এক দড়ির লড়াই শুরু হল, যে খেলায় পৃথিবীর দিকে দড়ির টানের জোরটা ছিল বেশি। ফলে মহাকাশযান ধীরে ধীরে পৃথিবীর দিকে নেমে আসতে শুরু করে এবং নামার বেগটা আরো কমাবার জন্যে ৭০০০ মিটার উঁচুতে অনেকগুলো প্যারাশুট খুলে দেওয়া হয়। ফলে পৃথিবীর মাটিতে নামার সময় মহাকাশযানের বেগ এসে দাঁড়ায় মাত্র ৩২ কিলোমিটারে।

পৃথিবীর মানুষের এই প্রথম মহাকাশ-অভিযানকে পরবর্তীকালের চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর অভিযানগুলোর পাশে নিষ্প্রভ মনে হতে পারে, কিন্তু তার ঐতিহাসিক মূল্য ও গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। মহাকাশ-অভিযানের ক্ষেত্রে যে নতুন পদক্ষেপ সেদিন শুরু হয়েছিল, তা-ই পরিণতি লাভ করেছে মানুষের চাঁদে নামার বিভিন্ন ঘটনা এবং সৌরলোকে গ্রহজগতের অনুসন্ধানের অভিযানে।

পৃথিবীর প্রথম মহাকাশচারী মানুষ ইউরি গাগারিন কয়েক বছর আগে এক মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ তাঁকে কোনদিনই ভুলে যাবে না। আজ থেকে বহু হাজার বছর বাদেও মানুষ তাঁকে স্মরণ করবে বিজ্ঞানের এক নবযুগের পথিকৃতরূপে।

মহাকাশের অভিযাত্রী

সোভিয়েট ইউনিয়ন ও আমেরিকার বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত বিভিন্ন মহাকাশ অভিযানে প্রায় ১০০ জনের মত যাত্রীকে মহাকাশে পাঠিয়েছেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন চাঁদকে পরিক্রমা এবং চাঁদের মাটিতে নেমে ফিরে এসেছেন। চাঁদের দেশের অভিযানের কথায় আমরা পরে আসব। অন্যান্য অভিযান সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় যাবার অবকাশ আমাদের নেই। এর মধ্যে কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনার কথাই উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৯৬১ সালের আগস্ট মাসে ২৪ ঘণ্টার বেশি পৃথিবীকে প্রথম পরিক্রমা

করেন সোভিয়েট ইউনিয়নের মহাকাশযাত্রী ঘেরমান তিতভ্। তিনি ১৭ বার পৃথিবীকে পরিক্রমা করেন এবং ২৪ ঘণ্টায় ১৭টি দিন ও ১৭টি রাত্রির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল।

১৯৬২ সালের আগস্ট মাসে পৃথিবীর প্রথম দ্বৈত মহাকাশ অভিযান ঘটে। সোভিয়েটের আন্দ্রিয়ান নিকোলায়েভ ও প্যাভেল পপোভিচ দুটি আলাদা মহাকাশযানে একই সঙ্গে পৃথিবীকে পরিক্রমা করেন এবং মহাকাশযানদুটিকে পরস্পরের খুব কাছেও নিয়ে আসেন। তাঁরা দু-জনে যথাক্রমে প্রায় চার দিন ও তিন দিন মহাকাশে কাটান।

পৃথিবীর প্রথম নারী মহাকাশযাত্রী সোভিয়েটের ভ্যালেন্তিনা তেরেস্‌কোভা মহাকাশে পাড়ি জমান ১৯৬৩ সালের জুন মাসে। তিনি প্রায় তিনদিন মহাকাশে ছিলেন।

পৃথিবীর প্রথম মহাকাশযাত্রী যিনি নিজের মহাকাশযান ছেড়ে মহাকাশে হেঁটেছিলেন তিনি হলেন সোভিয়েটের লিওনভ। ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটেছিল। লিওনভের পরিধানে ছিল মহাকাশের উপযোগী পোশাক, যে পোশাক তাঁকে মহাকাশের অতিবেগুনি রশ্মি, ও মহাজাগতিক রশ্মির আক্রমণ থেকে রক্ষা করছিল। তিনি একটি কঠিন বন্ধনীর দ্বারা মহাকাশযানের সঙ্গে বাঁধা ছিলেন এবং ১০ মিনিট মহাকাশে কাটান। ঘণ্টায় প্রায় ২৮,৮০০ কিলোমিটার বেগে ছুটতে থাকা অবস্থায় ঐ সময়টুকুর মধ্যে তিনি প্রায় ৬৫০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি জমিয়েছিলেন। নিজের এই বিপুল বেগ সম্বন্ধে লিওনভের কিন্তু কোনরকম ধারণাই ছিল না।

১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে পৃথিবী পরিক্রমাকালীন অবস্থায় প্রথম দুটি মহাকাশযানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন আমেরিকার মহাকাশযাত্রী আর্মস্ট্রং ও স্কট।

মহাকাশে সবচেয়ে বেশি সময়ের জন্যে হেঁটেছিলেন (স্পেস ওয়াক) আমেরিকার অলড্রিন। তিনি সাড়ে পাঁচ ঘণ্টারও বেশি সময় মহাকাশে হেঁটেছিলেন। ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৬৬ সালের নভেম্বর মাসে।

সত্তরের দশকে মহাকাশে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় যাপন করেছেন আমেরিকার তিন মহাকাশযাত্রী চার্লস কনরাড্, পল ভাইত্‌জ এবং জোসেফ কেরউইন। ১৯৭৩ সালের জুন-জুলাই মাসে মহাকাশ স্টেশন স্কাইল্যাবের অভিযাত্রীরূপে তাঁরা ২৮ দিন মহাকাশে যাপন করেন।

মহাকাশের শহীদ

১৯৬৩ সালের ২৩শে এপ্রিল সোভিয়েট মহাকাশযাত্রী কোমারভ মহাকাশ থেকে যখন পৃথিবীতে ফিরে আসছিলেন তখন মহাকাশযানের সঙ্গে ওর পেছনে খুলে দেয়া প্যারাশুটের কাপড়টা জড়িয়ে যায়। ফলে মহাকাশযানটি কয়েক কিলোমিটার ওপর থেকে ঠিক একখণ্ড পাথরের মত পৃথিবীর ওপর এসে আছড়ে পড়ে এবং কোমারভ শোচনীয়ভাবে প্রাণ হারান।

এই বেদনাদায়ক ঘটনাটির পর আর একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল ১৯৬৭ সালের মে মাসে। আমেরিকার কেপ কেনেডি মহাকাশবন্দরে স্যাটার্ন-৫ রকেটের মাথায় একটি অ্যাপোলো মহাকাশযানে আমেরিকার তিনজন মহাকাশযাত্রী ভার্জিল গ্রিসম, চ্যাফি ও হোয়াইট একটি বিশেষ পরীক্ষার জন্য অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ মহাকাশকক্ষের মধ্যে আগুন লেগে যায়। ফলে বহু-অভিজ্ঞ ঐ তিন জন অভিযাত্রী মুহূর্তের মধ্যে এক পরম যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর মুখে পতিত হন। তাঁদের উদ্ধার করার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরে অনুসন্ধানের ফলে জানা যায়, মহাকাশযানটির মধ্যে যে বাতাস ছিল, তা ছিল শতকরা ১০০ ভাগ অক্সিজেনে পূর্ণ। বৈদ্যুতিক তারের যোগাযোগ ব্যবস্থায় কোথাও সর্ট-সার্কিট হয়ে হঠাৎ আগুন ধরে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

মহাকাশজয়ের অভিযানে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও আমেরিকার আরো কয়েক-জন অভিযাত্রী শহীদ হয়েছেন। এঁদের কথায় আমরা যথাসময়ে আসব। গাগারিনের মত এঁদেরও পৃথিবীর মানুষ কোনদিন ভুলতে পারবে না।

এরপর মহাকাশ অভিযানের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ শুরু হল। চাঁদ হয়ে দাঁড়াল বিজ্ঞানীদের লক্ষ্যবস্তু। সে অভিযানের কথা শুরুর আগে চাঁদ সম্বন্ধে কিছুটা পরিচয় গ্রহণ করা যাক।

৭

চাঁদ

পৃথিবীর সবেধন নীলমণি একটিমাত্র স্বাভাবিক উপগ্রহ হল চাঁদ। চাঁদের দেশ সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহের শেষ নেই। বিজ্ঞানীদের মনেও কত যুগ ধরে কত প্রশ্ন এই চাঁদের দেশকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। গত কয়েক বছর ধরে চাঁদে নানা ধরনের মহাকাশ-অভিযানের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা চাঁদ সম্বন্ধে জানতেও পেরেছেন অনেক কিছুই।

১৬০৯ সালে দূরবীন-যন্ত্র আবিষ্কার করে গ্যালিলিও যেদিন প্রথম চাঁদের দিকে তাকিয়েছিলেন, সেই ঐতিহাসিক ঘটনার পর গত প্রায় ৩৮০ বছরের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে চাঁদ সম্বন্ধে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা যতটুকু জানতে পেরেছিলেন, চাঁদে অভিযান শুরুর প্রথম পাঁচ বছরে মহাকাশ গবেষণার মাধ্যমে তাঁরা জানতে পেরেছেন তার চেয়েও অনেক বেশি। এই গবেষণা-কাজে বিজ্ঞানীরা দূত করে পাঠিয়েছিলেন তিন দল মহাকাশযানকে। এদের এক দল সোজা গিয়ে চাঁদের জমির ওপর আছড়ে পড়েছিল। আর এক দল চাঁদের জমির ওপর গিয়ে নেমেছিল ধীর গতিতে। আর এক দল চাঁদের ক্ষুদে চাঁদ বা কৃত্রিম উপগ্রহরূপে চাঁদের চারপাশে পরিক্রমার কাজে নেমে পড়েছিল।

এই তিন দল বৈজ্ঞানিক স্টেশনের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা চাঁদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান-কাজ চালিয়ে কি জানতে পেরেছেন, সে আলোচনায় আমরা পরে আসব! এই বিরাট বিপুল অনুসন্ধান-কাজের পরেও চাঁদ সম্বন্ধে সেই পুরনো প্রশ্নগুলোর সমাধান কিন্তু আজও পর্যন্ত হয়নি ; চাঁদের জন্ম হয়েছিল কোথায় এবং কিভাবে? পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই কি চাঁদের জন্ম হয়েছিল, না একই ধূলোর মেঘের মধ্যে ধূলোকণা জমাট বাধার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মতই চাঁদও নিজের দেহকে গড়ে নিয়েছিল? অথবা, চাঁদ কি ছিল সূর্যেরই একটি গ্রহ ; কোন কারণে সে পৃথিবীর কাছাকাছি এসে পড়ার জন্যে পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলের টানে কি বন্দী হয়ে পড়েছে? এমনও কি হতে পারে যে প্রাচীন পৃথিবীর চারপাশে বিভিন্ন কক্ষপথে পরিক্রমারত গ্রহাণুদের সমবায়েই চাঁদ গড়ে উঠেছে? চাঁদে কোনদিন কোন বায়ুমণ্ডল ছিল কি?

এমনি কত বিচিত্র প্রশ্নের ভিড় জমে রয়েছে বিজ্ঞানীদের মনে। চাঁদে মানুষ নেমেছে। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি চান্দ্র-গবেষণার ক্ষেত্রে এক সম্পূর্ণ নতুন দিগন্তকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। চাঁদে অভিযানের সেই কাহিনী নিয়ে আলোচনা আমরা আরো পরে শুরু করব। গোড়াতে চাঁদ সম্বন্ধে মোটামুটি একটি পরিচয় গ্রহণের চেষ্টা করা যাক।

চাঁদের পরিচয়পত্র

পৃথিবীর তুলনায় চাঁদ আকারে ও আয়তনে অনেক ছোট। চাঁদের ব্যাস হল ৩৪৭৬ কিলোমিটার—পৃথিবীর ব্যাসের $\frac{১}{৪}$ ভাগের চেয়ে একটু বেশি। চাঁদের জমির মোট পরিমাণ হল প্রায় ৩৮ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার (১৩ মিলিয়ন বর্গ-মাইল) বা পৃথিবীর এলাকার মোট পরিমাণের ১/১৫ ভাগ। এ হল এশিয়া মহাদেশের সমপরিমাণ একটি জায়গা।

চাঁদের আয়তন (ভলিউম) হল পৃথিবীর আয়তনের $\frac{১}{৫০}$ ভাগ, অর্থাৎ কিনা পৃথিবী যে পরিমাণ জায়গা জুড়ে রয়েছে তার মধ্যে স্বচ্ছন্দে ৫০টি চাঁদের জায়গা করে দেওয়া যেতে পারে। চাঁদ যে বস্তুর সমবায়ে গড়ে উঠেছে, তার গড়পড়তা গুরুত্ব হল প্রতি ঘন-সেণ্টিমিটারে ৩·৩ গ্রামের মত, বা পৃথিবীর বস্তুর গড়পড়তা গুরুত্বের শতকরা ৬০ ভাগ।

চাঁদের ভর পৃথিবীর ভরের $\frac{১}{৮১}$ ভাগ। সেই আনুপাতিক হিসেবে দেখা যাচ্ছে, চাঁদের অভিকর্ষ-বলের পরিমাণ হল পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের $\frac{১}{৬}$ ভাগ। অর্থাৎ পৃথিবীতে কোন মানুষের ওজন যদি হয় ৬০ কিলোগ্রাম, তাহলে চাঁদে সেই ওজন হবে মাত্র ১০ কিলোগ্রাম।

চাঁদ এক উপবৃত্তাকার কক্ষপথে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে চলেছে। চাঁদ কিন্তু পৃথিবীর কেন্দ্রের চারদিকে ঘুরছে না। চাঁদের পরিক্রমা-পথের কেন্দ্র পৃথিবীর মধ্যে, কিন্তু পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে তা ৪৬২৫ কিলোমিটার দূরে। ঐ কেন্দ্র থেকে চাঁদের কক্ষপথের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দূরত্ব হল যথাক্রমে ৪,০৬,৬৭০ কিলোমিটার এবং ৩,৫৬,৪০০ কিলোমিটার। গড়পড়তা দূরত্ব তাহলে দাঁড়ায় ৩,৮৪,৪০০ কিলোমিটার। এ হল পৃথিবীর নিরক্ষীয় ব্যাসার্ধের প্রায় ৬০২৭ গুণ। চাঁদ থেকে পৃথিবীর যে দূরত্ব, তা পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি দুটি প্রতিবেশী গ্রহ শুক্র ও মঙ্গলের সঙ্গে আমাদের যে সর্বনিম্ন দূরত্বের ব্যবধান, তার শতকরা এক ভাগের চেয়েও কম।

পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে আসতে চাঁদের সময় লাগে ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিটের মত। কিন্তু পৃথিবীও যেহেতু সূর্যের চারদিকে ঘুরছে,

তার ফলে এক অমাবস্যা (যে সময় চাঁদ সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে অবস্থান করে) থেকে আর এক অমাবস্যা পর্যন্ত সময়ের মাপ দাঁড়ায় ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা। চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে আসতে যে সময় নেয়, তার মধ্যে চাঁদ নিজের অক্ষের চারদিকেও একবার ঘুরে আসে, যার ফলে চাঁদের একটি মাত্র পিঠই আমরা বরাবর দেখতে পাই। ব্যাপারটা কিভাবে ঘটছে, একটা ছোট পরীক্ষার মাধ্যমে তা সহজেই বোঝা যাবে। ঘরের মাঝখানে একটি আলো রেখে তার চারপাশে ঘোরা যাক। ঘোরার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন আমাদের সামনের দিকটাই আলোর দিকে ফেরানো থাকে, পেছনের দিকটা নয়। আলোটাকে একবার সম্পূর্ণ ঘুরে এলে দেখা যাবে, ঐ সময়টুকুর মধ্যে আমরা নিজেদের মেরুদণ্ডের চারদিকেও একবার ঘুরে এসেছি, অথচ আমাদের একটা দিকই বরাবর আলোর দিকে ফেরানো ছিল। চাঁদ ঠিক এই একই কায়দায় পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। পৃথিবীকে পরিক্রমার সময় চাঁদের থালাটা একপাশ থেকে আর একপাশে খানিকটা আন্দোলিত হয়ে থাকে। এই আন্দোলনকে বলা হয় লাইব্রেশন, এর জন্যে চাঁদের থালার অর্ধেকের চেয়ে খানিকটা বেশি জায়গা (শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ) আমাদের চোখে পড়ে।

চাঁদের ব্যাস যেহেতু পৃথিবীর ব্যাসের তুলনায় কম, তাই চাঁদের জমির বক্রতা পৃথিবীর তুলনায় অনেক বেশি। চাঁদের জমির ওপর দাঁড়িয়ে দিগন্তরেখা যেখানে ২½ কিলোমিটার দূরে দেখা যাবে, সেখানে পৃথিবীতে এই দিগন্ত রেখার দূরত্ব হল ৫ কিলোমিটারের মত।

চাঁদের সমুদ্র

পূর্ণিমার রাতে চাঁদের গোল থালাটার দিকে তাকিয়ে চাঁদকে কী অপরূপ সুন্দর একটি জগত বলেই না মনে হয়! চাঁদের এই চাঁদপানা মুখে কোন খুঁত কি থাকতে পারে? কিন্তু সেটা যে একান্তই আমাদের চোখের ভুল, তা বুঝতে বেশি দেরি হয় না। শুধু একটি দূরবীন-যন্ত্রের ভেতর দিয়ে চাঁদের দিকে তাকানোর অপেক্ষা আর কি।

দূরবীন-যন্ত্র ছাড়াই খোলা চোখে চাঁদের দিকে তাকালে একটা ব্যাপার আমাদের সহজেই চোখে পড়ে। সে হল চাঁদের সমস্ত থালাটা জুড়ে কালো-কালো ছোপ-ছোপ জায়গাগুলো। এই বিরাট সমতল ক্ষেত্রের মত জায়গাগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে মেরিয়া বা সমুদ্র। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইটালীয় জ্যোতির্বিদ গিওভান্নি রিকিওলি ওদের ঐ নামকরণ করেছিলেন। আসলে ওরা যে জলের সমুদ্র নয়, তা আমরা সবাই জানি। একদল চান্দ্রবিজ্ঞানীর মতে

ওরা হল জমাট-বাঁধা লাভার সমুদ্র। ওদের যে কালো দেখায় তার কারণ, চাঁদের ওপর যে সূর্যের আলো এসে পড়ছে, তার মাত্র শতকরা পাঁচভাগ অংশকে ওরা প্রতিফলিত করে থাকে।

চাঁদের মেরিয়াগুলোর উৎপত্তির ব্যাপার নিয়ে চান্দ্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে তর্কের শেষ আজও হয় নি। একদল বিজ্ঞানীর মতে ওদের সৃষ্টির মূলে উল্কাদের সঙ্ঘাতই ছিল প্রধান ঘটনা। দুই থেকে তিন কিলোমিটার ব্যাসের এক-একটি বিরাট উল্কাপিণ্ড প্রচণ্ডবেগে যখন বায়ুহীন চাঁদের জমির ওপর এসে আছড়ে পড়ত, তখন ওরা ঠিক একতাল মাখনের মধ্যে একটি ছুরির মতই সেই পাথুরে জমি ভেদ করে নিচে নেমে যেত। উল্কাদের সঙ্ঘাতের বেগে চাঁদের লক্ষ-লক্ষ টন পাথর গলে গিয়ে জ্বলন্ত লাভার স্রোতের আকারে বাইরে বেরিয়ে আসত। সেই লাভার নদী চাঁদের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলত এবং নাগালের মধ্যে যা কিছু পেত তাকেই গ্রাস করে ফলত। উঁচু নিচু সব জায়গা লাভার নদীর তলায় চাপা পড়ে গিয়ে এক-একটি সমতলক্ষেত্র উঠত জেগে। এই জ্বলন্ত লাভার স্রোতই নাকি কালক্রমে জমাট বেঁধে গিয়ে আজকের মেরিয়া বা চাঁদের সমুদ্রগুলোকে গড়ে তুলেছে।

মেরিয়াগুলোর উৎপত্তিকে অনেকে চাঁদের আভ্যন্তরীণ ঘটনার সঙ্গে সংযুক্ত বলেও মনে করেন। তাঁদের মতে চাঁদে এক সময়ে বহু আগ্নেয়গিরি ছিল। ঐ সব আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গারের সময় জ্বলন্ত লাভার স্রোত বেরিয়ে এসে জমাট বেঁধেই হয়ত চাঁদের সমুদ্রগুলোকে গড়ে তুলেছে।

আর একটি মত অনুযায়ী চাঁদ একদিন ছিল সৌরজগতের আর-একটি গ্রহ। কোন কারণে সে পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করে। যত সে এগিয়ে আসে ততই পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলের টানে চাঁদের জমির এক বিরাট অংশ পৃথিবীর দিকে ঠেলে ওঠার ফলে চাঁদের কঠিন দেহটার মধ্যে নানা ধরনের চাপ সৃষ্টি হতে থাকে। ফলে চাঁদের সর্বাঙ্গ জুড়ে যেমন গভীর সব ভাঙন দেখা দেয়, তেমনি ক্রমাগত ঘর্ষণের ফলে চাঁদের শিলাস্তরগুলোর তাপমাত্রাও গলনাঙ্কে (মেল্‌টিং পয়েন্ট) পৌঁছে যায়। আভ্যন্তরীণ গ্যাসের বিস্ফোরণের ফলে চাঁদের জমিটা ফুলে ফেঁপে উঠে অজস্র ফাটল এবং ছিদ্রপথ তৈরি করে বসে এবং সেইসব ছিদ্রপথের মধ্য দিয়ে তপ্ত ম্যাগ্‌মা বা গলিত শিলার স্রোত বন্যার মত বেরিয়ে আসতে শুরু করে। এই তপ্ত শিলার স্রোত ঢালু জায়গার ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলে এবং চাঁদের জমির ওপরকার পুরনো গঠনগুলোকে ভেঙে চুরে স্রোতের টানে ভাসিয়ে তলিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলতে থাকে।

এই জ্বলন্ত লাভার স্রোত কালক্রমে জমাট বেঁধে গিয়ে মেরিয়াগুলোর বৃত্তাকার সব ক্ষেত্র গড়ে তুলেছে। এই বন্যার তাণ্ডবে মেরিয়া অঞ্চলে আংটির মত চেহারার চাঁদের যে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখগুলো এবং পাহাড়গুলো মাথা উঁচিয়ে টিকে থাকতে পেরেছিল, তাদেরই সেখানে কোথাও কোথাও আজও নিঃসঙ্গ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এছাড়াও চাঁদের মেরিয়া বা সমুদ্র-গুলোর উৎপত্তি সম্বন্ধে আরো দু-একটি বৈজ্ঞানিক ধারণা চালু রয়েছে। মেরিয়া-গুলোর উৎপত্তির সঠিক কারণটা হয়ত আরো কিছুদিন অজানাই থেকে যাবে।

চাঁদের দৃশ্য পিঠের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ জায়গা জুড়ে রয়েছে তার সমুদ্রগুলো। চাঁদের সবচেয়ে বড় সমুদ্রটির নাম হল 'মেয়ার ইমব্রিয়াম'। কথাটি ল্যাটিন, বাংলা অর্থ হল বৃষ্টি-সাগর। সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের মহাজাগতিক রকেট লুনা-২ আছড়ে পড়েছিল চাঁদের যে তিনটি সমুদ্রের মাঝে, সেগুলোর নাম হল মেয়ার সেরেনিট্যাটিস, মেয়ার ট্র্যানকুইলিট্যাটিস ও মেয়ার ভেপারাম। এই ল্যাটিন কথাগুলোর বাংলা মানে হল প্রশান্তি সাগর, শান্তি সাগর এবং বাষ্প সাগর। স্বয়ংক্রিয় বৈজ্ঞানিক স্টেশন লুনা-৯ ও সার্ভেয়ার গিয়ে নেমেছিল আর-একটি সমুদ্রের ওপর, যার নাম হল 'ওসিয়ানাস প্রসিলেরাম' বা 'ঝড়ের সাগর'। এগুলোর নামকরণ যাঁরা করেছিলেন তাঁরা যে পরম রসিক ও কল্পনাবিলাসী ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই ; কারণ চাঁদে না আছে বৃষ্টি, না আছে জল ও বাষ্প, না আছে ঝড়ের কোন চিহ্ন। চাঁদে কোন আবহাওয়া নেই বললেই চলে। সে যাই হোক, যেমন খোলা চোখে তেমনি দূরবীনে, চাঁদের সাগরগুলোর দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ না হয়ে কিন্তু পারা যায় না।

চাঁদের দিকে খোলা চোখে কিংবা দূরবীন-যন্ত্রের ভেতর দিয়ে তাকালে আমাদের কাছে যেটা ধরা পড়ে সেটা হল এই যে, চাঁদের পৃষ্ঠভাগ মোটামুটি দু-ধরনের জমি দিয়ে তৈরি। একটির চেহারা ভাঙাচোরা ও অমসৃণ কিন্তু রঙটা বেশ উজ্জ্বল। এখানে যে-পরিমাণ সূর্যের আলো এসে পড়ে তার শতকরা প্রায় ১৮ ভাগ প্রতিফলিত হয়ে থাকে। আর একটি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি মসৃণ কিন্তু বেশ কালচে (কারণ এরা অনেক কম পরিমাণে সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে), এবং এদের চেহারাটা এতটাই সমতল যে আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় এরা বুঝি জলের মত কোন তরল পদার্থের এলাকা।

প্রথম ধরনের জমিকে সাধারণত মহাদেশ বলা হয়ে থাকে। এরা একটানাভাবে এক বিস্তৃত জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। চাঁদের দৃশ্য পিঠের প্রায় $\frac{২}{৩}$ ভাগ এবং অদৃশ্য পিঠের প্রায় $\frac{৯}{১০}$ ভাগ হল এই মহাদেশের এলাকা। সোজা কথায়, এরাই হল চাঁদের জমির প্রধান অংশ।

চাঁদের দৃশ্য ও অদৃশ্য পিঠের বাকি অংশ জুড়ে রয়েছে তার সমতলভূমি, মেরিয়া বা সমুদ্রগুলো। মেরিয়াগুলোর এলাকা জুড়ে রয়েছে প্রচুর ফাটল এবং মাঝে মাঝে ছাড়া-ছাড়াভাবে দু-একটা পাহাড় ও আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। পাহাড়ের সংখ্যা মহাদেশ এলাকাতেই বেশি।

অবশ্য পৃথিবীতে মহাদেশ ও সাগর বলতে আমরা যে ধরনের অঞ্চলকে বুঝি, চাঁদের জমিকে মহাদেশ ও সমুদ্র এই দু-ভাগে ভাগ করার মধ্যে কিন্তু সে-জাতীয় কোন মিল নেই। বোঝার সুবিধের জন্যেই এ জাতীয় একটি ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চাঁদের মহাকাশ এলাকার দিকে একটি ভালো জাতের দূরবীনের মধ্য দিয়ে তাকালে অজস্র পাহাড় এবং নানা ধরনের বিচিত্র চেহারার গঠন চোখে পড়বে। এদের সংখ্যা আবার চাঁদের উলটো পিঠেই বেশি। শিলাময় এই গঠনগুলোর নামকরণ করা হয়েছে 'ডোম'।

চাঁদের জ্বালামুখ

চাঁদের গঠনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রধান এবং সংখ্যার মাপেও সবচেয়ে বেশি হল তার আংটির মত গোলগাল চেহারার ক্রেটার বা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখগুলো।

চাঁদের দৃশ্য পিঠেই এই জ্বালামুখগুলোর ছড়াছড়ি। কি পার্বত্য অঞ্চল, কি মেরিয়া অঞ্চল, দু-জায়গাতেই এরা অজস্র সংখ্যায় ছড়িয়ে থেকে চাঁদের সর্বাঙ্গ জুড়ে গর্তে-ভরা সেই চিরপরিচিত চেহারাটাই আমাদের সামনে তুলে ধরে। চাঁদের দৃশ্য পিঠেই এক কিলোমিটারের চেয়ে বেশি ব্যাসযুক্ত জ্বালামুখের সংখ্যা নাকি তিন লক্ষের কাছাকাছি দাঁড়াবে। এর চেয়েও আকারে যারা ছোট, তাদের আলাদা-আলাদাভাবে গুনে ওঠাই এক অসম্ভব ব্যাপার।

চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছে ক্লেভিয়াস নামে যে জ্বালামুখটি রয়েছে, সেটিই হল সর্ববৃহৎ। এর ব্যাস হল প্রায় ২৩৫ কিলোমিটার। ঐ একই অঞ্চলে আইজ্যাক নিউটন নামে একটি জ্বালামুখ রয়েছে, পাদদেশ থেকে যার উচ্চতা হল প্রায় ৮৭০০ মিটার (২৯০০০ ফুট)।

চাঁদের জ্বালামুখগুলো প্রায় সবাই এখন ঠাণ্ডা হয়ে বসে আছে বলে বেশির ভাগ চান্দ্রবিজ্ঞানীর ধারণা। ১৯৫৮ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের জ্যোতির্বিদ কজিরেভ চাঁদের আলফনসাস নামে জ্বালামুখটি থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন। ফরাসী জ্যোতির্বিদ দুবোয়ার দূরবীনেও এ জাতীয় একটি ঘটনা ধরা পড়েছিল। এ ঘটনাটির অবশ্য অনেকেই নানারকমভাবে ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। কেউ বলেছেন, ওটা নেহাতই চোখের ভুল। আবার কেউ বলেছেন, চাঁদের

ভেতরে এখনো আগ্নেয় প্রক্রিয়া চলছে এবং আলফনসাস জ্বালামুখ থেকে আগ্নেয় গ্যাস বেরিয়ে আসার ঘটনাটিই দূরবীনে ধরা পড়েছিল।

চাঁদের থালাটা জুড়ে ওর জ্বালামুখগুলো সবাই বিভিন্ন সরল রেখার আকারে সারিবদ্ধ হয়ে আছে। ওদের চেহারার এবং মাপের মধ্যে বৈচিত্র্যের যেন আর শেষ নেই। এই বৈচিত্র্যের জন্যেই অনুমান করা হচ্ছে যে ওরা সবাই একইরকমভাবে এবং একই কারণের জন্যে গড়ে ওঠে নি। তাহলেও জ্বালামুখগুলোর অবস্থানের মধ্যে মোটামুটি একটা শৃঙ্খলার সন্ধান পেয়ে ওদের উৎপত্তি সম্বন্ধে চান্দ্রবিশেষজ্ঞেরা দুটি তত্ত্বকে দাঁড় করিয়েছেন।

একটি তত্ত্বের বক্তব্য হল, বায়ুহীন চাঁদের জীবনের প্রাথমিক অবস্থায় হাজার হাজার উল্কা এসে ওর জমির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। উল্কাদের আঘাতে লক্ষ লক্ষ টন পাথর শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে শূন্য স্থানগুলোয় ঐ জ্বালামুখগুলো তৈরি হয়ে বসে আছে। বিশেষজ্ঞেরা অবশ্য বলছেন যে বিরাট আকারের উল্কার সংঘাতেই যদি জ্বালামুখগুলো তৈরি হয়ে থাকে, তাহলে ওদের মুখের চেহারাগুলো হওয়া উচিত ছিল উপবৃত্তাকার। কারণ, উল্কাগুলো তেরছা পথেই জমির ওপর এসে সংঘাত সৃষ্টি করে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, চাঁদের বেশির ভাগ জ্বালামুখগুলোর চেহারা হচ্ছে বৃত্তাকার।

জ্বালামুখগুলোর উৎপত্তি সম্বন্ধে দ্বিতীয় যে তত্ত্বটি হাজির করা হয়েছে, তার মতে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গারই ছিল জ্বালামুখগুলোর উৎপত্তির কারণ। আজকের ঠাণ্ডা, মৃত আগ্নেয়গিরিগুলো একদিন ছিল জীবন্ত অবস্থায়।

চাঁদের অভ্যন্তরভাগ তেজস্ক্রিয় পদার্থের তেজস্ক্রিয়াজনিত বিকিরণের প্রভাবে প্রচণ্ডভাবে তপ্ত হয়ে উঠে আগ্নেয়গিরিগুলোকে সক্রিয় হতে সাহায্য করে থাকবে। আগ্নেয়গিরিগুলো মাঝে-মাঝেই ফুঁসে উঠত এবং বিপুল পরিমাণে জ্বলন্ত পাথর ও লাভা বা পাথরের গলিত স্রোতকে বাইরে ছুঁড়ে মারত। এমনি ধারার ব্যাপার সুদীর্ঘকাল ধরে চলতে চলতে চাঁদের জ্বালামুখগুলো ওদের বর্তমান আকৃতি এবং গভীরতা লাভ করে বসেছে।

চাঁদের কতকগুলো জ্বালামুখ থেকে একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। এ হল লম্বা লম্বা হাতের মত কতকগুলো রশ্মি, ঐ জ্বালামুখগুলো থেকে বেরিয়ে যায়া বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদের নামাঙ্কিত 'কোপার্নিকাস' নামে জ্বালামুখটি হল অতি উজ্জ্বল রশ্মির স্রষ্টা। অনেকের মতে, উল্কার সংঘাতে চাঁদের জমিতে যে বিস্ফোরণ ঘটছে, তার ফলে খুব পাতলা ময়দার মত পদার্থ চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। পৃথিবী থেকে এদেরই আমরা রশ্মির আকারে দেখি। এই রশ্মির

কোন ছায়া চাঁদের জমির ওপর পড়ে না এবং সূর্য যখন চাঁদের দিগন্তের কাছাকাছি থাকে তখন রশ্মিগুলো প্রায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

চাঁদের পাহাড় ও জমি

দূরবীনে চাঁদের আর-একটি বস্তু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে হল তার সমুন্নত পর্বতগুলো। অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণা, চাঁদের বিবর্তনের একটি পর্বে যখন তপ্ত থেকে ঠাণ্ডা হবার পালা শুরু হয়েছিল, তখনই হয়ত এই পর্বতগুলোর সৃষ্টি হয়ে থাকবে। গঠনপর্বের ঐ সময়টায় চাঁদের সারাটা দেহ জুড়ে বিরাট বড় বড় সব ফাটল জেগে উঠেছিল। আর সেই ফাটলের মধ্য দিয়ে শূন্যে হাজার হাজার মিটার মাথা তুলে রীতিমত জাঁকিয়ে বসে ছিল দৈত্যের মত চেহারার সব পাথরের খণ্ড। চাঁদের জীবনের একেবারে গোড়ার পাহাড়গুলোর যে খোঁচা-খোঁচা চেহারা ছিল, আজও তার কোন বদল হয় নি।

জল আর বাতাসই পৃথিবীর পাহাড়গুলোর প্রথম যুগের এবড়ো খেবড়ো চেহারাকে অমন মসৃণ ও সুঠাম করে তুলেছে। কিন্তু চাঁদে না আছে বাতাস, না আছে জল। কাজেই তার দেহে ক্ষয়ের পালা একরকম বন্ধ। চাঁদে যেটুকু ক্ষয় হয়, সে তার দিন ও রাতের তাপমাত্রার মধ্যে প্রচণ্ড তারতম্যের জন্যেই হয়ে থাকে।

চাঁদের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টির নাম হল 'মাউণ্ট লাইবনিৎস'—চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছে এটি রয়েছে। জার্মানির মহান দার্শনিক লাইবনিৎসের নাম অনুসারেই পাহাড়টির নামকরণ করা হয়েছিল। পাহাড়টির উচ্চতা হল প্রায় ১০,৬০০ মিটার (৩৫,০০০ ফুট) ; পৃথিবীর এভারেস্টের চেয়েও এ হল প্রায় ১৮০০ মিটার বেশি।

চাঁদের জমির গঠন নিয়ে এতদিন পর্যন্ত তর্কের যেন আর শেষ ছিল না। গোল্ড প্রমুখ জ্যোতির্বিদদের মতে, বায়ুহীন চাঁদের জমির ওপরটা কোটি কোটি বছর ধরে উল্কার সংঘাতে ফেটে চৌচির হয়ে বিরাট সব ধুলোর পাহাড় তৈরি হয়ে বসে আছে। এই ধুলোর স্তর নাকি কয়েকশো মিটার থেকে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত গভীর হতে পারে।

চাঁদের জমির গঠন-প্রকৃতি নিয়ে পরে অনেক আলোচনা করা হবে এবং চাঁদে মানুষের অবতরণের পর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে চাঁদের জমি সম্বন্ধে যে সব বিচিত্র তথ্য পাওয়া গেছে, সে আলোচনাতেও আমরা আসব।

চাঁদের জন্ম

চাঁদের জন্ম কিভাবে হল, সে নিয়ে কত জোরালো তর্ক-বিতর্ক চলছিল এতকাল ধরে। জর্জ ডারউইন (বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের নাতি) প্রমুখ বিজ্ঞানীদের মতে, চাঁদ একদিন নাকি পৃথিবীরই অংশ ছিল। পৃথিবীর বিবর্তন এবং গঠনপর্বের একটি বিশেষ অধ্যায়ে যখন তপ্ত অবস্থা থেকে ঠাণ্ডা হবার পালা চলেছে, তখন বিরাট কতকগুলো মহাজাগতিক ঘটনাচক্রে পৃথিবী থেকে একটি বড় আকারের বস্তুপিণ্ড ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে চাঁদের সৃষ্টি হয়েছিল। ডারউইন চাঁদের সাধারণ বস্তুর কম গুরুত্বের (density) মধ্যে এই ঘটনার প্রমাণ খুঁজে পাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, পৃথিবীর বাইরের ত্বকের (crust) হালকা, কম-গুরুত্বযুক্ত বস্তু থেকেই চাঁদ সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধে প্রশান্ত মহাসাগরের বিরাট গভীর খাতটাই নাকি চাঁদকে হারানোর সেই ক্ষতচিহ্ন।

চাঁদের সৃষ্টির এই তত্ত্বের পেছনে বিজ্ঞানীদের বিশেষ একটা সমর্থন পাওয়া যায় না। চাঁদের বস্তুর কম গুরুত্বের প্রসঙ্গটাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জ্যোতির্বিদ গোল্ড এমন কথাও বলেছিলেন যে চাঁদের জমির কয়েকশো মিটার নিচে নাকি বরফের এক পুরু স্তর রয়েছে, সেখানে আবার তাপমাত্রার কোন অদল বদলও হয় না।

চাঁদের জন্ম সম্বন্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞানী অটো স্মিথ প্রমুখের ধারণার সপক্ষেই যুক্তি অনেক বেশি। এই ধারণার মোদ্দা কথাটা হল এই, সূর্যের কাছাকাছি একটি বিরাট বিস্তৃত ধূলো ও গ্যাসের মেঘের মধ্যে দানা বাঁধবার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কালক্রমে আজকের গ্রহগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। সূর্যের আভিকর্ষ-বল প্রথম থেকেই গ্রহগুলোর এই গড়ার কাজে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। গ্রহগুলো তৈরি হবার সময় তাদের চারপাশে আবার কতকগুলো ধূলো ও গ্যাসের চক্র দানা বাঁধতে শুরু করে; এই ছোট চক্রগুলোই কালক্রমে আজকের উপগ্রহরূপে গড়ে উঠেছে। চাঁদের সৃষ্টি সম্বন্ধে এই ধারণাটিই এতকাল সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞানসম্মত বলে স্বীকৃতি লাভ করে এসেছে।

হ্যারল্ড ইউরে প্রমুখ বিজ্ঞানীরা আবার চাঁদকে পৃথিবীর উপগ্রহ বলে মনেই করেন না। এঁদের মতে চাঁদ ছিল সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের মতই একটি গ্রহ। চাঁদ নাকি বয়সেও ছিল পৃথিবীর থেকে প্রাচীন। পৃথিবীর গঠনপর্বের শেষ পর্যায়ে চাঁদ হয়ত পৃথিবীর কাছাকাছি এসে পড়েছিল এবং পৃথিবীর জোরালো আভিকর্ষ-বলের টানে বন্দী হয়ে এক উপবৃত্তাকার কক্ষপথে পৃথিবী পরিক্রমার মধ্য দিয়ে তার নতুন জীবন শুরু হয়েছিল।

এই ধারণার পেছনে মূল যুক্তিটা হল এই যে, সৌরজগতে অন্য উপগ্রহদের সঙ্গে তুলনায় আমাদের চাঁদ যে শুধু আকারে সবচেয়ে বড় তাই নয়, নিজের গ্রহ পৃথিবীর সঙ্গে মাপের অনুপাতেও সে সবাইকে টেক্কা দিতে পারে। শনির সবচেয়ে বড় উপগ্রহ হল টাইটান ; এর ব্যাস শনির ব্যাসের $\frac{১}{২০}$ ভাগ এবং ভর হল শনির ভরের $\frac{১}{৪৭০০}$ ভাগ। আমরা জানি, আমাদের চাঁদের ব্যাস পৃথিবীর $\frac{১}{৪}$ ভাগ, ভর পৃথিবীর ভরের $\frac{২}{৮১}$ ভাগ। এসব কারণের জন্যেই একদল বিজ্ঞানী পৃথিবী ও চাঁদকে একটি যুগ্ম-গ্রহ-ব্যবস্থা বলে অনুমান করে থাকেন।

চাঁদের ঠিকুজী

চাঁদ কি চিরদিন পৃথিবীর উপগ্রহ হয়ে থাকবে? বিজ্ঞানীরা বলছেন চাঁদের কক্ষপথ নাকি প্রতি বছর প্রায় ২.১৪ মিটার (৭ ফুট) করে সূর্যের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এভাবে বাড়তে বাড়তে চাঁদের দূরত্ব যেদিন পৃথিবী থেকে ১৬ লক্ষ কিলোমিটারে এসে দাঁড়াবে, সেদিন চাঁদ পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলের মায়া কাটিয়ে সূর্যের অভিকর্ষ-বলে বন্দী হয়ে সৌরজগতে আর একটি নতুন গ্রহের ভূমিকা গ্রহণ করে বসবে। চাঁদের সূর্য-পরিক্রমা পথ তখন তৈরি হবে পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যবর্তী অঞ্চলে।

চাঁদকে হারিয়ে পৃথিবীর জীবনে কয়েকটি বড় পরিবর্তন ঘটবে। চাঁদের আকর্ষণে সমুদ্রে যে জোয়ার-ভাঁটার সৃষ্টি হত, তা আর কোনদিন ঘটবে না। পৃথিবীর আকাশ আর কোনদিন ভরে উঠবে না জ্যোৎস্নার আলোয়। মানুষ আর কোনদিনই সূর্যগ্রহণ ঘটতে দেখবে না।

বিজ্ঞানীদের মতে গঠনপর্বের প্রথম অবস্থায় পৃথিবী নাকি আপন অক্ষের ওপর দশ ঘণ্টায় একবার করে পাক খেত। অর্থাৎ পৃথিবীর একটি দিন ও রাতের পরিমাণ তখন ছিল মোট দশ ঘণ্টা। চাঁদের আকর্ষণে সাগরের জলে প্রতিদিন যে দু-বার করে জোয়ারের সৃষ্টি হত, তা পৃথিবীর এই জোরালো আবর্তনের বেগকে কমানোর জন্যে ব্রেকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বর্তমানের তুলনায় চাঁদ নাকি তখন ছিল পৃথিবীর অনেক কাছে, চাঁদের আকর্ষণের জোরটাও ছিল বেশি। কয়েকশো কোটি বছর ধরে চাঁদের আকর্ষণরূপী ব্রেকটা ধীরে ধীরে পৃথিবীর আপন অক্ষের ওপর ঘূর্ণন বেগটাকে কমিয়েছে। ফলে ১০ ঘণ্টার জায়গায় আজ পৃথিবীতে ২৪ ঘণ্টায় একটি দিন ও একটি রাত হচ্ছে।

চাঁদে মানুষের অবতরণের পর চাঁদ সম্বন্ধে বিচিত্র যে সব তথ্য বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন, সে আলোচনায় আমরা পরে আসব। সেই ঘটনার আগে চাঁদে বিভিন্ন সময়ে স্বয়ংক্রিয় বৈজ্ঞানিক স্টেশন পাঠাবার যে অভিযানে বিজ্ঞানীরা নেমেছিলেন, সে আলোচনা শুরু করব।

৮

চাঁদে অভিযান

চাঁদের মাটিতে মানুষের পদচিহ্ন পড়েছে। অ্যাপোলো-১১ থেকে অ্যাপোলা-১৭, এই সাতটি চন্দ্র-অভিযানে বারজন অভিযাত্রী চাঁদে নেমে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ শেষ করে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। এই চমকপ্রদ ঘটনাগুলোর সঙ্গে আমরা বর্তমানে অনেকটাই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। কিন্তু চাঁদে রকেট পাঠানোর যে প্রথম পরীক্ষাগুলো বিজ্ঞানীরা চাঁদে মানুষ পাঠাবার প্রায় এক দশক আগে শুরু করেছিলেন, সেগুলোর মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা ছাড়া পরবর্তীকালের বিরাট সাফল্যগুলো অর্জন করা সম্ভবপর হত না। গতি-বিজ্ঞানের এক জটিল সমস্যাকে বিজ্ঞানীদের সেদিন সমাধান করতে হয়েছিল। চাঁদের দেশে মানুষের অভিযানের কথা আলোচনার আগে সেই প্রথম অভিযানগুলোর কথায় আসা যাক।

সৌরলোকে অতিথি

চাঁদের দেশে পৌঁছবার আগে পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলের টানকে কাটাতে হবে। তার জন্যে প্রয়োজন অনেক বেশি বেগ। পৃথিবীর চারপাশে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্যে চাই ঘণ্টায় ২৮,৮০০ কিলোমিটার বেগ। কিন্তু পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলের বিরুদ্ধে ছুটে চাঁদ, মঙ্গল বা শুক্রগ্রহের পথে পাড়ি জমাতে হলে চাই ঘণ্টায় ৪০,০০০ কিলোমিটারের বেগ। পৃথিবীর টানের বাঁধন বা মায়াকে কাটানোর চাবিকাঠি রয়েছে এই বেগের হাতে, তাই এর নাম হল নিষ্ক্রমণ বেগ (escape velocity)।

নিষ্ক্রমণ বেগ অর্জনের প্রথম সফল পরীক্ষায় হাত দিয়েছিলেন সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা ১৯৫৯ সালের ২রা জানুয়ারী তারিখে। তাঁরা লুনিক-১ নামে একটি স্বয়ংক্রিয় স্টেশনকে একটি মহাজাগতিক রকেটের মাথায় চাপিয়ে ঘণ্টায় ৪০,০০০ কিলোমিটার বেগে পৃথিবী থেকে ছুঁড়লেন, যেটি ৭০ ঘণ্টা বাদে চাঁদের জমির প্রায় ৬০০০ কিলোমিটার পাশ কাটিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হল সূর্যলোকে।

চাঁদের পাশ দিয়ে যাবার সময় লুনিকের বেগ অবশিষ্ট ছিল ঘণ্টায় মাত্র ৮০০০ কিলোমিটার, অর্থাৎ মাঝ-রাস্তায় লুনিকের ঘণ্টায় ৪০,০০০ কিলোমিটাররূপী প্রাথমিক বেগের বেশির ভাগটাই খোয়া গেছে। এর কারণ হল এই, পৃথিবী থেকে যাত্রা শুরুর পর মুহূর্ত থেকে সারাটা রাস্তা জুড়ে পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলের পিছুটান বারবার চেষ্টা করেছে লুনিককে ফিরিয়ে আনার জন্যে। এই টানের বিরুদ্ধে ছুটতে গিয়েই লুনিক মাঝপথে ওর ওই বিরাট বেগটাকে খুইয়েছে।

ঘণ্টায় ৮০০০ কিলোমিটারই যদি হত লুনিকের চলবার একমাত্র পাথেয়, তাহলে ও সোজা গিয়ে আছড়ে পড়ত সূর্যের অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে। কিন্তু সেটা হল না। লুনিক যখন শেষবারের মত পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করল, তখন পৃথিবী যেন তার এই বিদ্রোহী সন্তানকে আশীর্বাদ করল তার নিজের সূর্য প্রদক্ষিণের বেগ দিয়ে, যার পরিমাণ হল ঘণ্টায় প্রায় ১,০৬,০০০ কিলোমিটার। এই বেগ যুক্ত হল লুনিকের নিজের স্বল্প বেগের সঙ্গে।

ঘণ্টায় ১,১৪,০০০ কিলোমিটারের নতুন বেগ নিয়ে লুনিক এক সুদীর্ঘ পথ পেরিয়ে অবশেষে একদিন গিয়ে হাজির হল সূর্যলোকে। সূর্যের ন-টা গ্রহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লুনিক মানুষের হাতে গড়া প্রথম কৃত্রিম গ্রহের ভূমিকা নিয়ে সৌরলোকে নিজের আসনকে প্রতিষ্ঠিত করে বসল। কৃত্রিম গ্রহটির সূর্য-পরিক্রমা-পথ তৈরি হয়েছিল পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহের সূর্য পরিক্রমা-পথের মাঝামাঝি জায়গা দিয়ে।

চাঁদের পাশ দিয়ে যাবার সময় চাঁদের অভিকর্ষ-বলের টানে লুনিকের চলবার রাস্তাটা খানিক বেঁকে যায়। তার ফলে চাঁদের অভিকর্ষ-বল এবং গঠন-প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু তথ্য বিজ্ঞানীরা লুনিকের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতির কাছ থেকে জানতে পান। এছাড়াও নানাদি তথ্য সংগ্রহের জন্যে প্রয়োজনীয় আরো কিছু যন্ত্রপাতি লুনিকের মধ্যে ছিল।

সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং আমেরিকার বিজ্ঞানীরা এরপর আরো কয়েকটি কৃত্রিম গ্রহকে সৌরজগতে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই কৃত্রিম গ্রহগুলো সৌরজগতের স্বাভাবিক গ্রহগুলোর মতই কেপলারের গ্রহজগতের গতিসংক্রান্ত তিনটি নিয়মকে মেনে চলেছে। যাঁরা বিশ্বাস করেন, মানুষের জীবনের ওপরে গ্রহনক্ষত্রের প্রভাব রয়েছে, তাদের এখন থেকে হিসেব করতে হবে, মানুষের নিজের হাতে গড়া গ্রহগুলো তার জীবনের ওপরে কি প্রভাব সৃষ্টি করবে। আমরা আশা করব, সে প্রভাব শুভই হবে। আমরা অবশ্য নিশ্চিতভাবেই বিশ্বাস করি মানুষের জীবনের ওপর গ্রহনক্ষত্রদের আদৌ কোন প্রভাব নেই।

লুনিক-১-এর চাঁদে নামার কোন পরিকল্পনা ছিল না। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা সে কাজটি করালেন মহাজাগতিক রকেট লুনিক-২-কে দিয়ে। ১৯৫৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে পৃথিবী থেকে যাত্রা শুরুর প্রায় ৬০ ঘণ্টা বাদে লুনিক-২ সোজা গিয়ে আছড়ে পড়ল চাঁদের জমির একটি পূর্ব নির্দিষ্ট জায়গার। লুনিক-২ ছিল চাঁদে পৃথিবীর বস্তুজগতের প্রথম প্রতিনিধি।

আকাশের বুকে চাঁদকে একটি বেশ বড় লক্ষ্যবস্তু বলে মনে হলেও পৃথিবী থেকে রকেট ছুঁড়ে চাঁদকে আঘাত করা কাজটা কিন্তু বেজায় কঠিন। তার কারণ হল এই, পৃথিবী ও চাঁদ উভয়েই দুটি ভ্রাম্যমাণ বস্তু। পৃথিবী যেমন একটি নির্দিষ্ট বেগে সূর্যের চারদিকে ঘুরে চলেছে, চাঁদও তেমনি ঘণ্টায় প্রায় ৩৫০০ কিলোমিটার বেগে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে।

তার মানে, পৃথিবী থেকে রকেট ছুঁড়ে চাঁদকে আঘাত করার ঘটনাটা দাঁড়াচ্ছে, চলন্ত মোটরগাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে একটি উড়ন্ত পাখিকে গুলি করার মত ব্যাপার। কাজটা যে কতটা শক্ত, তা একজন বিজ্ঞানীর দেওয়া একটি উদাহরণ থেকেই বোঝা যাবে।

মনে করা যাক, একটি বড় ফুটবল খেলার মাঠের একটি গোলপোস্টের লাইন ধরে এক ব্যক্তি একটি মোটরগাড়ির ওপর চড়ে একদিকে ঘণ্টায় ৮ কিলোমিটার বেগে এগিয়ে চলেছে। উলটোদিকের গোলপোস্টের লাইন ধরে, একটি চার আনি, মনে করা যাক একই দিকে ঘণ্টায় ½ কিলোমিটার বেগে গড়িয়ে চলেছে। তাহলে, মোটরগাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে লোকটি একটি ঢিল ছুঁড়ে যদি চার আনিটিকে আঘাত করতে পারে, তবে গতিবিজ্ঞানের যে সমস্যাকে সে সমাধান করবে, পৃথিবী থেকে রকেট ছুঁড়ে চাঁদকে আঘাত করার কাজটা তার চেয়েও শক্ত।

লুনিক-২ যদি চাঁদের দিকে এগিয়ে চলার নির্দিষ্ট রাস্তা থেকে মাত্র আধ ডিগ্রির মত বিচ্যুত বা বিপথগামী হত, তাহলে সে চাঁদের জমির ৮,০০০ থেকে ১০,০০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে বেরিয়ে চলে যেত। লুনিকের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতি সারাটা রাস্তা ধরে তাকে এক অভ্রান্ত পথে ছুটতে সাহায্য করেছিল।

লুনিক-২ ঘণ্টায় প্রায় ৪০০০ কিলোমিটার বেগে চাঁদের জমির ওপরে এসে আছড়ে পড়ে। ফলে মহাজাগতিক যানটির সর্বাঙ্গ চুরমার হয়ে যায়। কিন্তু চাঁদের জমিতে আছড়ে পড়ার আগের মুহূর্তে সোভিয়েট রাষ্ট্রের একটি

প্রতীক চিহ্নকে যানটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলতোভাবে (soft landing) চাঁদের জমিতে নামানো হয়। সেটি অক্ষতই থেকে যায়।

সমগ্র মহাজাগতিক যানটিকে বীজাণুমুক্ত করে চাঁদে পাঠানো হয়েছিল। কেননা যানটির সঙ্গে সংযুক্তভাবে পৃথিবীর কিছু বীজাণু যদি চাঁদে গিয়ে হাজির হত, তাহলে ওরা যে চাঁদের বীজাণুদের ক্ষেত্রে (পরবর্তীকালে বিস্তৃত অনুসন্ধানে জানা যায় চাঁদে আদৌ কোন বীজাণু নেই) কী বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে বসত তা আগে থেকে বলা যায় না। বিশেষ করে তারই জন্যে বিজ্ঞানীরা এই সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন।

লুনিক-২-এর আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতির মাধ্যমে চাঁদ সম্বন্ধে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্যও বিজ্ঞানীরা লাভ করেছিলেন।

অদৃশ্য পিঠের অবগুণ্ঠন মোচন

পরবর্তী চন্দ্র-অভিযানটি ছিল অনেক বেশি চমকপ্রদ। ১৯৫৯ সালের ৪ঠা অক্টোবর মহাকাশে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বার্ষিকীতে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা লুনিক-৩ নামে একটি স্বয়ংক্রিয় মহাজাগতিক স্টেশনকে চাঁদের দিকে পাঠালেন। যাত্রা শুরুর প্রায় ৬ দিন বাদে লুনিক-৩ চাঁদের উল্টো পিঠের ওপরে এসে হাজির হল। চাঁদ এমন এক বিচিত্র কায়দায় পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, যার জন্যে ঐ পিঠটাকে আমরা কখনোই দেখতে পাই না। ঘরের মাঝখানে একটি আলোকে রেখে যদি কেউ তার চারদিকে এমনভাবে ঘুরতে থাকে যাতে তার সামনের দিকটাই আলোর দিকে ফেরানো থাকে তাহলে চাঁদকে একচক্কর ঘুরে আসার পর সে দেখতে পাবে যে নিজের মেরুদণ্ডের চারপাশেও ঐ একই সময়ে সে একবার ঘুরে এসেছে অথচ তার পেছনের দিকটাতে কখনো আলো পড়ে নি। চাঁদ ঠিক একই রকম ভাবে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। (এ ব্যাপারটার কথা আমরা আগেও আলোচনা করেছি)।

সময়টা ছিল কৃষ্ণপক্ষ, অর্থাৎ চাঁদের অবস্থানটা ছিল পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে। সূর্যের আলোয় চাঁদের উল্টো পিঠটা একেবারে উদ্ভাসিত হয়ে যাচ্ছিল। লুনিক-৩ যখন চাঁদের অদৃশ্য পিঠ থেকে প্রায় ৬৪,০০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে চলেছে, তখন পৃথিবী থেকে দুটি অতি উচ্চ-কম্পনসংখ্যার বেতার-সঙ্কেতকে ছোঁড়া হল। ওরা এসে যান্ত্রিক উপায়ে লুনিকের দুটো জানলা দিল খুলে। জানলার পেছনে বসানো ছিল দুটি ক্যামেরা যন্ত্র ; ওরা আপনা-আপনি চাঁদের উল্টো পিঠের ওপর ফোকাস করে ধরল এবং পুরো ৪০ মিনিট ধরে চাঁদের

অদৃশ্য পিঠের শতকরা ৭০ ভাগ জায়গার ছবি তুলল। লুনিক-৩ এর আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতি ঐ ছবিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিস্ফুটন করল। তারপর ঐ সব ছবির প্রিন্ট তৈরি করা হল, ওদের শুকোনো হল এবং কয়েকদিনের জন্যে সংরক্ষণ করে রাখা হল।

লুনিক-৩ যখন চাঁদের উল্টো পিঠকে ঘুরে এগিয়ে আসতে আসতে পৃথিবীর কাছাকাছি এসে পৌঁছল, তখন ওর আভ্যন্তরীণ টেলিভিশন ক্যামেরা সেই ছবিকে বিশ্লেষণ করে (scan), বেতার-তরঙ্গে রূপ পালটে সোভিয়েট ইউনিয়নের ক্রিমিয়া অঞ্চলের গবেষণা-কেন্দ্রগুলোতে ফেরত পাঠাতে আরম্ভ করল। সেখানে টেলিভিশন গ্রাহক-যন্ত্রে ঐ বেতার-তরঙ্গগুলো আবার আলোক-তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে চাঁদের উল্টো পিঠের এক আশ্চর্য সুন্দর ছবিকে বিজ্ঞানীদের কাছে উদ্‌ঘাটিত করে বসল।

ঐ ছবিগুলোকে বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা দেখলেন, চাঁদের দৃশ্য পিঠের তুলনায় অদৃশ্য পিঠে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের সংখ্যা অনেক বেশি এবং মেরিয়া বা জমাট-বাঁধা লাভার সমুদ্রের সংখ্যাও অনেক কম।

চাঁদের দুই পিঠের গঠন-প্রকৃতির মধ্যে এত তফাত কেন, তাই নিয়ে বিজ্ঞানীদের ভাবনা গেল বেড়ে। অনেকে মন্তব্য করলেন, পৃথিবী চাঁদের পিঠটাকে অনেকটা আড়াল করে রয়েছে বলেই উল্কার সংঘাতে জ্বালামুখরূপী ক্ষতচিহ্নের সংখ্যা সেখানে কম।

এরপর ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা চাঁদের জীবনের শান্তিকে আর বিঘ্নিত করেন নি। ১৯৬১ সাল থেকে মহাকাশে মানুষ পাঠানোর অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন তাঁরা। এরপর আবার অবিশ্রান্তভাবে চাঁদে অভিযানের পালা শুরু হল। বিজ্ঞানীদের দূত হয়ে যারা চাঁদে পাড়ি জমাল, তারা কেউ চাঁদের জমির ওপর আছড়ে নামল, কেউ নামল আলতোভাবে, আবার কেউ চাঁদেরই ক্ষুদে চাঁদ বা কৃত্রিম উপগ্রহরূপে চরকিবাজির মত তার চারপাশে ঘুরপাক খেতে শুরু করল।

চন্দ্রগামী এই মহাকাশযানগুলোর দৌলতে চাঁদ সম্বন্ধে যে বিরাট বিপুল বৈজ্ঞানিক তথ্য বিজ্ঞানীরা সংগ্রহ করলেন, এবারে সে আলোচনাতে আমরা আসব।

৯

মহাকাশ অভিযান ও পৃথিবীর চাঁদ

মহাকাশে চাঁদ আমাদের সবচেয়ে কাছাকাছি বস্তু হওয়ার জন্যে আলোক-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে চাঁদকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগটা সব সময়েই রয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাঞ্চল্য ও আলোড়ন আলোক-দূরবীনের সাহায্যে চাঁদকে দেখার পথে এক বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়াবার ফলে চন্দ্র-গবেষণার পরিধি এতকাল সীমাবদ্ধ হয়ে ছিল। চাঁদের জমির ওপর সবচেয়ে ছোট যে বস্তুর গঠন পৃথিবীর আলোক-দূরবীনের আয়ত্তের মধ্যে ধরা দিচ্ছিল, তা আকারে আধ কিলোমিটারের চেয়ে বড় নয়। বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে চাঁদের জমির গঠন-প্রকৃতি পরীক্ষার কাজ পঞ্চাশের দশক থেকেই শুরু হয়েছিল।

চান্দ্র গবেষণার প্রথম পর্ব

চন্দ্র-গবেষণার প্রথম পর্যায়ে বিজ্ঞানীদের কাছে দুটি পথ খোলা ছিল—একটি হল, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে কোন কক্ষপথে আলোক-দূরবীক্ষণ-সমন্বিত কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়ে চাঁদের জমির খুঁটিনাটি গঠনকে পর্যবেক্ষণ করা। অপরটি হল, চাঁদের জমির খুব কাছে স্বয়ংক্রিয় মহাজাগতিক স্টেশনকে পাঠিয়ে আরো সুষ্ঠুভাবে চন্দ্র-গবেষণার কাজকে পরিচালিত করা। বিজ্ঞানীরা দ্বিতীয় পথটিকেই বেছে নিলেন।

পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলকে কাটিয়ে চাঁদের দেশে মহাকাশযান পাঠাবার প্রচেষ্টা ১৯৫৮ সাল থেকেই শুরু হয়েছিল। ঐ বছর যথাক্রমে ১১ই অক্টোবর ও ৬ই ডিসেম্বর আমেরিকার বিজ্ঞানীরা চাঁদের দিকে পায়োনীয়ার-১ ও পায়োনীয়ার-৩ নামে দুটি মহাকাশযান ছুঁড়লেন, কিন্তু ওরা পৃথিবী থেকে মাত্র ১,২০,০০০ ও ১০,১৭২৮ কিলোমিটার পর্যন্ত পাড়ি জমাতে পেরেছিল।

চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছবার প্রথম কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা, সে কথা আগেই বলেছি।

সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞানীদের পাঠানো স্বয়ংক্রিয় মহাজাগতিক

স্টেশন লুনা-৩ চাঁদের উলটো পিঠের শতকরা ২৮ ভাগ জায়গার ছবি তুলতে পেরেছিল। ঐ পিঠের শতকরা ১৩ ভাগ জায়গা মহাকাশযানটির দৃষ্টির আড়ালে ছিল। ১৯৬৫ সালের ২০শে জুলাই আর-একটি সোভিয়েট মহাকাশযান জোন্‌দ্‌-৩ বাকি অংশের প্রায় সবটুকুরই ছবি তুলে নেয়। এর পরও চাঁদের উলটো পিঠের যে অতি সামান্য জায়গার ছবি নেবার কাজ বাকি রয়ে গেল, তা ১৯৬৭ সালে আমেরিকার মহাকাশযান অরবিটার-৫ সম্পূর্ণ করে তোলে।

চাঁদের জমিতে আছড়ে পড়া

এরপর চন্দ্র-গবেষণার এক নতুন অধ্যায় শুরু হল। ১৯৬২ সালের ২৩শে এপ্রিল থেকে শুরু করে ১৯৬৭ সালের ৭ই নভেম্বরের মধ্যে সবশুদ্ধ দশটি মহাকাশযান চাঁদের জমিতে আছড়ে পড়ল—এর মধ্যে ছ-টি পাঠিয়েছিলেন আমেরিকার বিজ্ঞানীরা, আর তিনটি সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা। আছড়ে পড়বার পর মহাকাশযানগুলোর সর্বাঙ্গ ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়, কিন্তু তার আগে আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতির কলকাঠির স্বয়ংক্রিয়ভাবে নড়াচড়ার মধ্য দিয়ে ওরা চাঁদ সম্বন্ধে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিজ্ঞানীদের হাতে তুলে দিয়ে গেছে। ওরা যেমন একদিকে চাঁদের ভর (mass) সম্বন্ধে আমাদের পুরনো ধারণাকে সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি আছড়ে পড়বার আগের মিনিট পনেরোর মধ্যে চাঁদের জমির কাছে থেকে তোলা টেলিভিশন ছবিগুলির মাধ্যমে চাঁদের গঠন-প্রকৃতির রহস্য সম্বন্ধেও বহু আলোকপাত করতে পেরেছে।

আমেরিকার রেঞ্জার মহাকাশযানগুলো ডপ্‌লার পদ্ধতির মাধ্যমে পৃথিবী ও চাঁদের ভরের যে আনুপাতিক সম্পর্ক নির্ণয় করেছে, তার গড় মূল্যমান হল ৮১·৩০৩। অর্থাৎ পৃথিবীর ভর চাঁদের ভরের চেয়ে ৮১ গুণের সামান্য বেশি। ইতিপূর্বে পৃথিবী থেকে বিভিন্ন জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে যে পরীক্ষালব্ধ ফল পাওয়া গিয়েছিল, তার তুলনায় এই সূক্ষ্মতার মাপ প্রায় দশগুণ বেশি।

রেঞ্জার শ্রেণীর মহাকাশযানগুলি চাঁদের জমির ওপর এক মিটার বা তার চেয়েও ছোট আকারের ছবি তুলে পাঠাতে পেরেছিল। পৃথিবীর সবচেয়ে জোরালো আলোক-দূরবীণ যন্ত্রের মাধ্যমে তোলা ছবির তুলনায় এর সূক্ষ্মতার মাপ ছিল দশ হাজার গুণের চেয়েও বেশি।

খুব কাছে থেকে তোলা এইসব ছবির দৌলতে চাঁদের এক অনাবিষ্কৃত রূপ বিজ্ঞানীদের কাছে ধরা দিল। ইতিপূর্বে চাঁদে সবচেয়ে ছোট যে

আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, তার চেয়েও আকারে বেশ কয়েক গুণ ছোট বহু জ্বালামুখের অস্তিত্ব ধরা পড়ল। ওদের মোট সংখ্যার বিচারের মধ্য দিয়ে সর্বপ্রথম এক দ্বিতীয় চরিত্রের জ্বালামুখের সন্ধান পাওয়া গেল, যারা বাইরে থেকে আসা উল্কাজাতীয় মহাজাগতিক বস্তুর সংঘাতে গড়ে ওঠে নি—বরং ঐ সব বস্তুর সংঘাতে চাঁদের জমির বিভিন্ন জায়গা থেকে ছিটকে ওঠা প্রস্তরখণ্ডো সংঘাতেই ওদের সৃষ্টি হয়েছে বলে একদল চান্দ্রবিজ্ঞানী অনুমান করছেন।

চাঁদে যারা অক্ষতভাবে নামল (soft-landers)

১৯৬৬ সাল থেকে চাঁদে অভিযানের আর এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হল। ১৯৬৬ ও ১৯৬৭—এই দু-বছরের মধ্যে পর-পর সাতটি স্বয়ংক্রিয় মহাজাগতিক স্টেশন অক্ষতভাবে চাঁদের জমির বিভিন্ন জায়গায় এসে নামল ; এর মধ্যে দুটি পাঠিয়েছিলেন সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা, পাঁচটি আমেরিকার বিজ্ঞানীরা।

চাঁদের জমিতে সর্বপ্রথম অক্ষতভাবে লুনা-৯ নামে একটি বৈজ্ঞানিক স্টেশনকে নামাবার কৃতিত্ব অর্জন করলেন সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা, ১৯৬৬ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে। স্টেশনটি চাঁদের দৃশ্য পিঠের বাঁ-দিকে চাঁদের বিষুবরেখার ওপরে ঝড়ের সাগর (Oceanus Procellerum) নামে একটি মেরিয়ার ওপর গিয়ে নেমেছিল। লুনা-৯ চাঁদের জমিতে ওর নামার জায়গার যে-সব ছবি তুলে ফেরত পাঠিয়েছিল, সেগুলির বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এই ধারণা পোষণ করলেন যে, ঐ জমি ব্যাসল্ট শিলার লাভাপ্রবাহ থেকে তৈরি। কালো, অনেকটা স্পঞ্জের মতন ঐ হালকা শিলার সঙ্গে পৃথিবীর স্ল্যাগ বা টাফ্ জাতীয় শিলার মিল রয়েছে।

লুনা-৯ চাঁদে নামার সময় চাঁদের জমিতে মহাকাশযানটির বসে যাবার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নি। এ থেকে বোঝা গেল, চাঁদের ওপরকার জমির গঠন বেশ শক্ত এবং চাঁদের প্রতি বর্গ ইঞ্চি বা ২½ বর্গ সেণ্টিমিটার পরিমাণ জায়গার ৬ থেকে ১০ পাউণ্ডের মত ভর ধারণ করবার ক্ষমতা রয়েছে। একে অনেকটা ভিজে বালির ধারণ-ক্ষমতার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। একটি লোক যদি এই ধরনের জমির ওপর দিয়ে সাবধানে হাঁটা-চলা করে, তাহলে সে জমির বসে যাবার কোন আশঙ্কা নেই। কিন্তু প্রতিটি পদক্ষেপের সময় চাঁদের জমির ওপর গভীর পায়ের ছাপ পড়বার সম্ভাবনা রয়েছে। পরবর্তীকালে লুনা-৯ এবং আমেরিকার সার্ভেয়ার শ্রেণীর যে মহাকাশযানগুলো চাঁদের জমিতে নেমেছিল, তাদের পর্যবেক্ষণের ফলও একই রকমের হতে দেখা গেছে।

লুনা-৯-এর কাছ থেকে পাওয়া আর-একটি বেতার-সঙ্কেতের বিশ্লেষণের ফলে জানা যায়, চাঁদের জমির বিকিরণের যে তীব্রতা তা প্রধানত মহাজাগতিক রশ্মির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। চাঁদে বায়ুমণ্ডলের আবরণের অভাবে এই রশ্মি ওর প্রাথমিক চরিত্র ও তীব্রতা নিয়ে চাঁদের জমি বরাবর নেমে আসে এবং জমির ওপরের শিলাস্তরে পরমাণুগুলির অভ্যন্তরে পারমাণবিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ঘটায় ও বিকিরণ সৃষ্টি করে।

আমেরিকার বিজ্ঞানীরা সার্ভেয়ার নামে পাঁচটি মহাকাশযানকে চাঁদের জমিতে নামিয়েছিলেন। ওদের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতি চাঁদ সম্বন্ধে বহু নতুন খবর জুগিয়েছে। সেই খবরগুলির পরিচয় এবারে নেওয়া যেতে পারে।

চাঁদের জরীপ কাজ

স্বয়ংক্রিয় মহাজাগতিক যান সার্ভেয়ারদের কাছ থেকে লুনা-৯-এর মতই যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খবরটি পাওয়া গিয়েছিল তা হল এই যে, চাঁদের ওপরটা ধূলোয় ভরা নয়, বরং ওর গঠনটা পৃথিবীরই মত। মহাকাশযানগুলির পাদানি কোন সময়েই চাঁদের জমির ভেতরে আট সেণ্টিমিটারের বেশি প্রবেশ করে নি। চাঁদের ওপরটা অতি সূক্ষ্ম এক কণিকাস্তরের দ্বারা আবৃত হয়ে আছে, যার আচরণ অনেকটা ভিজে বালির মত। বায়ুহীন চাঁদের জমির ওপর যে উল্কার দল এসে প্রতিনিয়ত সংঘাত সৃষ্টি করছে, ওরাই শিলাস্তূপকে ভেঙে ধূলোয় পরিণত করে চলেছে, কিন্তু এই ধূলোর স্তর গভীরতায় খুবই সামান্য।

সার্ভেয়ার-৩ মাটি খোঁড়বার বেশ কিছু লটবহর নিয়ে চাঁদে পাড়ি জমিয়েছিল। যন্ত্রটির চেহারা ছিল এই—প্রায় ১/২ মিটার লম্বা একটি দণ্ডের প্রান্তে একটি অ্যালুমিনিয়ামের খন্তা বসানো, আয়তনে যা মানুষের মুঠোর চেয়ে খানিকটা বড় এবং এর নিচে আবার একটি ইস্পাত এবং রি-ইনফোর্স্‌ড্‌ প্লাষ্টিকের দরজা বসানো রয়েছে। চারটি ছোট মোটর এই দণ্ডটিকে লম্বায় ছোট-বড় করাতে পারে, ওপরে নিচে এবং দু-পাশে নড়াতে পারে, দরজাটাকে খোলা এবং বন্ধের কাজও করাতে পারে। এই যন্ত্রটিকে ক্যালিফোর্নিয়ার প্যাসাডেনা থেকে বেতার-সঙ্কেতের সাহায্যে পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। চাঁদের জমির ওপর এই যন্ত্রটির সাহায্যে প্রায় ১ মিটার লম্বা এবং ২৩ সেণ্টিমিটার গভীর গর্ত খোঁড়া হল। একই সঙ্গে আরো ছোট ছোট গর্ত খুঁড়ে চাঁদের জমির ধারণ-ক্ষমতাকে পরীক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, সার্ভেয়ার ৩-কে আমেরিকার বিজ্ঞানীরা চাঁদের যে ঝড়ের সাগরে নামিয়েছিলেন, সেই একই জায়গায় ১৯৬৯ সালের

নভেম্বর মাসে দু-জন যাত্রী-সমেত অ্যাপোলো-১২ মহাকাশযান থেকে একটি চন্দ্রযানকে নামিয়ে লক্ষ্যভেদ করার এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত তাঁরা স্থাপন করেছিলেন। সে কথায় আমরা যথাসময়ে আসব।

চাঁদের জমির চেহারা সম্বন্ধে এভাবে খানিকটা ধারণা সংগ্রহ করে নিয়ে আমেরিকার বিজ্ঞানীরা এর-পর সার্ভেয়ার-৫ নামে একটি মহাকাশযানকে চাঁদে পাঠালেন। উদ্দেশ্যটা ছিল, লুনাইটের (চাঁদের ওপরকার বস্তু) রাসায়নিক গঠনের পরিমাপ করা। লুনাইট লাভা বা অন্য কোন শিলার দ্বারা তৈরি কি না—এটাই ছিল প্রশ্ন।

সার্ভেয়ার-৫ চাঁদে আলফা স্ক্যাটারার (Alpha scatterer) নামে একটি যন্ত্র নিয়ে এসেছিল। এর ভেতরে ছিল একটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ এবং একটি ইলেকট্রনিক তেজস্ক্রিয়তা নির্দেশক যন্ত্র। এই যন্ত্রটি কোন বস্তুর ওপর তেজস্ক্রিয় কণিকার স্রোত ছুঁড়ে মারে এবং প্রতিফলিত কণিকাগুলিকে সংগ্রহ করে। যে সব কণিকা প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এল তাদের সংখ্যা এবং শক্তির পরিমাপের মধ্য দিয়ে যে বস্তু থেকে সেগুলি প্রতিফলিত হল বিজ্ঞানীরা তার রাসায়নিক গঠন নির্ণয় করতে পারেন।

সার্ভেয়ার-৫-এর 'আলফা স্ক্যাটারার' যন্ত্রটির কলকাঠির নড়াচড়ায় জানা গেল যে চাঁদের পৃষ্ঠভাগের শিলা ও মৃত্তিকার গঠন রাসায়নিক বিচারে আগ্নেয় শিলা ব্যাসল্টেরই মত। লুনা-৯-এর কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের বক্তব্যও ছিল একই। ব্যাসল্ট হল পৃথিবীর ভিত-প্রস্তরের মত। পৃথিবীর বেশির ভাগ সমুদ্রের তলদেশ এই কালো কঠিন শিলাটির দ্বারা গঠিত। পৃথিবীর জমির ওপর বহু জায়গায় এর সন্ধান মেলে।

পৃথিবীতে শিলা গলে গিয়ে এবং তারপর ঘনীভূত হয়ে ব্যাসল্টকে গড়ে তুলেছে। কাজেই চাঁদে এই শিলাটির সন্ধান পাবার পর বহু বিজ্ঞানীই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, চাঁদ তার গঠনপর্বের কোন এক সময়ে নিশ্চয়ই উত্তপ্ত অবস্থায় ছিল।

চাঁদ আরো উজ্জ্বল নয় কেন?

সার্ভেয়ার-৫-এর চাঁদের জমি খোঁড়বার যন্ত্রটি দিয়ে আর একটি পরীক্ষা করা হল। চাঁদের ওপরকার শিলাকে উল্টে দিয়ে তলার মৃত্তিকার ওপর আঁচড় কাটতেই বিজ্ঞানীরা বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে, জমি থেকে মাত্র ১/৪ সেণ্টিমিটার নিচের মৃত্তিকার রঙ দেখা যাচ্ছে অনেক বেশি কালো। চাঁদ মনে হয় কাগজের মত পাতলা বার্নিশরূপী এক ধূলোর স্তরের দ্বারা আবৃত হয়ে বসে আছে।

সূর্যের বাতাসের (solar wind) সংঘাতেই ঐ ধূলোর স্তরের রঙ কালচে হয়ে উঠেছে।

সূর্যের বাতাস প্রধানত প্রোটন কণিকার দ্বারা তৈরি। চাঁদের ওপর যখন ঐ কণাগুলি এসে আছড়ে পড়ে তখন সেগুলি সাময়িকভাবে মুক্ত ইলেকট্রনদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে চাঁদের ওপর বৈদ্যুতিক ব্যাপারে নিরপেক্ষ (neutral) হাইড্রোজেনের পরমাণুদের এক ক্ষণস্থায়ী Exosphere রূপী পরিমণ্ডল তৈরি করে বসে। ঐ পরিমণ্ডলের স্বাভাবিক ঘনত্ব প্রতি ঘন-সেণ্টিমিটারে একশটি পরমাণুর মত। কিন্তু সৌরোচ্ছ্বাসের (solar flare) সময় যখন সূর্য থেকে প্রোটন কণিকা-স্রোতের তীব্রতা বেড়ে ওঠে, তখন এই ঘনত্ব স্বল্পকালের জন্যে দশ থেকে একশ' গুণ পর্যন্ত বেড়ে উঠতে পারে।

যদিও প্রোটন কণিকা হল সূর্যের বাতাসের প্রধান উপাদান, ওর সঙ্গে কিছু পরিমাণে ভারি মৌলিক পদার্থের পরমাণুরাও থাকে—যেমন কার্বন। কার্বন পরমাণুর কেন্দ্রকেরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হলে হাইড্রোজেনের ঘন গ্যাসরূপে গড়ে ওঠে না, বরং যে কঠিন জায়গার ওপর ওরা সংঘাত সৃষ্টি করে, তার ওপরেই জমা পড়ে গিয়ে আণবিক কার্বনের একটি পাতলা স্তর (সোজা কথায় ঝুল) গঠন করে ধীরে ধীরে জায়গাটিকে কালচে করে তোলে। কলকারখানা-প্রধান এলাকায় ঘরবাড়িগুলি যেভাবে কালক্রমে কালচে হয়ে ওঠে এও যেন অনেকটা তাই, তবে ওপরের ঘটনাটা ঘটছে তার চেয়ে অনেক ধীর গতিতে।

চাঁদের জন্মের পর গত ৪৫০ কোটি বছর ধরে সূর্যের কার্বনরূপী ঝুল ক্রমাগত জমা পড়ে পড়ে চাঁদের জমির সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করবার ক্ষমতাই অনেকখানি কমে এসেছে। চাঁদের জমির গড় albedo বা সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করার ক্ষমতার মাপ পাওয়া যাচ্ছে ·০৭২, অর্থাৎ পৃথিবীর সাধারণ শিলা ব্যাসল্ট, গ্র্যানাইটের ক্ষেত্রে ঐ ক্ষমতার তুলনায় প্রায় দুই থেকে তিন গুণ কম। পৃথিবীর ত্বকের ঐ সব শিলার গড় ঘনত্ব হল প্রতি ঘন-সেণ্টিমিটারে ২৮ গ্রাম (সমগ্র পৃথিবীর গড় ঘনত্ব অবশ্য প্রতি ঘন-সেণ্টিমিটারে ৫·৫৪ গ্রাম)। চাঁদের গড় ঘনত্ব হল প্রতি ঘন-সেণ্টিমিটারে ৩·৩৪ গ্রাম, পৃথিবীর গ্র্যানাইট জাতীয় শিলার তুলনায় বেশি। কাজেই চাঁদের ওপরকার জমিকে আমরা যদি কোনরকমভাবে মেজেঘষে পরিষ্কার করে ফেলতে পারি, তাহলে আমাদের চাঁদনি রাতগুলো আজকের তুলনায় দুই থেকে তিন গুণ বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই।

চাঁদের ক্ষুদে চাঁদ

১৯৬৬ সালের মার্চ মাস থেকে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা চাঁদকে এক ধরনের বিচিত্র বস্তু উপহার দিতে শুরু করলেন। চাঁদের চারপাশে খুব কাছাকাছি কক্ষপথে আটটি কৃত্রিম উপগ্রহ বা ক্ষুদে চাঁদকে তাঁরা বসিয়ে দিলেন—এর মধ্যে তিনটি পাঠিয়েছিলেন সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা, পাঁচটি আমেরিকার বিজ্ঞানীরা।

চাঁদের প্রথম ক্ষুদে চাঁদটি হল লুনা-১০,—সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা ১৯৬৬ সালের ৩রা এপ্রিল এটিকে চাঁদের কক্ষপথে বসিয়েছিলেন।

চাঁদের জমি থেকে যে পরিমাণ গামা রশ্মি নির্গত হচ্ছে, লুনা-১০-এর আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতি তার পরিমাপ গ্রহণ করে। এর ফলে জানা যায়, চাঁদের ওপরকার শিলাস্তরের তেজস্ক্রিয়তা বা স্বাভাবিক বিকিরণের মাত্রা পৃথিবীর ত্বকের ব্যাসল্ট ও গ্র্যানাইট শিলার স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তার খুব কাছাকাছি। চাঁদের বিভিন্ন জায়গার গামা-বিকিরণের ক্ষমতা পরিমাপ করে দেখা গেছে যে, চাঁদের স্থলভাগ ও তার মেরিয়া বা জমাট-বাঁধা লাভার সমুদ্রগুলির এই পরিমাপের মধ্যে বিশেষ কোন তফাত ধরা পড়ছে না।

এই খবরটি বিজ্ঞানীদের কাছে চাঁদের জন্মের প্রসঙ্গটা আর একবার নতুন করে তুলে ধরল। তাঁরা মোটামুটি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা করলেন তা হল এই যে, পৃথিবী ও চাঁদের জন্ম আজ থেকে আনুমানিক পাঁচশ কোটি বছর আগে, হয় একই কারণে (সূর্যের মহাকর্ষ-বলের এলাকার মধ্যে এক শীতল পরিবেশে ধূলো ও গ্যাসের চক্রগুলির দানা বাঁধবার মধ্য দিয়ে) ঘটেছে, অথবা চাঁদ ছিল একদিন পৃথিবীরই অংশ (প্রশান্ত মহাসাগরের বিরাট গভীর খাতটা থেকে চাঁদের বস্তুপুঞ্জের ছিটকে বেরিয়ে যাবার ধারণাটি)। চাঁদের উৎপত্তি সম্বন্ধে অন্যান্য ধারণা নিয়ে যে তর্ক-বিতর্কের পালাটা ছিল, তা বোধহয় এবার ছোট হয়ে এল।

১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা চাঁদের জমির ওপর লুনা-২ নামে যে মহাকাশযানটি ছুঁড়ে মেরেছিলেন, ওর ম্যাগ্‌নেটোমিটারে (চৌম্বক ক্ষেত্র মাপবার যন্ত্র) চাঁদের নিজস্ব কোন চৌম্বক ক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া যায় নি। যেটুকু পাওয়া গিয়েছিল তার পরিমাপ ছিল খুবই সামান্য, মাত্র ·০০০৩ গস্, বা পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের $\frac{১}{৪০০}$ ভাগ মাত্র। কিন্তু লুনা-১০-এর ম্যাগ্‌নেটোমিটারে চাঁদের একটি দুর্বল চৌম্বক ক্ষেত্রের অস্তিত্ব ধরা পড়ে।

সূর্য থেকে যে বৈদ্যুতিক কণিকা-স্রোত ঘণ্টায় প্রায় ১১ লক্ষ থেকে ২৭ লক্ষ কিলোমিটার বেগে ছুটে বেরোচ্ছে, তাই হয়ত চাঁদের ভেতরে একটি

স্বল্পমাত্রার বিদ্যুৎ-প্রবাহ তৈরি করে বসছে। ঐ বিদ্যুৎ-প্রবাহ থেকেই আবার একটি দুর্বল চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হচ্ছে।

পৃথিবীর ম্যাগ্‌নেটোস্ফিয়ার বা চৌম্বক-মণ্ডলের প্রভাবেও চাঁদের চৌম্বক ক্ষেত্রটা তৈরি হতে পারে। অথবা হয়ত সৌরদেহজাত কোন চৌম্বক ক্ষেত্রকে বন্দী করে নিয়ে বা আন্তর্গ্রহ অঞ্চলের কোন চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারাই চাঁদ তার চুম্বকত্বকে অর্জন করে বসে আছে।

লুনা-১০-এর যন্ত্রে চাঁদের বায়ুমণ্ডলের যে ঘনত্ব ধরা পড়েছিল, তা পৃথিবীর জমির ওপর বায়ুমণ্ডলের যে ঘনত্ব তার এক লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। লুনা-১০ চাঁদের কক্ষপথে স্বল্পশক্তিসম্পন্ন একটি আয়ন কণিকা-স্রোতেরও সন্ধান পেয়েছিল। চাঁদের প্রান্ত ছুঁয়ে লুনা-১০ থেকে পাঠানো বেতার-সঙ্কেতের পৃথিবীতে আসার সময় সামান্য অবচ্যুতির (diffraction) ঘটনার মধ্য দিয়ে চাঁদের ওপর এক অতি তনু আয়নমণ্ডলের অস্তিত্বের সন্ধান পান বিশেষজ্ঞেরা।

লুনা-১০ চাঁদ থেকে যে তাপ-তরঙ্গের সন্ধান পায়, তার সবচেয়ে বেশি তীব্রতা অনুভূত হয়েছিল অবলোহিত অঞ্চলের শেষ প্রান্তে এবং তরঙ্গের মাপ ছিল ৭—২০ মাইক্রনের (এক মাইক্রন=$\frac{১}{১০০}$ মিলিমিটার=১০$^{-৬}$ মিটার) মত।

লুনা-১০ চাঁদের জমি থেকে রঞ্জন রশ্মির বিকিরণের পরিমাপও গ্রহণ করে। চাঁদের শিলার মধ্যে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরিমাণ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে বেতার-তরঙ্গের গবেষণার মাধ্যমে ইতিপূর্বে যা জানা গিয়েছিল, এই পরিমাপ সে বিষয়ে সঠিক ধারণা গ্রহণ করতে বিজ্ঞানীদের সাহায্য করেছে। ইতিপূর্বে বেতার-তরঙ্গের গবেষণায় জানা যায়, লুনাইটের মধ্যে সিলিকন অক্সাইড রয়েছে শতকরা ৬০ থেকে ৬৫ ভাগ, অ্যালুমিনিয়াম ডাই-অক্সাইড শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ এবং পটাসিয়াম, সোডিয়াম, আয়রন ও ম্যাগ্‌নেশিয়াম অক্সাইড রয়েছে শতকরা ২০ ভাগ পরিমাণে। চাঁদের রাসায়নিক গঠন-প্রকৃতির অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে তার সৃষ্টি ও বিবর্তন সম্বন্ধে বহু রহস্যের সমাধান করা সম্ভব হবে, এরকম একটা আশা দেখা দিল।

চাঁদে মানুষের অভিযানের সময় উল্কার সঙ্গে সংঘাত কখনো কখনো এক বিরাট বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। চাঁদের কাছাকাছি অঞ্চলে উল্কা-কণাগুলির পরিমাণ সম্বন্ধে লুনা-১০ বেশ কিছু তথ্য পাঠায়। ১৯৬৬ সালের ৩রা এপ্রিল থেকে ১২ই এপ্রিলের মধ্যে কোন একদিন ৫ ঘণ্টা ১৬ মিনিট সময়ের মধ্যে লুনা-১০-এর সঙ্গে উল্কাকণাগুলির ৫৩টি সংঘাত ঘটে। আন্তর্গ্রহ

অঞ্চলে গড়পড়তা প্রতি সেকেণ্ডে প্রতি বর্গ মিটার ক্ষেত্রে উল্কাকণার সঙ্গে সংঘাতের তুলনায় এই সংখ্যাটি ছিল প্রায় ১০০ গুণ বেশি।

চাঁদের কাছাকাছি অঞ্চলে বস্তুর ঘনত্বের এই বৃদ্ধিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনুমান করা হল যে, চাঁদ নিজেই বেশ কিছু কণিকার উৎস। উল্কার দল যখন চাঁদের জমিতে এসে আছড়ে পড়ে, তখন বিস্ফোরণের ফলে বেশ কিছু পরিমাণ শিলা ভেঙে গুঁড়িয়ে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়। এদের মধ্যে কিছু চাঁদের জমিতে ফিরে আসে, কিছু অতিরিক্ত বেগের প্রভাবে চাঁদের অভিকর্ষ-বলকে কাটিয়ে আন্তর্গ্রহ অঞ্চলে বেরিয়ে চলে যায়, আবার কিছু পৃথিবী ও চাঁদের অভিকর্ষ-বলের মিলিত প্রভাবে চাঁদের চারপাশে বেশ কিছুদিনের জন্যে আবর্তিত হতে পারে। লুনা-১০ যে উল্কাকণাগুলির সংযোগে এসেছিল, তাদের মধ্যে এই জাতীয় কণিকা হয়ত বেশ কিছু পরিমাণে ছিল।

আমেরিকার বিজ্ঞানীরা চাঁদের চারপাশে যে কৃত্রিম উপগ্রহদের বসিয়েছিলেন সেগুলির মধ্যে দুটি—অরবিটার-৪ ও অরবিটার-৫ পালা করে চাঁদের দৃশ্য ও অদৃশ্য পিঠের সমগ্র অঞ্চলের ছবি তুলে নেয়। সোভিয়েট মহাকাশযান লুনা-৩ ও জোন্দ্-৩ ইতিপূর্বে চাঁদের প্রায় সমগ্র উল্টো পিঠের ছবি তুলে এনেছিল। চাঁদের জমির ওপর ৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের কোন বস্তুকে এ-সব ছবির দৌলতে আলাদা করে চেনা সম্ভবপর হয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আলোক দূরবীক্ষণ-যন্ত্র পর্যবেক্ষণের সবচেয়ে ভাল অবস্থার মধ্যেও চাঁদের যে সব ছবি তুলতে পেরেছে, সে তুলনায় অরবিটারদের মাধ্যমে তোলা ছবিগুলির বিশ্লেষণের (resolution) সূক্ষ্মতার পরিমাণ ছিল প্রায় দশগুণ বেশি।

আমাদের পৃথিবীর ভূভাগের তুলনায় চাঁদের ভূভাগ সম্বন্ধে আলোকচিত্রের তথ্য এখন বিজ্ঞানীদের হাতে অনেক বেশি সম্পূর্ণ পরিমাণে রয়েছে। এই বিপুল তথ্যের বিশ্লেষণের কাজ সম্পূর্ণ হতে অবশ্য বহু সময় লেগে যাবে। সমস্যার জটিলতা আমাদের কাছে আরো পরিষ্কার হয়ে ওঠে যখন দেখা যায় যে, চাঁদে অতি ক্ষুদ্র থেকে বিরাট বড় মাপের জ্বালামুখের সন্ধানই পাওয়া গেছে প্রায় দু-কোটির মত।

চাঁদের এক রহস্য

লুনা-৩ ১৯৫৯ সালে চাঁদের উল্টো পিঠের যে ছবি তুলে পাঠিয়েছিল, সেই ছবিগুলোর সঙ্গে চাঁদের দৃশ্য পিঠের অনেক বিষয়ে তফাত ধরা পড়ে। চাঁদের অদৃশ্য পিঠে মেরিয়ার সংখ্যা কম এবং অন্য পিঠের তুলনায় সেগুলি আয়তনেও অনেক ছোট। পর্বতমালার সংখ্যাই সেখানে বেশি। জ্বালামুখগুলি আকারে

কেউই খুব বড় নয়। সবচেয়ে বড়টির ব্যাস—৬৫ কিলোমিটারের মত। চাঁদের দুই পিঠের গঠন-প্রকৃতির মধ্যে এই পার্থক্যের সন্ধান পাবার পর বিজ্ঞানীরা বড় চিন্তায় পড়েছেন।

অরবিটার-৫ চাঁদের উল্টো পিঠের ছবি তোলবার সময় সেখানে বিচিত্র গঠনের সব গর্তের সন্ধান পায়; সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা সেগুলির নাম দিয়েছিলেন thallasoids—সেগুলি হল চাঁদের জমির ওপর বড় আকারের অগভীর সব গর্ত। চাঁদের দৃশ্য পিঠের Mare Crisium ও Mare Serenitatis-এর মত ছোট আকারের মেয়ারের সঙ্গে ওদের চেহারার মাপের তুলনা চলতে পারে, কিন্তু মেয়ারগুলির মেঝে জুড়ে যে কালো বস্তুর ছড়াছড়ি, তা ওদের নেই।

এই নতুন আবিষ্কারের ফলে চাঁদের ধুলোর তত্ত্বের (Lunar dust hypothesis) প্রবক্তারা খুবই বেকায়দায় পড়েছেন। এই তত্ত্বের মোদ্দা কথাটা হল এই যে, চাঁদের স্থলভাগ বয়সের বিচারে মেরিয়ার তুলনায় প্রাচীন অথচ ওদের সূর্যের আলো প্রতিফলনের ক্ষমতা বেশি। তার কারণ, ওরা বিকিরণের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কম। উল্কার সংঘাতে বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় ওরা ক্রমাগত ক্ষয় পাচ্ছে এবং এর ফলে ওদের চেহারাটা সব সময়েই নতুন দেখায়। এখন এই ক্ষয়ে-যাওয়া বস্তু সব সময়েই নাকি ধুলোর আকারে চাঁদের মেরিয়ারূপী আধারগুলিতে গিয়ে জমা হয়ে ওদের চেহারাগুলিকে কালচে করে তুলেছে।

চাঁদের জমির ওপর যদিও নানা ধরনের ক্ষয়ের কাজ (ভূকম্প ও তাপ প্রভৃতি জনিত) চালু রয়েছে, কিন্তু এমন কোন প্রক্রিয়ার কথা ভাবা যায় না যার ফলে জমি মিহি ধুলোয় পরিণত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। যদিও দিনের বেলায় চাঁদের ধূলিকণাদের পরস্পরের মধ্যে সংযোগ শিথিল হয়ে পড়ে, কিন্তু রাত্রিবেলায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডার প্রভাবে সেই ধূলিকণা বায়ুহীন চাঁদের ওপর প্রায় বায়ুশূন্য অঞ্চলে ওয়েলডিং-এর কাজের মত চাঁদের জমির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আটকে থাকবে।

চাঁদের জমির ওপর দিয়ে রাশি-রাশি ধুলো ছড়িয়ে গিয়ে কালক্রমে যদি মেরিয়াগুলির তলদেশ ভরে তুলে থাকে, তাহলে চাঁদের বহু ছোট ছোট জ্বালামুখ, বিরাট ফাটলগুলি এবং চাঁদের উল্টোপিঠের থ্যালেসয়েডরূপী বড় বড় অগভীর জায়গাগুলিতেই বা ধুলোর দল গিয়ে হাজির হল না কেন?

চাঁদের জমির ধুলোর পরিমাণ পরীক্ষা করবার জন্যে মহাকাশযান সার্ভেয়ার-১ চাঁদে নামবার পর তা থেকে গ্যাসের একটি জোরালো স্রোতকে

চাঁদের জমির ওপর ছুঁড়ে মারা হয়, কিন্তু সার্ভেয়ারের টেলিভিশন ক্যামেরায় ধুলোর কোন আলোড়নই নজরে পড়ে নি। ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে সার্ভেয়ার-৩ বিশেষ ব্যবস্থায় চাঁদের জমির বেশ খানিকটা অংশ তুলে নিয়ে তার একটি পা-দানির ওপর তাকে ছড়িয়ে দেয় ; কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেল, ঐ বস্তু আদৌ কোন ধুলো নয়—বায়ুহীনতার জন্যে দৃঢ়সম্বদ্ধ অবস্থায় থাকা গ্র্যাভেলরূপী বস্তু মাত্র।

এই ঘটনার পর চাঁদের ধুলোর তত্ত্বের প্রবক্তাদের উৎসাহে খানিকটা ভাটা পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিল।

চাঁদের জমি

বিভিন্ন শ্রেণীর মহাকাশযানের চান্দ্র-গবেষণার মাধ্যমে এবং অ্যাপোলো-১০-এর চন্দ্র পরিক্রমার ফলে চাঁদের জমির চেহারা সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা পাওয়া গিয়েছিল। তা হল এই যে, চাঁদের জমির গঠন অত্যন্ত অমসৃণ, বন্ধুর, এবড়ো-খেবড়ো ও ভাঙাচোরা। চতুর্দিকে ছড়ানো রয়েছে ছোট-বড় পাথরের স্তূপ। চাঁদের মেরিয়া, চাঁদের জ্বালামুখ—সর্বত্রই চাঁদের জমির চেহারা একই রকম। এদের তলদেশ জুড়ে বিরাট লম্বা গভীর সব ফাটল চোখে পড়ে।

চাঁদের পরিক্রমার সময় অ্যাপোলো-৮ ও অ্যাপোলো-১০-এর যাত্রীরা (যে সব অভিযানের আলোচনায় আমরা পরে আসব) বারে-বারেই জানিয়েছেন—পৃথিবীর রূপ রসহীন, প্রায় মরুময় চাঁদের মানুষের মনকে আকর্ষণ করবার কোন উপকরণই নেই। মানুষ কোনদিনই এখানে বাস করতে চাইবে না। পৃথিবী থেকে যে চাঁদকে দেখে আমরা মুগ্ধ হই, সে চাঁদের এই বর্ণনায় মানুষের মন খুশি হতে পারে না।

চাঁদের একটি দিনের পরিমাণ পৃথিবীর ১৪টি দিন ও রাতের সমান এবং একটি রাতের পরিমাণও হল তাই। দিনের বেলায় সূর্য যখন মাথার ওপর এসে দাঁড়ায়, তখন তাপমাত্রা চড়তে চড়তে ২৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের কোঠায় পৌঁছে যায়। আবার সূর্য ডোবার পর তাপমাত্রা কমতে কমতে সূর্যোদয়ের আগে ৩৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে নেমে আসে।

দিন ও রাতের তাপমাত্রার মধ্যে প্রায় ৬৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের এই যে বিরাট তফাত, তা চাঁদে অক্ষতভাবে নামবার পর বিভিন্ন মহাকাশযানের যান্ত্রিক পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছিল।

চাঁদের দিন ও রাতের তাপমাত্রার মধ্যে এই বিরাট তারতম্য থেকে এটাই বোঝা যায় যে, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সমগ্র সময়ের মধ্যে চাঁদের ওপরকার তাপ-

তরঙ্গ তার জমির খুব ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। পরীক্ষায় দেখা গেছে, চাঁদে এক সেণ্টিমিটারের চেয়ে ক্রমশ বড় মাপের তরঙ্গ-দৈর্ঘের তাপ-তরঙ্গ জমির পৃষ্ঠভাগের নিচেকার স্তর থেকে জন্মায়। ঐ তাপ-তরঙ্গের তীব্রতার পরিমাপের মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে চাঁদের জমির ওপর তাপমাত্রার এই যে বিরাট পার্থক্য, তা জমির মাত্র $\frac{১}{৩}$ মিটার নিচেই আর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সেখানে তাপমাত্রা সব সময়ের জন্যে ৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটে বজায় রয়েছে।

সোভিয়েট মহাকাশযান লুনা-১৩ চাঁদের জমিতে অবতরণের পর তার আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতি চাঁদের জমির নিচের বিভিন্ন স্তরের যে তাপমাত্রার তথ্য সংগ্রহ করেছিল তা থেকেও পরিষ্কার বোঝা গেল চাঁদের জমির বাইরেকার স্তরের তাপ পরিবহনের ক্ষমতা খুবই সামান্য—পৃথিবীর যে-কোন কঠিন বস্তুর তুলনায় এই ক্ষমতার পরিমাণটা খুবই কম।

চাঁদের নতুন খবর

অ্যাপোলো-৮ মহাকাশযানের চাঁদের চারপাশে পরিক্রমা-পথের সূক্ষ্ম পরিমাপের মাধ্যমে চাঁদের এক নতুন চেহারা ধরা পড়েছে। চাঁদ হল কমলালেবুর মত গোল এবং তার মেরু প্রদেশটা খানিকটা চাপা—চাঁদের এই পুরনো চেহারার জায়গায় চাঁদকে একটি পিয়ার বা নাসপাতি ফলের আকৃতিবিশিষ্ট বস্তু বলে নাকি আমাদের এখন থেকে গ্রহণ করতে হবে। পৃথিবীর চারপাশে পরিক্রমারত আমেরিকার একটি কৃত্রিম উপগ্রহের ঘোরবার ধরন-ধারণকে পরীক্ষা করে বেশ কয়েক বছর আগে পৃথিবীরও একটি পিয়ার ফলের মত চেহারার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। এ সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

পিয়ার ফলের মত চেহারা থেকে বুঝতে হবে, পৃথিবীরই মত চাঁদের উত্তর মেরু অঞ্চলে খানিকটা জায়গা যেন আঁবের মত ঠেলে বেরিয়ে আছে এবং দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে সমপরিমাণ খানিকটা জায়গা যেন ভেতরে বসানো রয়েছে। চাঁদের এই নতুন চেহারার আবিষ্কারের ফলে, তার অভিকর্ষ-বলের পূর্বনির্ধারিত মাপের যে হিসেব আমাদের কাছে রয়েছে তার মধ্যেও বিচ্যুতি ঘটতে দেখা গেছে।

অ্যাপোলো-৮ মহাকাশযানের চাঁদের চারপাশে পরিক্রমা-পথের পর্যবেক্ষণে চাঁদের জমির তলায় ম্যাসকন্‌স্ (mascons) নামে ঘন দৃঢ়-কঠিন বস্তুর সমাবেশের কিছু অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। ম্যাসকন হল লোহা অথবা অন্য কোন চৌম্বক বস্তুর সমাবেশ। চাঁদের শৈশব অবস্থায় যে বিরাট ধূমকেতুর দল চাঁদের জমির ওপর এসে আছড়ে পড়েছিল, ম্যাসকন তার গলিত রূপ থেকেও তৈরী হয়ে

থাকতে পারে, অথবা স্বাভাবিক কোন আকর হিসেবেও এদের ধরা যায়। একটি বিশেষ ম্যাসকন প্রস্থে ৮ কিলোমিটার এবং দৈর্ঘ্যে ৪৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।

চাঁদের পিয়ারের মত আকৃতি এবং তার জমির তলায় ম্যাসকনের অবস্থিতি, অ্যাপোলো-৮ মহাকাশযানের চন্দ্র-পরিক্রমা-পথের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, যার ফলে নির্দিষ্ট কক্ষপথ থেকে অ্যাপোলোর কখনো কখনো ৪৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিচ্যুতি ঘটতে দেখা গেছে।

চাঁদের ভেতরে কোন জলের সন্ধান বা চাঁদের জমির ওপর বীজাণু জাতীয় কোন প্রাণের অস্তিত্বের খবর এ-পর্যন্ত কোন মহাকাশযানই সংগ্রহ করতে পারে নি।

অ্যাপোলো-১০ মহাকাশযানের যাত্রীরা চাঁদের জমির ওপর এমন কতকগুলি ক্ষয়ের কাজ দেখেছিলেন, যেগুলি জলের প্রবাহের দ্বারাই ঘটেছে বলে মনে হয়। চাঁদের জমির ওপর জলের অস্তিত্বের কোন প্রশ্নই ওঠে না, চাঁদের দুর্বল অভিকর্ষ-বলের জন্যে এবং কোন বায়ু না থাকার ফলে সেই জল আদৌ যদি কোনদিন চাঁদের অভ্যন্তর থেকে ওপরে বেরিয়েও এসে থাকে, তাহলেও তা কয়েক কোটি বছর আগেই বাষ্পীভূত হয়ে মিলিয়ে গেছে। কিন্তু চাঁদের জমির তলায় বরফের আকারে জলের অবস্থিতির সম্ভাবনাকে একেবারে বাতিল করা হয়তো যায় না।

১০

চন্দ্র পরিক্রমা

সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং আমেরিকা, এই দুটি দেশের বিজ্ঞানীদের মহাকাশ অভিযানের বিভিন্ন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মানুষ সাগ্রহে একটি ঘটনার জন্যেই প্রতীক্ষা করছিলেন। সেটি হল, কবে চাঁদে মানুষ নামবে। কিন্তু তার আগে কয়েকটি প্রয়োজনীয় পরীক্ষাকাজ বাকি ছিল। তা হল, চাঁদের খুব কাছাকাছি থেকে চাঁদে নামার জন্যে নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গাকে পর্যবেক্ষণ করে আসা, চাঁদে অবতরণের যানকে পরীক্ষা করা ও চাঁদের কাছাকাছি পরিবেশে মূল মহাকাশযানের যান্ত্রিক কার্যকারিতাকে যাচাই করা। অর্থাৎ, মানুষকেই মহাকাশযানের আরোহীরূপে চাঁদের দেশে পাড়ি জমাতে হবে। সোভিয়েট ইউনিয়ন না আমেরিকা, কোন দেশের বিজ্ঞানীরা আগে চাঁদে অভিযাত্রী পাঠাবেন তা পৃথিবীর মানুষের কাছে এক বিরাট জল্পনা কল্পনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল।

জোন্দ্-৫ ও ৬

১৯৬৮ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা হঠাৎ জোন্দ্-৫ নামে একটি স্বয়ংক্রিয় মহাকাশ স্টেশনকে চাঁদের দিকে পাঠিয়ে বসলেন। তিন দিন বাদে জানা গেল, স্টেশনটি চাঁদকে পরিক্রমার কাজ সম্পূর্ণ করে আবার পৃথিবীর দিকে ফিরে আসছে। ওর মধ্যে কচ্ছপ, মাছি, পোকা এবং গম ও বার্লির কিছু বীজ রেখে দেওয়া হয়েছিল। জোন্দ্-৫ পৃথিবীতে ফিরে আসার পর দেখা গেল, কচ্ছপগুলোর বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নি। ওরা দিব্যি বহালতবিয়তে বেঁচে রয়েছে।

সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা বললেন, মহাকাশের দূরবর্তী অঞ্চলে বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা পরীক্ষা করাটা ছিল এই সাম্প্রতিক মহাকাশ-অভিযানের একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

একই বছরে ১০ই নভেম্বর সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা জোন্দ্-৬ নামে আর একটি স্বয়ংক্রিয় মহাকাশ স্টেশনকে চাঁদের দিকে পাঠিয়ে বসলেন। চাঁদের জমির ২৪০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে স্টেশনটি আবার নিরাপদে

পৃথিবীতে ফিরে এল। জোনদ্-৫-এর মতো এটির মধ্যেও কিছু প্রাণী ছিল। স্টেশনটির আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতি পথিমধ্যে এবং চাঁদের কাছাকাছি এলাকায় বিকিরণের মাত্রাকে পরীক্ষা করেছিল।

অ্যাপোলো-৮

আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনার দিন এগিয়ে এল। ১৯৬৮ সালের ২৬শে ডিসেম্বর, শনিবার। আমেরিকার কেপ কেনেডি মহাকাশবন্দরে অপেক্ষমান মহাকাশযান অ্যাপোলো-৮, ফ্র্যাঙ্ক বোরমান, জেমস লভেল এবং উইলিয়ম অ্যাণ্ডার্স-এই তিনজন যাত্রীকে নিয়ে চাঁদের দিকে যাত্রা শুরুর জন্যে তৈরী।

অ্যাপোলো মহাকাশযানকে বহন করে নিয়ে চলেছে যে বাহক রকেট স্যাটার্ন-৫, সেটি নাকি পৃথিবীতে এ-পর্যন্ত যত রকেট আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। স্যাটার্ন-৫ এবং ওর মাথায় চাপানো অ্যাপোলো-৮—ক্ষেপণমঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ওদের মোট উচ্চতা প্রায় ১২০ মিটারে (৩৬৩ ফুট) গিয়ে পৌঁছেছে এবং মোট ওজন দাঁড়িয়েছে ২৮ লক্ষ কিলোগ্রাম বা প্রায় ৩০০০ টনের মত।

স্যাটার্ন-৫

একটি পর্যায়ের মাথায় চাপানো আর একটি পর্যায়, এভাবে মোট তিন পর্যায়ের রকেট হল স্যাটার্ন-৫। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের দৈর্ঘ্য হল যথাক্রমে ৪২, ৩৬ ও ২০ মিটার। রকেটের প্রথম পর্যায়ের ওজন হল ৩০৫, ৬৫০ পাউণ্ড। কিন্তু কেরোসিন-রূপ জ্বালানি এবং তরল অক্সিজেনে পূর্ণ হবার পর এই পর্যায়ের ওজন দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৫০ লক্ষ পাউণ্ডের মত। প্রথম পর্যায়ের পাঁচটি এঞ্জিনের মোট ধাক্কার (thrust) পরিমাণ হল ৭৫ লক্ষ পাউণ্ডের চেয়েও বেশি। এই প্রচণ্ড ধাক্কার বেগ তৈরির জন্যে রকেটের জ্বালানির চাহিদাটাও হল অত্যন্ত বেশি। প্রথম পর্যায়ের এঞ্জিনগুলো সেকেণ্ডে প্রায় ২৮০০০ পাউণ্ড বা ১৫ টনের মত জ্বালানিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে ফেলছে।

স্যাটার্ন রকেটের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের জ্বালানিরূপে ব্যবহার করা হয়েছিল তরল হাইড্রোজেনকে। তরল হাইড্রোজেনের স্বাভাবিক তাপমাত্রা হল —৪২৩ ডিগ্রি ফারেনহাইট। দহনকাজের জন্যে যে তরল অক্সিজেনকে রকেটের দুটি পর্যায়ে রাখা হয়েছিল, তার তাপমাত্রা হল —২৯৩ ডিগ্রি

ফারেনহাইট, অর্থাৎ তুলনায় তরল হাইড্রোজেনের চেয়েও অনেক বেশি তপ্ত। একমাত্র দহনকাজের ঘর ছাড়া দুটি বস্তু যাতে কোনরকমভাবেই পরস্পরের সান্নিধ্যে আসতে না পারে, তার জন্যে সব রকম নিরাপত্তার ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় পর্যায়ের পাঁচটি রকেট এঞ্জিন মোট যে ধাক্কা তৈরি করবে, তার পরিমাণ হল ১০ লক্ষ পাউণ্ডের মত। তৃতীয় পর্যায়ে ছিল একটি মাত্র এঞ্জিন ; এটি এমনভাবে তৈরি যে এর কাজ একবার বন্ধ হলেও আবার শুরু করা যায়। এর ধাক্কার পরিমাণ ছিল প্রায় ২ লক্ষ পাউণ্ডের মত। এছাড়াও তৃতীয় পর্যায়ে আরো চারটি কঠিন জ্বালানিপূর্ণ রেট্রো রকেটের ব্যবস্থা ছিল। এদের কাজ ছিল, দ্বিতীয় পর্যায় থেকে আলাদা হয়ে যাবার সময় তৃতীয় পর্যায়ের দেহে একটা জোরালো মাপের ধাক্কা সৃষ্টি করা।

তিন-পর্যায়যুক্ত রকেটের মাথায় চাপানো মহাকাশযান অ্যাপোলো। এর দুটি প্রধান অংশ হল কম্যাণ্ড মডিউল ও সার্ভিস মডিউল। কম্যাণ্ড মডিউলে রয়েছে মহাকাশযাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা, মহাকাশযান পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের যান্ত্রিক সজ্জা। এর উচ্চতা প্রায় ৪ মিটার, ওজন হল প্রায় ১২,৪০০ পাউণ্ড। এর চারপাশে রয়েছে বিশেষ উপাদানে তৈরি তাপ-প্রতিরোধের আবরণী।

সার্ভিস মডিউল অংশের দৈর্ঘ্য হল প্রায় ৭ মিটার এবং ওজন ৫১, ২৫৪ পাউণ্ড। এর মধ্যে রয়েছে প্রয়োজনীয় বহু যান্ত্রিক ব্যবস্থা।

স্যাটার্ন-৫ রকেটের তিনটি পর্যায়ের মোট শক্তির যে পরিমাণ, একটি উপমা থেকে তার খানিকটা আন্দাজ আমরা পেতে পারি। এ হল এমন শক্তি, যা দিয়ে একটি মোটরগাড়িকে ঘণ্টায় ৯৬ কিলোমিটার বেগে একটানাভাবে ৩০ বছর ধরে স্বচ্ছন্দে চালু রাখা যাবে। একজন ইংরেজ বিজ্ঞানী বলেছিলেন, ইংলণ্ডে যত মোটরগাড়ী আছে, তাদের মিলিত শক্তির চেয়েও নাকি এই শক্তির পরিমাণ হল বেশি।

চাঁদের দেশে যাত্রী

ভারতীয় সময় সন্ধ্যে ৬টা বেজে ২৬ মিনিট। স্যাটার্ন রকেটের এঞ্জিন একটির পর আর একটি চালু হয়ে মহাকাশযান অ্যাপোলোকে পৃথিবীর জমির প্রায় ১৯০ কিলোমিটার দূরে পৌঁছে দেয়। কাজ শেষ হয়ে যাবার পর দুটি পর্যায়ের খোলগুলো খসে পড়ে যায়। অ্যাপোলোর বেগ এখন ঘণ্টায় ২২,৫৫০ কিলোমিটার। রকেটের তৃতীয় পর্যায়ের এঞ্জিনটি এবারে স্বল্প সময়ের জন্য চালু হল। অ্যাপোলোর বেগ আরো বেড়ে প্রায় ২৮০০০ কিলোমিটারে এসে দাঁড়াল

এবং সেই বেগ ঘাড়ে নিয়ে অ্যাপোলো পৃথিবী থেকে প্রায় ১৭০ কিলোমিটার দূরের এক উপবৃত্তাকার কক্ষপথে এসে পৌছল। যাত্রা-শুরু থেকে কক্ষপথে পৌছতে অ্যাপোলোর সময় লেগেছিল ১১ মিনিট ৫২ সেকেণ্ড।

এরপর চলল অ্যাপোলোর পৃথিবীকে বার দুয়েক পরিক্রমার কাজ। ভারতীয় সময় রাত ৯টা বেজে ১১ মিনিট। বাহক রকেট স্যাটার্নের তৃতীয় পর্যায়ের কাজ আবার শুরু হল। মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে অ্যাপোলোর বেগ এসে দাঁড়াল ৩৮,৬৭৪ কিলোমিটারে। কাজ শেষ হবার পর রকেটের তৃতীয় পর্যায়ের খোলটিও মহাকাশযানের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

ঘণ্টায় প্রায় ৩৯,০০০ কিলোমিটারের নিষ্ক্রমণ-বেগ নিয়ে অ্যাপোলো পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলের বিরুদ্ধে ছুটে এগিয়ে চলল চাঁদের দিকে। এই যাত্রাশুরুর একটি মাহেন্দ্রক্ষণও রয়েছে, যার মেয়াদ হল পাঁচ ঘণ্টার মত। এই সময়ের মধ্যেই পৃথিবী থেকে রওনা হতে হবে। ডিসেম্বর মাসের আরো ছটা দিন সুযোগটা হাতে থাকবে। সেটা ফসকে গেলেই চাঁদে অভিযানের জন্যে আরো কয়েক মাস অপেক্ষা না করে উপায় নেই।

অ্যাপোলোর লক্ষ্যস্থল হল চাঁদ। চাঁদে পৌছবার জন্যে অ্যাপোলোকে পাড়ি জমাতে হবে প্রায় ৩৫০,০০০ কিলোমিটারের মত পথ। সময় লাগবে ৬৪ ঘণ্টা। ছুটতে হবে এক অভ্রান্ত লক্ষ্যপথে। অ্যাপোলো যখন চাঁদের পৃথিবী পরিক্রমা-পথের কাছে গিয়ে হাজির হবে, তখন সেখানে চাঁদের সঙ্গে দেখা হতে তার যেন ভুল না হয়। এ ব্যাপারে গতিবিজ্ঞানের কি নির্ভুল নিয়মকে মেনে চলতে হবে তা নিয়ে আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি।

অ্যাপোলোর অভ্যন্তরে

অ্যাপোলোর বাহক রকেট স্যাটার্নের তৃতীয় পর্যায়ের কাজ যেই শেষ হল, অমনি অ্যাপোলোর তিনটি যাত্রী এক সম্পূর্ণ ওজনবিহীন অবস্থার মধ্যে এসে পড়েন। ওজনবিহীন অবস্থার সঙ্গে মহাকাশযাত্রীরা ইতিপূর্বে প্রত্যেকেই পরিচিত হয়েছেন। অ্যাপোলোর যাত্রী বোরমান এবং লভেল বেশ কিছুদিন আগে মহাকাশযান জেমিনি-৭-এর যাত্রীরূপে পুরো চোদ্দ দিন সম্পূর্ণ ওজন-বিহীন অবস্থায় পৃথিবীকে পরিক্রমা করেছিলেন।

মহাকাশে মহাজাগতিক রশ্মি, সূর্যদেহজাত অতিবেগুনি রশ্মি, রঞ্জন রশ্মি এবং সৌরকণিকাস্রোতের যে তীব্রতা, তার প্রভাব মানব-দেহের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। বিশেষ করে পৃথিবী থেকে বিভিন্ন দূরত্বে যে তিনটি বিকিরণ বলয় পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে, তাদের তেজস্ক্রিয় কণিকারা যাতে অ্যাপোলোর

যাত্রীদের ওপর কোন ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করতে না পারে, সে সম্পর্কে সমস্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা মহাকাশযানের মধ্যে ছিল। যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয় রশ্মি অ্যাপোলোর যাত্রীরা গ্রহণ করেছেন, অ্যাপোলোর আভ্যন্তরীণ তেজস্ক্রিয়তা পরিগণক-যন্ত্রের কাছ থেকে তার একটি হিসেবও পাওয়া গেছে। পর-পর তিনটি এক্স-রে ছবি তোলার পর যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তাকে আমরা গ্রহণ করি, তার চেয়ে এই পরিমাণ বেশি নয়। এটুকু তেজস্ক্রিয়তা গ্রহণে আমাদের জৈবিক ব্যবস্থার কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই।

পৃথিবীর চারপাশের বিকিরণ বলয়গুলোর তেজস্ক্রিয়তার সঙ্গে সূর্যদেহের সৌরোচ্ছ্বাসের একটি নিকট সম্পর্ক রয়েছে। সূর্যের দেহে সৌরকলঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্ত হাইড্রোজেন গ্যাসের শিখা সৌরোচ্ছ্বাসের আকারে মাঝে মাঝে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত এসে পৌঁছয়। অ্যাপোলোর মহাকাশ-যাত্রার সমগ্র সময় জুড়ে সূর্যের দেহের প্রতিটি ঘটনার ওপর কড়া নজর রাখা হয়েছিল। বিজ্ঞানের ইতিহাসে সূর্যকে বোধহয় কখনো এতটা নজরবন্দী অবস্থায় থাকতে হয় নি।

বায়ুহীন মহাকাশে অ্যাপোলোর যে পিঠ ছিল সূর্যের দিকে ফেরানো, সেদিকটা প্রায় ২০০ থেকে ২৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের প্রচণ্ড তাপে তপ্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু উলটো বা অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটা ছিল শূন্য ডিগ্রিরও নিচে,—২০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের এক পরম শীতলতায় আচ্ছন্ন। বায়ুর বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদানেরাই পৃথিবীতে আলো এবং তাপকে প্রতিফলিত করে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়, যার ফলে দিনের বেলা ছায়াতে দাঁড়িয়েও বিভিন্ন বস্তুকে দেখার ব্যাপারে যেমন আমাদের কোন অসুবিধে হয় না, তেমনি সূর্যের তাপের কিছুটা অংশকেও আমরা অনুভব করি। কিন্তু বায়ুহীন মহাকাশে সূর্যের আলো ও তাপকে ছড়িয়ে দেবার কোন উপাদান নেই।

অ্যাপোলো : একটি নির্ভুল যন্ত্র

মহাকাশযানের দুই পিঠে তাপের অসম অবস্থার ফলে যাতে সেটি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তার জন্যে অ্যাপোলোর দেহসংলগ্ন রেট্রো রকেটের ক্ষুদে গ্যাস জেটের সাহায্যে সমগ্র মহাকাশযানটিকে প্রতি এক ঘণ্টায় একবার সম্পূর্ণ আবর্তিত করে ওর সমগ্র দেহ জুড়ে তাপের সমভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

মহাকাশযানের ভেতরে তাপমাত্রা সব সময়েই ৭০ থেকে ৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল। এছাড়া সেখানে অক্সিজেনের নিয়মিত সরবরাহ এবং বায়ুর নির্দিষ্ট চাপও রক্ষিত হচ্ছিল। নিশ্বাসের সঙ্গে যে

কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস মহাকাশযাত্রীরা নির্গত করছিলেন, তাকে শুষে নেবার জন্যে ছিল সুষ্ঠু ব্যবস্থা। এছাড়া মহাকাশযাত্রীদের প্রয়োজনীয় খাবার-দাবার, জল, অক্সিজেন এবং অন্যান্য সামগ্রী সবকিছুই ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণে। অ্যাপোলোর আভ্যন্তরীণ কম্পিউটার যন্ত্র যেমন মহাকাশযাত্রীদের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রতিটি জৈবিক ব্যবস্থার ওপর খবরদারি বজায় রাখছিল, তেমনি পৃথিবী থেকেও বিজ্ঞানীরা একই ধরণের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে কার্যকরী রেখে-ছিলেন। মহাকাশযাত্রীদের নাড়ীর চাপ, হৃদস্পন্দন এবং অন্যান্য জৈবিক প্রক্রিয়ার প্রতিটি খবর বেতার-তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে তাঁদের কাছে এসে পৌঁছচ্ছিল।

অ্যাপোলো মহাকাশযানের সঙ্গে পৃথিবীতে তথ্য সংগ্রাহক কেন্দ্রের বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা সব সময়েই অক্ষুণ্ণ ছিল। অবশ্য পৃথিবীর আপন অক্ষের ওপর ঘূর্ণনের জন্যে এই যোগাযোগটা পালা করে পরিবর্তিতও হচ্ছিল। আমেরিকার হিউসটনে ছিল মূল তথ্য সংগ্রাহক কেন্দ্রটি। বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে গৃহীত অ্যাপোলোর প্রতিটি তথ্য এসে পৌঁছচ্ছিল হিউসটনে। সেখানে অগণিত কম্পিউটার-যন্ত্র মুহূর্তের মধ্যে সেই বিপুল পরিমাণ তথ্যকে বিশ্লেষণ করে অ্যাপোলোর গতিপথ, বেগ, অবস্থান এবং আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন যন্ত্র-ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রতিটি প্রয়োজনীয় খবরকে বিজ্ঞানীদের হাতে তুলে দিচ্ছিল। অ্যাপোলোর কোন একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে সামান্য পরিমাণে ত্রুটি বা বিপর্যয় দেখা দিলে সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞেরা সঙ্গে সঙ্গে মিলিত হয়ে সমস্যার সঠিক সমাধান বার করে ফেলতেন। অ্যাপোলোর তিনটি মানুষের জীবনের নিরাপত্তার সমগ্র দায়িত্ব রয়েছে যে তাঁদের হাতে।

অ্যাপোলোর যাত্রীরা যত পৃথিবী থেকে দূরে চলে যান, তত নিকষ কালো মহাকাশের পটভূমিতে সমগ্র পৃথিবীর এক আশ্চর্য সুন্দর রূপ তাঁদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে থাকে। পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে তাঁদের মনে হচ্ছিল, এ যেন জলময় একটি বস্তু ; শুধু জলেরই রাজত্ব এখানে। ঘন নীল রঙের মধ্যেও কত রকমফের। মহাদেশের জমির রঙটা সাধারণত ধূসর বর্ণের। মেঘগুলোকে দেখাচ্ছিল উজ্জ্বল সাদা রঙের। পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে চোখ প্রায় ঝলসে যাবার মত হয়। পৃথিবীর জ্যোৎস্না বা যে পরিমাণ সূর্যের আলোকে পৃথিবী প্রতিফলিত করছে, তা চাঁদের জ্যোৎস্নার চেয়েও ছিল অনেক বেশি উজ্জ্বল।

মহাকাশ থেকে অ্যাপোলোর যাত্রীরা পৃথিবী ও চাঁদের কিছু আশ্চর্য সুন্দর টেলিভিশন ছবি পৃথিবীর মানুষকে উপহার দিয়েছেন।

প্রজাপতি অঞ্চল

২৩শে ডিসেম্বর ভারতীয় সময় রাত প্রায় দুটো। অ্যাপোলো মহাকাশ-যানের সঙ্গে এখন পৃথিবীর দূরত্ব দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩,২৫,০০০ কিলোমিটার। পৃথিবী থেকে এই পর্যন্ত গোটা অঞ্চলটা জুড়ে পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলের রাজত্ব। চাঁদ, সূর্য বা অন্য গ্রহদের অভিকর্ষ-বলের তুলনায় এখানে পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলের জোরটা বেশি।

এবারে অ্যাপোলোর প্রবেশ ঘটছে চাঁদের অভিকর্ষ-বলের সাম্রাজ্যে, যে অঞ্চলে পৃথিবীর অভিকর্ষের চেয়ে চাঁদের অভিকর্ষের জোরটা অনেক বেশি। এই যে অঞ্চল, যেখানে পৃথিবী ও চাঁদের বিপরীতমুখী অভিকর্ষ-বলের জোরটা সমান, তার নাম হল সম-অভিকর্ষ মণ্ডল (equigravisphere)। কিছু বিজ্ঞানী এই অঞ্চলটার কৌতুক করে নাম দিয়েছিলেন প্রজাপতি অঞ্চল (butterfly zone)। এ জাতীয় নামকরণের পেছনে একটা কারণ ছিল। বিজ্ঞানীরা মনে করতেন, এ অঞ্চলে পৃথিবী ও চাঁদের অভিকর্ষ-বল পরস্পরের সমান ও বিপরীতমুখী হওয়ার জন্যে যে-কোন গতিশীল বস্তুই এখানে প্রবেশ করলে এক অচল অবস্থা লাভ করে বসবে। মহাকাশের সৌখীন ভ্রমণকারী ছোটখাট বেশ কিছু উল্কা এবং আরো নানাবিধ বস্তু নাকি এই অঞ্চলে বন্দী হয়ে কালযাপন করছে। মানুষকে নিয়ে চন্দ্রযাত্রী মহাকাশযান যদি এই অঞ্চলের মধ্যে বন্দী হয়ে অচলাবস্থা লাভ করে বসে, তাহলে ব্যাপারটা যে কি পরিমাণে শোকাবহ হয়ে উঠতে পারে, সেটা ভাববার চেষ্টা করতেই কিছু-কিছু বিজ্ঞানীর মানসিক অবস্থাটা দাঁড়াত—পেটের মধ্যে গোটাকয়েক প্রজাপতি ঢুকে বসলে যা দাঁড়ায় ঠিক তাই।

সে যাই হোক, অ্যাপোলোর যাত্রীরা যেমন ঐ প্রজাপতি অঞ্চলের মধ্যে বন্দীও হয়ে পড়েন নি, তেমনি সেখানে বন্দী অন্য কোন বস্তুজাতীয় বাসিন্দার সঙ্গেও তাঁদের দেখা হয় নি।

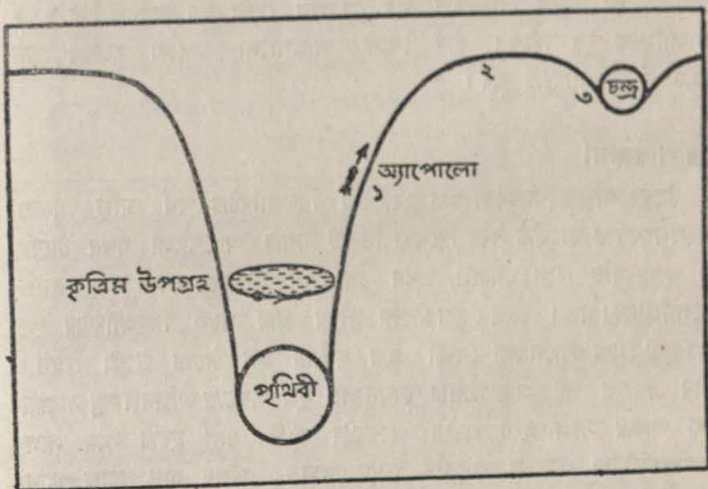
সম-অভিকর্ষ মণ্ডলে পৌঁছনোর পর অ্যাপোলোর বেগ দাঁড়িয়েছিল ঘণ্টায় ৩৫০০ কিলোমিটার। অ্যাপোলো পৃথিবী থেকে চাঁদের দিকে কিন্তু যাত্রা শুরু করেছিল প্রায় ৩৯০০০ কিলোমিটার বেগ নিয়ে। অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলের বিরুদ্ধে ছুটতে গিয়ে মাঝরাস্তায় অ্যাপোলোর ঘণ্টায় প্রায় ৩৫০০০ কিলোমিটার বেগ খোয়া গেছে।

চাঁদের সাম্রাজ্যে

অ্যাপোলো এবারে চাঁদের অভিকর্ষ-বলের হাতে নিজেকে সঁপে দেয়।

তার বেগও ক্রমেই বেড়ে চলে। পৃথিবী থেকে চাঁদের এই এলাকা পর্যন্ত পৌঁছনোর ব্যাপারটাকে একটা পাহাড়ের খাড়া পথ বেয়ে ওপরে উঠে এসে তারপর তার ঢালু গা বেয়ে গড়িয়ে নেমে চলার অবস্থার সঙ্গে অনেকটা তুলনা করা যায়।

নিষ্ক্রমণ-বেগের সাহায্যে অ্যাপোলো পৃথিবী থেকে যত দূরে ছুটে চলছিল, তত পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলের টানে তার বেগ কমছিল। এটা যেন পাহাড়ের খাড়াই রাস্তা। এই খাড়াই রাস্তাটা পৃথিবী থেকে ধরা যাক প্রায় ১৫০,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। (নিচের ছবিতে ১ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।) এই খাড়াই রাস্তাটা পেরিয়ে যদি একবার সমতল জায়গাটায় (ছবিতে ২ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে) এসে পৌঁছনোর মত ব্যবস্থা করে ফেলা যায়, তাহলে



পৃথিবী থেকে চাঁদে যাওয়া যেন পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে
উঠে আবার তার ঢালু গা বেয়ে নেমে আসা।

আর ভাবনা নেই। এখানে পৌঁছতে পারলে পৃথিবীর পিছুটানও আর ফেরাতে পারবে না। তারপর সম-অভিকর্ষ মণ্ডল থেকে বাদবাকি রাস্তাটা যেন পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে (ছবিতে ৩) চাঁদের দিকে স্রেফ গড়িয়ে চলা। ওপরের ছবিতে দেখতে পাচ্ছি একটি কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথ তৈরি হয়েছে পৃথিবীর জমির প্রায় কোল ঘেঁসে।

অ্যাপোলোর দেহ-সংলগ্ন রকেটগুলোর এতক্ষণ পর্যন্ত চলছিল পূর্ণ

বিশ্রাম। অ্যাপোলো ছুটে চলেছে মহাজাগতিক গতিবিদ্যার অমোঘ নিয়মে। পৃথিবী থেকে এ পর্যন্ত সারাটা পথ ধরে সে এত নির্ভুলভাবে ছুটেছে যে মাঝরাস্তায় ওর গতিপথের সামান্য পরিবর্তনের জন্যে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হয় নি। প্রয়োজন হলে পৃথিবী থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে কয়েকটি বেতার-সংকেত পাঠিয়ে অ্যাপোলোর গতিপথ পরিবর্তনের পরিকল্পনাও বিজ্ঞানীদের আগে থেকেই তৈরি করা ছিল।

যাত্রাশুরুর ঠিক ৬৬ ঘণ্টা বাদে, অ্যাপোলো অভিযানের নায়ক বোরমান মহাকাশযানের অবস্থা নিয়ন্ত্রক (attitude control) মোটরকে চালু করলেন। ফলে অ্যাপোলোর বেগ প্রতি সেকেণ্ডে আধ মিটারের কিছু বেশি পরিমাণে বেড়ে উঠল। এর ফলে অ্যাপোলো যে গতিপথ ধরে ছুটবে, চাঁদের কাছে পৌঁছনোর পর সে পথ তৈরি হবে চাঁদের জমির ১১২ কিলোমিটার দূর দিয়ে। চাঁদ থেকে অ্যাপোলো তখনো রয়েছে প্রায় ৪০,০০০ কিলোমিটার দূরে।

চন্দ্র পরিক্রমা

চাঁদের অভিকর্ষ-সাম্রাজ্যে প্রায় ৩২,০০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি জমিয়ে ২৪শে ডিসেম্বর ভারতীয় সময় বিকেল তিনটে নাগাদ অ্যাপোলো যখন চাঁদের খুব কাছাকাছি এসে পৌঁছল, তখন তার বেগ দাঁড়িয়েছে ঘণ্টায় প্রায় ৯৩০০ কিলোমিটারের মত। এই বেগে চাঁদের জমির প্রায় ১৬০ কিলোমিটার দূর দিয়ে ছুটে গিয়ে অ্যাপোলো সোজা এসে হাজির হল চাঁদের উল্টো পিঠে। সুদীর্ঘ স্তব্ধতার পর অ্যাপোলোর দেহসংলগ্ন মূল রকেটের এঞ্জিন কিছু সময়ের জন্যে আবার সচল হয়ে ওঠে। রকেটের এঞ্জিন চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশযাত্রীরাও ওজনের অনুভূতি ফিরে পান। এঞ্জিন চালু করার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল অ্যাপোলোর বেগ কমানো।

৩৬ মিনিটের জন্যে অ্যাপোলো ছিল চাঁদের উল্টো পিঠে। ঐ সময় পৃথিবীর যোগাযোগ কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে অ্যাপোলোর বেতার-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ঐ সময়টুকু ছিল সমগ্র চন্দ্র অভিযানের মধ্যে সবচেয়ে শঙ্কাজনক কয়েকটি মুহূর্ত। ঐ অবস্থায় কয়েকটি দুর্ঘটনার যে-কোন একটিই ঘটতে পারত। প্রথমত, অ্যাপোলোর প্রধান রকেটের এঞ্জিন হয়ত আদৌ কাজই করে উঠত না। অথবা ওর যতটুকু সময় কাজ করার কথা তার চেয়ে হয়ত অনেক কম সময়ের জন্যেও কাজ করত। আবার রকেট হয়ত এমন জোরালো-ভাবে কাজ করে বসত যে ওর নিয়ন্ত্রণের সব ব্যবস্থাই অকেজো হয়ে দাঁড়াত।

ফলে অ্যাপোলো মহাকাশযান এবং ওর যাত্রীরা একটা বুলেটের মত বেগে আছড়ে পড়ত চাঁদের জমির ওপরে।

অ্যাপোলোর রকেটের কিন্তু ভুল হয় নি। পরম নির্ভুলভাবে সে কাজ করল এবং ওর ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করল যথাযথভাবে; ও অ্যাপোলোর বেগ ঘণ্টায় ৯৩০০ কিলোমিটার থেকে কমিয়ে এনে দাঁড় করাল ঘণ্টায় ৫৯০০ কিলোমিটারে। ঐ বেগ নিয়ে অ্যাপোলোর শুরু হল এক নতুন জীবন। চাঁদেরই এক কৃত্রিম উপগ্রহ বা ক্ষুদে চাঁদরূপে চাঁদের চারপাশে এক উপবৃত্তাকার কক্ষপথে শুরু হল ওর চন্দ্র পরিক্রমা। চাঁদের জমি থেকে এই কক্ষপথের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দূরত্ব ছিল যথাক্রমে ৩০৪ ও ১১২ কিলোমিটার।

চাঁদের চারপাশে কোন কক্ষপথে একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে যে ন্যূনতম বেগ দরকার, তার পরিমাণ হল ঘণ্টায় ৫৯০০ কিলোমিটার। চাঁদকে দু-চক্কর ঘোরার পর মূল রকেটকে আবার চালু করে অ্যাপোলোকে চাঁদের জমির ১১২ কিলোমিটার উচ্চতায় এক বৃত্তাকার কক্ষপথে বসানো হল। রকেটের এঞ্জিনের কাজ চাঁদের কক্ষপথে পৌঁছেই শেষ হল। এঞ্জিন চালু থাকাকালীন অবস্থায় মহাকাশযাত্রীরা তাঁদের যে ওজনটা ফিরে পেয়েছিলেন, সেটাকে আবার হারিয়ে বসলেন।

১১২ কিলোমিটার উচ্চতায় চাঁদকে একবার পরিক্রমা সম্পূর্ণ করতে অ্যাপোলোর সময় লাগছিল দু-ঘণ্টার মত এবং পুরো দশ বার সে চাঁদকে পরিক্রমা করে চলে। চাঁদকে এক একবার পরিক্রমার সময়, ৪৫ মিনিটের জন্যে অ্যাপোলো যখন চাঁদের উলটো পিঠের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল, তখন চাঁদের আড়ালের জন্যে পৃথিবীর সঙ্গে অ্যাপোলোর বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল। ২০ ঘণ্টায় দশবার চাঁদকে পরিক্রমার মধ্য দিয়ে অ্যাপোলো চাঁদের প্রায় সমগ্র অঞ্চলের ওপর দিয়েই পাড়ি জমিয়ে চলে।

চাঁদের কোলের কাছে

অ্যাপোলো-৮ এর অভিযাত্রীরাই ছিলেন পৃথিবীর প্রথম তিনটি মানুষ, যাদের কাছে চাঁদের বিচিত্র প্রকৃতির ছবি অত্যন্ত কাছে থেকে এই সর্বপ্রথম ধরা দিল। অ্যাপোলোর চন্দ্র অভিযানের এটাই ছিল বোধ হয় সবচেয়ে বড় সাফল্য।

পৃথিবীর তিনটি মানুষের চোখে চাঁদ তার বায়ুহীন, জলহীন, প্রাণহীন প্রকৃতিকে মেলে ধরে। চাঁদের জমির দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল যেন ওর চেহারাটা প্লাস্টার অব্ প্যারিস বা সাগরের উপকূলে ধূসরবর্ণ বালিরাশির মত। চাঁদের সবটাই যেন ধূসরবর্ণ, আর কোন রঙের বালাই নেই বললেই চলে।

চাঁদের জমি জুড়ে ছোট বড় বিভিন্ন চেহারার হাজার হাজার আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের মালা। সংখ্যার যেন ওদের আর শেষ নেই। বড় জ্বালামুখগুলোর ভেতরে আবার অজস্র ছোট জ্বালামুখ এবং তলদেশ জুড়ে লম্বা চেহারার ফাটল এবং গর্তের ছড়াছড়ি। চাঁদের জমির চেহারাটা বেশির ভাগ জায়গাতেই ভাঙাচোরা ; বিরাট বড় চেহারার সব স্তূপ পাথর বিভিন্ন জায়গায় জড়ো হয়ে রয়েছে।

চাঁদের ছবি অভিযাত্রীদের মনে বিভিন্ন রকম ভাবে রেখাপাত করেছে। লভেলের মনে হয়েছে—এত বড় রুক্ষ, প্রাণহীন একটা মরুর রাজত্ব মানুষের উপলব্ধিতে এর আগে কখনো ধরা পড়েনি। চাঁদকে দেখে অ্যাণ্ডার্সের মনে হয়েছে—চাঁদের চেহারাটা সাগরের উপকূলে নোংরা বালির মত সাদাটে ধূসরবর্ণ এবং তার ওপরে যেন অনেকগুলো পায়ের ছাপ। বোরমান ভেবেছেন—চাঁদ হল এক বিরাট নির্জন নিষিদ্ধ এলাকা ; যেদিকে চোখ পড়ে সেদিকেই শুধু পুঞ্জীভূত হয়ে আছে পিউমিস স্টোন বা ঝামা-পাথরের স্তূপ। চাঁদের এমন কোন উপকরণই নেই, যাতে সেখানে গিয়ে বসবাস করা বা কাজ করার জন্যে মানুষ কোনদিন আগ্রহী হয়ে উঠবে। চাঁদের খোঁচা-খোঁচা এবড়োখেবড়ো চেহারার বিরাট পাহাড়গুলো এবং কালচে রঙের মেরিয়া বা জমাট-বাঁধা লাভার বিরাট সমুদ্রগুলো দেখেছেন অভিযাত্রীরা। দু-একটি জ্বালামুখের পাশে চাঁদের রহস্যময় রশ্মিরও সন্ধান পেয়েছেন তাঁরা। চাঁদের উলটো পিঠের ওপর দিয়ে যাবার সময় মনে হয়েছে, সে পিঠের চেহারাটা যেন একটা বালিয়াড়ির মত ; শুধু কতকগুলো গর্ত আর ঢিবির মত উঁচু-উঁচু জায়গা—সুবিন্যস্ত কোন গঠন বা আকার সেখানে চোখে পড়ে না বললেই চলে।

মহাকাশের বুকে পৃথিবী

যেমন পৃথিবী থেকে চাঁদের দেশে যাবার সময়, তেমনি চাঁদের দেশ পরিক্রমাকালে মহাকাশযাত্রীদের পৃথিবীর কথা বার-বার মনে হয়েছে। প্রায় ৩,৭০,০০০ কিলোমিটার দূরে ফেলে আসা পৃথিবীর দিকে যখন তাঁরা ফিরে তাকিয়েছেন, তখন নিকষ কালো অসীম মহাকাশের বুকে পৃথিবীকে দেখাচ্ছিল অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি উজ্জ্বল বস্তুর মত। পূর্ণিমার রাতে চাঁদকে আমরা যত বড় দেখি, তার চেয়ে প্রায় বারোগুণ বড় একটি গোল বলের মত দেখাচ্ছিল গোটা পৃথিবীকে।

পৃথিবীর অধিকাংশ জায়গা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করার জন্যে পৃথিবীর বাকি অংশের যে জ্যোৎস্না, তা ছিল চাঁদের

জ্যোৎস্নার চেয়েও আট থেকে দশগুণ বেশি উজ্জ্বল। চাঁদ থেকে অভিযাত্রীরা যখন অনেকটাই দূরে ছিলেন, তখন পৃথিবীর এই জ্যোৎস্নার আলোয় সমস্ত আকাশ এতই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল যে আকাশের তারাগুলোকেও তাঁরা দেখতে পাচ্ছিলেন না। পৃথিবী থেকে অনেকটা দূরে চলে আসার পর তবেই তারাগুলো অভিযাত্রীদের দৃষ্টিগোচর হয়ে ওঠে।

পৃথিবীর মহাদেশগুলোকে অভিযাত্রীরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন—একটা গ্লোবের মধ্যে আমরা যেমন দেখি, হুবহু সেরকম। মহাসাগরের জলের নীল রঙের জন্যে সারা পৃথিবীকে ঘিরে একটা নীল রঙের দ্যুতি প্রকাশ পাচ্ছিল। তাঁরা পরিষ্কার দেখছিলেন, পৃথিবীর একটি গোলার্ধের কোন-কোন দেশের ওপর ঝোড়ো মেঘ জড়ো হয়েছে। তাঁরা তখন ঠাট্টা করে অ্যাপোলোর সঙ্গে বেতারে যোগাযোগ-রক্ষাকারী কেন্দ্রগুলোকে ঐ সব দেশের লোকেদের সাবধান হবার নির্দেশ দিতে বলেছেন।

মহাকাশযাত্রী লভেল জানিয়েছেন, মহাসাগরের জলের নীল রঙ ও মহাদেশের জমির সবুজ রঙে ভরা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে পৃথিবীতে আদৌ কোন প্রাণীজগত রয়েছে কি না, তা এত দূর থেকে কেউ বুঝে উঠতে পারবেন না। অ্যাপোলোর অভিযাত্রীরা যেমন চাঁদের বহু আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন, তেমনি ভবিষ্যতে চাঁদের জমিতে যাত্রীসমেত রকেটের অবতরণের জন্য নির্দিষ্ট পাঁচটি জায়গাকে তাঁরা বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন।

একটি তথ্য

চাঁদের চারপাশে অ্যাপোলোর পরিক্রমা-পথের চেহারা সংক্রান্ত যে তথ্য ক্রমাগত বেতার-সঙ্কেতের মাধ্যমে পৃথিবীর যোগাযোগ-কেন্দ্রগুলোতে এসে পৌঁছচ্ছিল, সেগুলোর বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ধরা পড়ল যে, সেই পরিক্রমা-পথের মাঝে বিচ্যুতি ঘটছে।

এটা অবশ্য নতুন খবর নয়। ইতিপূর্বে অর্বিটার-৪ নামে যে কৃত্রিম উপগ্রহ বা ক্ষুদে চাঁদটিকে আমেরিকার বিজ্ঞানীরা চাঁদের চারপাশে বসিয়েছিলেন, তার কাছ থেকে পাওয়া তথ্য থেকে জানা গিয়েছিল যে চাঁদের অভিকর্ষ-বল সর্বত্র সমান নয়। এই বলের পরিমাণ কিছু-কিছু জায়গায় অন্যান্য জায়গার তুলনায় বেশি। বিজ্ঞানীরা তখন অনুমান করেছিলেন যে এই ব্যাপারটা জমির ত্বকের নিচে লোহা আর নিকেল দ্বারা গঠিত উল্কাপিণ্ডজাতীয় অত্যন্ত ঘন বস্তুদের অবস্থানের জন্যই ঘটছে।

এবারে ফেরার পালা

২৫শে ডিসেম্বর বুধবার ভারতীয় সময় সকাল ১১টা বেজে ৪০ মিনিট। অ্যাপোলোর অভিযাত্রীদের পৃথিবীর দিকে ফেরার পালা শুরু হল। এই মুহূর্তটিই ছিল বিশেষভাবে উৎকণ্ঠাজনক। অ্যাপোলোর রকেটের এঞ্জিনটি যখন ফেরার জন্যে চালু হতে চলেছে তখন অ্যাপোলো চাঁদের উল্টো পিঠের ওপর দিয়ে পরিক্রমা করছে। চাঁদের আড়ালের জন্যে পৃথিবীর সঙ্গে পুরো ৪১ মিনিট ধরে তার কোন বেতার-যোগাযোগ নেই। অ্যাপোলোর রকেটের এঞ্জিন যদি আদৌ চালু না হয়ে বন্ধই থেকে যেত, তাহলে চাঁদের অভিকর্ষ-বলের বিরুদ্ধে ছুটে বেরোনোর জন্যে প্রয়োজনীয় ঘণ্টায় ৯৩০০ কিলোমিটারের বেগটা তৈরীই হয়ে উঠত না। অভিযাত্রীরা বরাবরের মত চাঁদের কক্ষপথে বন্দী হয়ে পড়তেন এবং কিছুদিন বাদে অক্সিজেনের অভাবে তাঁদের মৃত্যু হত। কিন্তু অ্যাপোলোর রকেটের নির্ভুল যান্ত্রিক ব্যবস্থা ১৯৭ সেকেণ্ড চালু থেকে অ্যাপোলোর বেগ ঘণ্টায় ৫৭৬০ কিলোমিটারে পৌঁছে তাকে পৃথিবীর অভিমুখে সঠিক পথে এগিয়ে দিয়েছিল।

রকেটের এঞ্জিন যতক্ষণ চালু ছিল, অভিযাত্রীরা পুরো ওজন ফিরে পেয়েছিলেন, কিন্তু যেই এঞ্জিন বন্ধ হয়ে আসে, অমনি তাঁরা আবার এক ওজনবিহীন অবস্থার মধ্যে এসে পড়েন।

অ্যাপোলোর সঙ্গে চাঁদের দূরত্ব যত বেড়ে চলে, ততই চাঁদের অভিকর্ষের প্রভাবে তার ঘণ্টায় ৯৩০০ কিলোমিটারের বেগটা কমে আসতে থাকে। চাঁদের অভিকর্ষ সাম্রাজ্যের প্রান্তসীমায় বা পৃথিবী ও চাঁদের সম-অভিকর্ষ মণ্ডলে যখন অ্যাপোলো এসে উপস্থিত হল, তখন থেকে আবার পৃথিবীর অভিকর্ষের প্রভাবে তার ছোটার বেগটা বেড়ে চলল।

পৃথিবী থেকে চাঁদে আসা বা চাঁদ থেকে পৃথিবীতে ফেরার সময় একটি অভিকর্ষ এলাকা থেকে আর একটি অভিকর্ষ এলাকায় যে উত্তরণ, তা অভিযাত্রীদের আদৌ টের পাবার কথা নয়। বিভিন্ন সময়ে রকেটের এঞ্জিন চালু থাকার অল্প কিছু সময় ছাড়া বাদবাকি পুরো সময়টাই তাদের ওজনের যেমন কোন অনুভূতি ছিল না, তেমনি ঐ সময়টুকু ছাড়া নিজেদের বেগের কমা বাড়ার ব্যাপারটাও তাঁরা আর কখনোই উপলব্ধি করেন নি। এই বেগের ধারণাটা তাঁরা করতে পারতেন, যদি কাছাকাছি কোন গতিশীল বস্তুর সঙ্গে নিজেদের গতিকে মিলিয়ে অ্যাপোলোর আপেক্ষিক গতিকে বুঝতে পারতেন।

চাঁদ থেকে যাত্রা শুরুর প্রায় ৫৮ ঘণ্টা বাদে অ্যাপোলো তার যাত্রীদের নিয়ে পৃথিবীর কাছাকাছি যখন এসে পৌঁছল তখনও আর একটি গভীর সঙ্কট

তার জন্যে মাঝরাস্তায় অপেক্ষা করছে। এটি হল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে ঘর্ষণ-জনিত প্রচণ্ড তাপের সমস্যা। পৃথিবীর অভিকর্ষের প্রভাবে অ্যাপোলোর বেগ বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত ঘণ্টায় ৪০,০০০ কিলোমিটারে এসে দাঁড়িয়েছিল। এই বিরাট বেগ নিয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের ঠিক আগের মুহূর্তে অ্যাপোলোর যাত্রীরা তাদের মহাকাশযানের বৃহত্তম অংশ সার্ভিস মডিউলটিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন।

অ্যাপোলো মহাকাশযান এখন এসে দাঁড়াল ৩'১৮ মিটার উঁচু এবং ৩'৫৮ মিটার ব্যাসবিশিষ্ট একটি ছোট কক্ষে যার মধ্যে রয়েছেন তিনজন মহাকাশযাত্রী। ছ-দিন আগে এই কমাণ্ড মডিউল ও সার্ভিস মডিউলরূপী বোঝাদুটিকে ঘাড়ে নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল তিন হাজার টনের একটি রকেট।

পৃথিবীর বায়ু সমুদ্রে

২৭শে ডিসেম্বর ভারতীয় সময় রাত ৯টা বেজে ৭ মিনিটে অ্যাপোলো যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের অতি তনু এলাকার মধ্যে প্রবেশ করল, তখন তার বেগ দাঁড়িয়েছে ঘণ্টায় ৩৯,৫৯০ কিলোমিটার। অ্যাপোলোর অভিযাত্রীদের মনে হচ্ছিল যে তাঁদের দৈহিক ওজনের চেয়ে প্রায় সাতগুণ বেশি ভারি একটি বোঝা যেন বুকের ওপর চাপানো হয়েছে।

বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে নেমে আসার সময় মহাকাশযানের চারপাশে খাদ-বিহীন ইস্পাত ও শক্ত প্লাস্টিকে তৈরি একটি স্তরবিশিষ্ট তাপ-আবরণীর তাপমাত্রা দাঁড়ায় প্রায় ৬০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে। মহাকাশযানের অভ্যন্তরে তাপমাত্রা অবশ্য সব সময়েই ৭ ডিগ্রি ফারেনহাইটের মাত্রায় রক্ষিত হচ্ছিল।

যে পথে অ্যাপোলোর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার কথা যদি তার চেয়ে বেশি খাড়াভাবে অ্যাপোলো নেমে আসত, তাহলে ঘর্ষণজনিত তাপমাত্রার পরিমাণ দাঁড়াত প্রায় ১০,০০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে, যে তাপে অ্যাপোলোর জ্বলে যাবার সম্ভাবনা ছিল পুরোমাত্রায়। আবার অ্যাপোলো যদি একটু বেশি তেরছাভাবে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করত, তাহলে একখণ্ড ঢিল যেমন অনেক সময় জলে পড়ে জলের ওপর থেকে পিছলে আবার লাফিয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি অ্যাপোলো বায়ুমণ্ডল থেকে লাফিয়ে উঠত মহাকাশে। কিন্তু যে বেগে অ্যাপোলো লাফিয়ে উঠছে, তার পরিমাণ হল ঘণ্টায় ৪০,০০০ কিলোমিটার এবং এ হল পৃথিবী থেকে 'নিষ্ক্রমণ বেগের' সমান। সেই বেগে অ্যাপোলো পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলের টানকে কাটিয়ে সোজা চলে যেত সূর্যলোকের দিকে। অ্যাপোলোর অভিযাত্রীদের আর আমরা কখনোই ফিরে পেতাম না।

কাজেই, এ যেন একটিমাত্র সরু পথ অ্যাপোলোর জন্যে খোলা রয়েছে, যেটি ছাড়া আর কোন পথ দিয়েই তার পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢোকার ছাড়পত্র নেই। পৃথিবীর জমি থেকে প্রায় ১২০,৮৮০ মিটার দূরে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে এই প্রবেশ পথের ব্যাস বা বিস্তৃতি হল প্রায় ৪২ কিলোমিটারের মত।

বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার পর অ্যাপোলোর দেহ-সংলগ্ন একটি স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার গ্যাস জেটের সাহায্যে মহাকাশযানের কক্ষটির ভোঁতা দিকটিকে একবার সামনের দিকে আর একবার নিচের দিকে আন্দোলিত করা হতে থাকে। এভাবে পরিচালনার ফলে অ্যাপোলোর বেগ আরো খানিকটা কমে আসে।

অ্যাপোলো মহাকাশযানের বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে প্রবেশের সময় ঘর্ষণের ফলে যে প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি হচ্ছিল, তার ফলে বায়ুর বিভিন্ন উপাদানের পরমাণুরা আয়নিত হয়ে গিয়ে অ্যাপোলোর চারপাশে একটি আয়নরূপী আবরণী তৈরি করে তুলেছিল। ফলে মিনিট-তিনেকের জন্যে অ্যাপোলোর অভিযাত্রীদের সঙ্গে পৃথিবীর যোগাযোগ-কেন্দ্রের বেতার-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

পৃথিবীর জমির প্রায় ৩˙৭২ মিটার ওপরে অ্যাপোলোর পেছন দিকে প্রথমে তিনটি ছোট ও পরে তিনটি বড় প্যারাশুট খুলে দেওয়া হয়। এরা অ্যাপোলোর বেগ আরো কমিয়ে আনে এবং অবশেষে ঘণ্টায় মাত্র ৩৫ কিলোমিটার বেগে তিনজন মহাকাশযাত্রীকে নিয়ে অ্যাপোলো ভারতীয় সময় রাত ৯টা বেজে ১১ মিনিটে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরে এসে নিরাপদে অবতরণ করে।

জলে অবতরণের এক ঘণ্টার মধ্যে একটি হেলিকপ্টার অভিযাত্রীদের মহাকাশযান থেকে তুলে নিয়ে অল্প দূরে অপেক্ষমান একটি জাহাজে নিয়ে আসে। আর একটি জাহাজ গিয়ে ক্রেনের সাহায্যে মহাকাশযানটিকে জল থেকে তুলে নেয়।

মহাকাশের তিন কলম্বাস—বোরমান, লভেল এবং অ্যাণ্ডার্স, চাঁদের দেশে অভিযানের সফল পরিসমাপ্তির মধ্য দিয়ে যে সাহস, বীরত্ব এবং স্থৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অভিযানের সংগৃহীত তথ্য

অ্যাপোলো-৮ চন্দ্র অভিযানের মাধ্যমে চাঁদের রহস্যগুলোর যে কোন কিনারা হয়েছিল তা নয় এবং ঐ বিরাট, নিঃসঙ্গ, নিষিদ্ধ জগতটি সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান কোনদিক দিয়েই বাড়ে নি। অভিযাত্রীরা যা কিছু দেখেছেন এবং বর্ণনা দিয়েছেন, তাও নতুন কিছু নয়, সব আগেই জানা ছিল। এদিক দিয়ে

বিচার করতে গেলে এই অভিযানের খুব বড় একটা সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু অন্যদিক থেকে এই অভিযানের সার্থকতা ছিল অনেকগুলোই। চন্দ্রযাত্রী রকেট স্যাটার্ন-৫-এর মধ্যে ছিল প্রায় ১৫ লক্ষ সক্রিয় যন্ত্রাংশ এবং অ্যাপোলো মহাকাশযানের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ছিল প্রায় ৫০ লক্ষ যন্ত্রাংশ। অভিযানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে এই অগণিত যন্ত্রাংশের কর্মদক্ষতা (efficiency) কতটা হওয়া উচিত, তা হিসেব করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা প্রথমে ভেবেছিলেন, সেটা শতকরা মোটামুটি ৯৯.৯ ভাগের কাছাকাছি থাকলেই চলবে। পরে কম্পিউটার যন্ত্রের গণনায় ধরা পড়ল, এই সংখ্যাটাও নাকি যথেষ্ট নয়। আসলে, সেটা থাকা উচিত ছিল শতকরা ৯৯.৯৯৯ ভাগের কোঠায়।

অ্যাপোলোর চন্দ্র-অভিযানের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তির পরে দেখা গেল, মহাকাশযানের ঐ বিপুল পরিমাণ যন্ত্রাংশের মধ্যে মাত্র ৬টি বা ৭টি শেষ পর্যন্ত সঠিকভাবে কাজ করেনি এবং সেগুলোর ভূমিকাও খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ইলেকট্রনিক যন্ত্র-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ যে কতটা উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছতে পারে, তার একটি দৃষ্টান্ত আমরা অ্যাপোলো-৮ চন্দ্র অভিযানের মাধ্যমে লাভ করলাম। এই অভিযানের এটিই ছিল বড় সার্থকতা।

এছাড়া চাঁদের কাছাকাছি মহাকাশযানের পরিচালনা এবং পৃথিবীর সঙ্গে বেতারবার্তার যোগাযোগ-ব্যবস্থার সফল পরীক্ষাও ছিল এই অভিযানের আরো দুটি প্রধান সার্থকতা। চাঁদের কাছাকাছি পরিক্রমার সময় চাঁদের বিভিন্ন গঠনগুলোকে যে আলাদা করে চিনে নেওয়া সম্ভব সেটাও এই অভিযানের মাধ্যমেই প্রথম জানা গেল। ফলে ভবিষ্যতে চাঁদের কাছাকাছি মহাকাশযানকে পরিচালনা করে নিরাপদে চাঁদের মাটিতে অবতরণের একটি ধারণাও বিজ্ঞানীরা পেলেন।

এর পরে শুরু হল আর একটি নতুন ঘটনা। চাঁদের মাটিতে লুনার মডিউল নামে যে যানটিকে নিয়ে দু-জন অভিযাত্রী ভবিষ্যতে নামবেন, পৃথিবীর কাছাকাছি একটি কক্ষপথে সেই বস্তুটিকে নিয়েই কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন বিজ্ঞানীরা। সে কথাতে আমরা খানিক পরেই আসব।

১১

মহাকাশ অভিযানের কয়েকটি ঘটনা

অ্যাপোলো-৮-এর চন্দ্র-অভিযান পরিসমাপ্তির পর আরো নাটকীয় ঘটনার জন্যে পৃথিবীর মানুষ সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন। স্বভাবতই মানুষের লক্ষ্য এখন চাঁদের দিকে। আমেরিকার বিজ্ঞানীরা চাঁদে অভিযানের পরিকল্পনায় ব্যস্ত, ইতিমধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা মহাকাশে একটি চমকপ্রদ ঘটনাকে রূপ দিয়ে বসলেন।

দুটি মহাকাশযানের মিলন

১৯৬৯ সালের ১৪ই জানুয়ারি সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা সয়ুজ-৪ নামে একটি মহাকাশযানকে পৃথিবীর কক্ষপথে প্রতিষ্ঠা করলেন। সয়ুজের যাত্রী ছিলেন ভ্লাদিমার সাটালভ। যে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সয়ুজ-৪-কে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, পৃথিবী থেকে তার সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দূরত্ব ছিল যথাক্রমে ১৭১ ও ২২৪ কিলোমিটার।

পরের দিন ১৫ই জানুয়ারি সয়ুজ-৫ নামে আর একটি মহাকাশযান মহাকাশে পাড়ি জমাল। এবারে যাত্রী হয়ে এসেছেন তিনটি মানুষ—বরিস ভলিনভ, অ্যালেক্সি এলিসিয়েভ এবং ইয়েভগেনি খ্রুনভ। ১৬ই জানুয়ারি সকালবেলা দুটি মহাকাশযানের যাত্রীরা এক ঐতিহাসিক পরীক্ষা-কাজের নায়ক হয়ে দাঁড়ালেন। স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত হয়ে দুটি যান পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল। তারপর সয়ুজ-৪-এর যাত্রী সাটালভ তাঁর যানটিকে নিয়ন্ত্রণ করে সয়ুজ-৫-এর সঙ্গে ওকে যুক্ত করলেন।

এরপর সয়ুজ-৫-এর দুজন যাত্রী খ্রুনভ এবং এলিসিয়েভ মহাকাশ-পোশাক পরে মহাকাশের মধ্য দিয়ে হেঁটে সয়ুজ-৫ থেকে সয়ুজ-৬-এর মধ্যে এসে হাজির হলেন। সয়ুজ-৫-এ রইলেন একজন মাত্র যাত্রী—ভলিনভ। এই সর্বপ্রথম পৃথিবী-পরিক্রমাকালীন অবস্থায় একটি মহাকাশযান থেকে যাত্রীরা আর-একটি মহাকাশযানে পৌঁছনোর পরীক্ষায় সাফল্যমণ্ডিত হলেন।

পৃথিবীকে প্রতি ৮৮ মিনিটে একবার করে কয়েক চক্কর পরিক্রমার পর

দুটি মহাকাশযান পরস্পরের সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সয়ুজ-৪ তার যাত্রীদের নিয়ে ১৭ই জানুয়ারী পৃথিবীতে অবতরণ করে এবং সয়ুজ-৫ তার একক যাত্রীকে নিয়ে অবতরণ করে ১৮ই জানুয়ারি তারিখে।

চন্দ্র-অভিযানের চাঞ্চল্যকর ঘটনাবলীর মাঝে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা হঠাৎ দুটি মহাকাশযানের মিলন-জাতীয় একটি ঘটনাকে কেন রূপ দিতে গেলেন, তাই নিয়ে বিভিন্ন মহলে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেল। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা জানালেন, বর্তমানের এই অভিযানের পেছনে তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, পৃথিবীর কক্ষপথে স্থায়ীভাবে মহাকাশ স্টেশন তৈরির পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো নিয়ে কাজ করা, যে জাতীয় স্টেশনে বসে ভবিষ্যতে তাঁরা সুষ্ঠুভাবে পৃথিবী গবেষণার বিভিন্ন বিষয়ে কাজ-কর্ম চালিয়ে যেতে পারবেন। মহাকাশ স্টেশনে দীর্ঘকাল কর্মরত মহাকাশযাত্রীকে পৃথিবীতে স্থানান্তরিত করা এবং পৃথিবী পরিক্রমাকালীন অবস্থায় কোন মহাকাশযান বিপন্ন হয়ে পড়লে তাকে রক্ষা করার প্রথম বাস্তব ভিত্তিও এই পরীক্ষার মাধ্যমে তৈরি হল।

পশ্চিম দেশের বিশেষজ্ঞেরা কিন্তু বললেন, কিছুদিন আগে জোন্‌দ্‌-শ্রেণীর যে দুটি সোভিয়েট মহাকাশযান চাঁদকে পরিক্রমা করে ফিরে এসেছে, তাদের গঠন-প্রকৃতির সঙ্গে সয়ুজ মহাকাশযানগুলোর অনেক মিল দেখা যাচ্ছে। কাজেই চাঁদে অভিযান চালানোর ব্যাপারটাও সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের মাথায় যথেষ্ট পরিমাণেই রয়েছে। তাঁরা শুধু হাটে হাঁড়ি ভাঙতে চাইছেন না আর কি!

সয়ুজ অভিযানের পেছনে রহস্যের জাল যতই ঘনিয়ে উঠুক না কেন, এই ঘটনাটির বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব যে যথেষ্ট ছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

অ্যাপোলো-৯

লুনার মডিউল নামে যে চন্দ্রযানটিতে বিজ্ঞানীরা দুটি মানুষকে চাঁদের জমিতে নামিয়েছিলেন, তার প্রাথমিক পরীক্ষা করা হয়েছিল অ্যাপোলো-৯ মহাকাশ অভিযানে। অভিযানটি শুরু হয়েছিল ১৯৬৯ সালের ৩রা মার্চ। এই অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, লুনার মডিউল (লুনার মডিউলের বিস্তৃত পরিচয় নিয়ে আমরা অ্যাপোলো-১১ প্রসঙ্গে আলোচনা করব) বস্তুটি চাঁদ পর্যন্ত পৌঁছতে এবং সেখানে অবতরণ করতে পারবে কি না, সে ব্যাপারটা পরীক্ষা করা।

অভিযান শুরুর দুদিন বাদে, ৫ই মার্চ অ্যাপোলোর তিনজন অভিযাত্রীর মধ্যে দুজন, ম্যাকডেভিট এবং শ্বেসোয়াইকার্ট তাঁদের মহাকাশযান অ্যাপোলো থেকে একটি সুড়ঙ্গের মত পথের মধ্য দিয়ে কমাণ্ড মডিউলের সঙ্গে যুক্ত চন্দ্রযান লুনায়

মডিউলে এসে প্রবেশ করলেন। এরপর চন্দ্রযানের নিচেকার অংশের এঞ্জিনটিকে চালু করে তার কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হল।

পৃথিবীকে পরিক্রমাকালীন অবস্থায় শ্‌সোয়াইকার্ট ৩৭ মিনিটের মত সময় মহাকাশে হাঁটলেন। চন্দ্রযানের অন্যান্য পরীক্ষার কাজ চলার পর চন্দ্রযানটিকে এককভাবে পরিচালনা করে দেখার জন্যে ৭ই মার্চ ম্যাকডেভিট ও শ্‌সোয়াইকার্ট মূল মহাকাশযান থেকে ওকে বিচ্ছিন্ন করে নিলেন। এরপর পুরো ৬ ঘণ্টা ধরে দুটি যান পরস্পরের কাছ থেকে বিভিন্ন দূরত্বে, কখনো ১৬০ কিলোমিটারের মত দূরে থেকে পৃথিবীকে পরিক্রমা করে চলল।

দুটি যানকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করা হল। বোঝা গেল, চন্দ্রযান লুনার মডিউল চাঁদে অভিযানের জন্যে তৈরি। চন্দ্রযানের পরীক্ষা-কাজ শেষ করার পর অ্যাপোলোর অভিযাত্রীরা নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

অ্যাপোলো-১০

চন্দ্রযান সমেত মহাকাশযান অ্যাপোলোকে চাঁদের কাছাকাছি হাজির করে চন্দ্রযানের পরীক্ষার কাজটা সেরে ফেলতে পারলেই চাঁদে মানুষকে নামানোর পথে আর কোন বাধা থাকে না। সে কাজটা করা হল অ্যাপোলো-১০ অভিযানের মাধ্যমে। এই অভিযান শুরু হয়েছিল ১৯৬৯ সালের ১৮ই মে তারিখে। অভিযাত্রীরূপে যে তিনজন গিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন টমাস স্ট্যাফোর্ড, ইউজিন সার্নান এবং জন ইয়ং।

অ্যাপোলোর বাহক-রকেট স্যাটার্ন-৫ সঠিকভাবে মহাকাশযানকে মহাকাশে পেঁছে দেয়। তিন ঘণ্টা পৃথিবীকে পরিক্রমার পর অ্যাপোলো-১০-এর যাত্রা শুরু হল চাঁদের দিকে। যাত্রাকালীন অবস্থায় অ্যাপোলোর কমাণ্ড ও সার্ভিস মডিউলরূপী অংশটিকে স্যাটার্ন রকেটের তৃতীয় পর্যায়ের খোল থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে অ্যাপোলোর যাত্রীরা চন্দ্রযান লুনার মডিউলের পেছন দিকে তাকে যুক্ত করেন।

২৬শে মে চাঁদের কাছাকাছি পেঁছে অ্যাপোলোর মূল রকেটকে চালু করে শেষ পর্যন্ত এক বৃত্তাকার কক্ষপথে অ্যাপোলোর যাত্রীরা চাঁদকে পরিক্রমা করে চলেন। চাঁদের প্রকৃতি আবার খুব কাছে থেকে মানুষের কাছে ধরা দিয়ে বসে। পরের দিন ২২শে মে শুরু হল লুনার মডিউলের চূড়ান্ত পরীক্ষা। ভারতীয় সময় রাত ৯টা বেজে ১০ মিনিটের সময় স্ট্যাফোর্ড ও সার্নান এক সুড়ঙ্গপথে চন্দ্রযানের মধ্যে এসে প্রবেশ করেন। ইয়ং রইলেন কমাণ্ড মডিউলের মধ্যে।

বর্তমান চন্দ্র-অভিযানের সবচেয়ে চমকপ্রদ ও বিপদজনক অধ্যায়টি এবারে শুরু হতে চলেছে। দুটি যানকে পরস্পরের কাছ থেকে আলাদা করার জন্যে অভিযাত্রীরা যখন তৈরি হচ্ছিলেন তখন একটি গুরুতর ত্রুটি দেখা দিল। আলাদা হবার আগে দুটি যানের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী সুড়ঙ্গপথকে সম্পূর্ণভাবে বায়ুশূন্য করতে হবে। কিন্তু প্রথম চেষ্টায় তা করা গেল না। ফলে দুটি যান পরস্পরের সঠিক অবস্থান থেকে কিছুটা বিচ্যুত হয়ে পড়ল। পৃথিবী থেকে অভিযাত্রীদের জানানো হল, সমস্যা যদি আরো জটিল হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে দুটি যানকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনাকেই বাতিল করতে হবে।

পৃথিবীতে চরম উৎকণ্ঠা। অ্যাপোলো রয়েছে চাঁদের উল্টো পিঠে। বিচ্ছিন্ন হবার পরীক্ষা সেখানেই শুরু করতে হবে। চাঁদের আড়াল থেকে অ্যাপোলো যখন বেরিয়ে এল, বিজ্ঞানীরা নিশ্চিন্ত মনে হাঁফ ছাড়লেন। চন্দ্রযান লুনার মডিউল অ্যাপোলো মহাকাশযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘণ্টায় ৫৬০০ কিলোমিটার বেগে এমন এক উপবৃত্তাকার কক্ষপথে চাঁদের দিকে নেমে চলেছে, যাতে শেষ পর্যন্ত চন্দ্রযান চাঁদের জমির মাত্র ১৫½ কিলোমিটারের মধ্যে এসে পৌঁছবে। এত কাছে থেকে চাঁদের জমিকে পর্যবেক্ষণের সুযোগ মানুষ এর আগে কখনো পায় নি।

চাঁদের জমির সবচেয়ে কাছের যে জায়গাটির ওপর অভিযাত্রীরা এসে পৌঁছলেন, সেটি হল চাঁদের Sea of Tranquility বা 'প্রশান্তি সাগর' নামে একটি মেরিয়ার অংশ। আগামী চন্দ্র-অভিযানে যে দুটি জায়গা চাঁদের জমিতে অবতরণের জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে আছে, ওটি হল তারই একটি। অভিযাত্রীরা তাদের ক্যামেরার সাহায্যে জায়গাটির অজস্র ছবি নেন। অঞ্চলটির দিকে তাকিয়ে সেটাকে ভিজে মাটির মত সমতল মনে হচ্ছিল তাঁদের।

বার দুয়েক চাঁদকে পরিক্রমার পর লুনার মডিউলের যাত্রীরা তাঁদের যানের তলাকার অংশটিকে (descent stage) বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে চাঁদের জমির দিকে তাকে ঠেলে দেন এবং ওপরের অংশটিকে (ascent stage) পরিচালিত করে অ্যাপোলো মহাকাশযানের কক্ষপথে এসে পৌঁছন। এরপর দুটি মহাকাশযানের মধ্যে সংযোগ সাধন করেন অভিযাত্রীরা।

চাঁদের জমির খুব অল্প দূরত্বে চাঁদকে পরিক্রমার সময় যেমন চন্দ্রযানের চাঁদের জমিতে আছড়ে পড়ার বিপদ ছিল, তেমনি অ্যাপোলোর কক্ষপথে পৌঁছে তার সঙ্গে চন্দ্রযানের সংযোগ সাধনের ব্যাপারটিও কম জটিল ছিল না। চন্দ্রযানের ওপরের অংশের রকেটগুলো যদি সঠিকভাবে কাজ না করত, তাহলে চন্দ্রযানের যাত্রীরা চাঁদের চারপাশে এক নতুন কক্ষপথে বন্দী হয়ে পড়তেন।

মূল মহাকাশযান অ্যাপোলোকে কাছাকাছি নামিয়ে এনে তাঁদের উদ্ধার করার কোন উপায়ই ছিল না।

মূল মহাকাশযানের সঙ্গে যুক্ত হবার পর চন্দ্রযানের যাত্রী স্ট্যাফোর্ড ও সার্নান সুড়ঙ্গপথে অ্যাপোলোর অভ্যন্তরে এসে সঙ্গী ইয়ং-এর সঙ্গে মিলিত হন। এরপর চন্দ্রযানের ওপরকার অংশটিকে বিচ্ছিন্ন করে অভিযাত্রীরা সেটিকে ছেড়ে দেন চাঁদের কক্ষপথে।

৬০ ঘণ্টায় মোট ৩০ বার চাঁদকে পরিক্রমার পর অ্যাপোলোর যাত্রা শুরু হয় পৃথিবীর দিকে। ২৬শে মে তারিখে এই ঐতিহাসিক অভিযান সমাপ্তি লাভ করে।

অ্যাপোলো-১০ চন্দ্র-অভিযানের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি চাঁদে মানুষের অবতরণের পথকে দিল উন্মুক্ত করে। পরবর্তী অভিযান অ্যাপোলো-১১ সেই ঘটনাকে বাস্তবে রূপায়িত করে তুলবে। তার প্রস্তুতির কাজ এগিয়ে চলে দ্রুতগতিতে।

১২

অ্যাপোলো-১১ : চাঁদে মানুষের পদচিহ্ন

বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনার দিন এগিয়ে এল। পৃথিবীর মানুষ যেদিন তার পৃথিবীর বাইরে সৌরজগতের আর একটি সদস্য পৃথিবীরই চাঁদের মাটিতে তার পদচিহ্নকে এঁকে দেবে—সেই দিনটির কথাই বলছি।

যে মহাকাশ-অভিযান এই ঘটনাকে রূপ দেবে, তার সমগ্র প্রাথমিক কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। আমেরিকার কেপ কেনেডি মহাকাশ বন্দর থেকে যাত্রা শুরুর জন্য অপেক্ষা করছে আর একটি নতুন স্যাটার্ন রকেট। রকেটের মাথায় বসানো মহাকাশযান অ্যাপোলো-১১ ; চন্দ্রযান লুনার মডিউলটিও রয়েছে এরই অংশরূপে। অ্যাপোলোর তিন অভিযাত্রী—নীল আর্মস্ট্রং, এডউইন অলড্রিন এবং মাইক কলিন্স অ্যাপোলোর যাত্রীরূপে চলেছেন চাঁদের দিকে। এঁদেরই দুজন, আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন চাঁদের মাটিতে নেমে ইতিহাস সৃষ্টি করবেন।

বাহক স্যাটার্ন ও মহাকাশযান

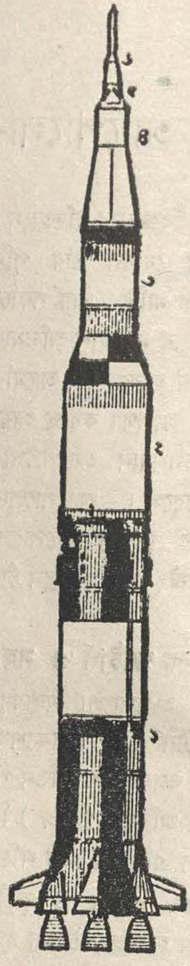
অ্যাপোলো মহাকাশযানকে চাঁদের দেশে বয়ে নিয়ে যাবে বাহক রকেট স্যাটার্ন-৫। মহাকাশযান সমেত ১০৯ মিটার (৩৬৩ ফুট) উঁচু, ৩১০০ টন ওজন-বিশিষ্ট তিন-পর্যায়ের রকেট স্যাটার্ন-৫ সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই (অ্যাপোলো-৮ চন্দ্র-অভিযান-প্রসঙ্গে) কিছু আলোচনা করা হয়েছে। ৯২০০০ দশাসই চেহারার রেল এঞ্জিনের মোট শক্তির অধিকারী হল স্যাটার্ন রকেট। স্যাটার্ন রকেটের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের (১০৮ পৃষ্ঠার ছবিতে ১, ২, ৩ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে) উচ্চতা হল যথাক্রমে ৪১ ৫, ২৫ ও ১৭ মিটার। তিন স্তর বিশিষ্ট রকেটের মাথায় চাপানো মহাকাশযান অ্যাপোলো (ছবিতে ৪)।

বিভিন্ন অংশসমেত মহাকাশযান অ্যাপোলোর মোট উচ্চতা হল ২৫ মিটার। ছবির মাঝামাঝি ৫ ও ৬ দ্বারা চিহ্নিত করে অ্যাপোলোর যে দুটি অংশকে দেখানো হয়েছে, তারা হল যথাক্রমে তাপ-প্রতিরোধক আবরণী (boost protective cover) এবং ক্ষেপণকালীন নিষ্ক্রমণ মঞ্চ (launch escape tower)।

মহাকাশযানের যে অংশে অভিযাত্রীরা থাকেন, তাপ-প্রতিরোধক আবরণীটি তাকে শক্তভাবে ঘিরে রাখে।

রকেট যখন ধীরে ধীরে বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে তার প্রয়োজনীয় বেগ অর্জন করছে,তখন বায়ুর সঙ্গে ঘর্ষণে যে তাপ সৃষ্টি হয়, তাপ-প্রতিরোধক আবরণীটি তা ধারণ করে রাখে। যাত্রা শুরুর ঠিক তিন মিনিট বাদে ঐ আবরণীটিকে নিচে ফেলে দেওয়া হয়, কেননা ততক্ষণে রকেট বায়ুমণ্ডলের ঘন স্তরগুলো পেরিয়ে এসেছে। আবরণীটির তাপমাত্রা ১২০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে, তাই এটি ফাইবার গ্লাস এবং কর্ক-জাতীয় সবচেয়ে ভাল তাপ-প্রতিরোধক উপাদানের দ্বারা তৈরি হয়ে থাকে।

বাহক রকেটকে ক্ষেপণ করার পর যদি কোন কারণে বিস্ফোরণ বা অন্য দুর্ঘটনার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাহলে ক্ষেপণকালীন পর্বে নিষ্ক্রমণ-মঞ্চের কাজ হল অভিযাত্রীদের মহাকাশ কক্ষটিকে দ্রুতগতিতে সরিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ নিরাপদ জায়গায় ওকে স্থানান্তরিত করা।

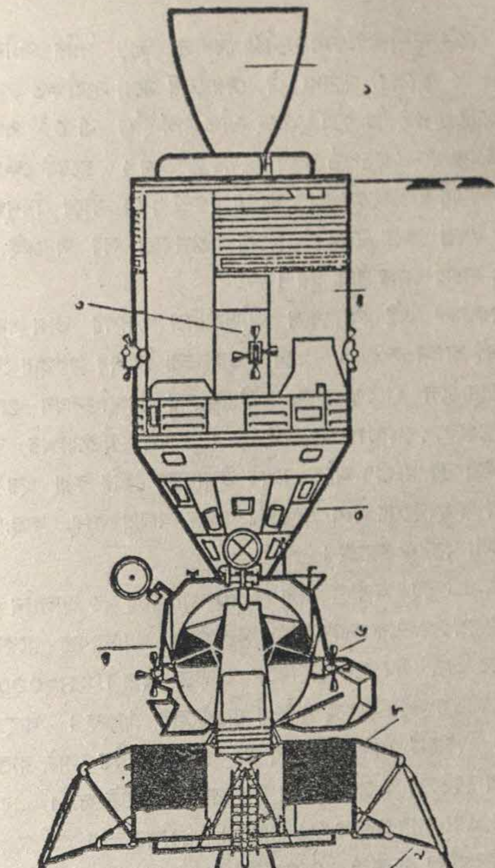


৭ নং চিত্র : তিন-পর্যায়ের রকেট স্যাটার্ন-৫ ; মাথায় চাপানো অ্যাপোলো মহাকাশযান।

অ্যাপোলো

১০৯ পৃষ্ঠার ছবিতে অ্যাপোলো মহাকাশযানের প্রধান অংশগুলোকে দেখানো হয়েছে। ১ হল অ্যাপোলোর সার্ভিস মডিউল অংশের রকেট এঞ্জিনের গ্যাসের নিষ্ক্রমণ-পথ। ২ হল বেতার-প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্রের অ্যান্টেনা বা এরিয়াল। ৩ হল অবস্থা-নিয়ন্ত্রক মোটর ব্যবস্থা বা attitude control thrusters ; এদের সাহায্যে সমগ্র মহাকাশযানটি এবং চন্দ্রযানকে ওদের অক্ষের চারপাশে ঘোরানো যায়। ৪ ও ৫ হল যথাক্রমে অ্যাপোলোর সার্ভিস মডিউল ও কমাণ্ড মডিউল অংশ। ৭ ও ৮ হল চন্দ্রযান লুনার মডিউলের ওপরের অংশ এবং নিচের অংশ বা দোতলা ও একতলা। ৯ হল

চন্দ্রযানের চাঁদের মাটিতে নামার গিয়ার ব্যবস্থা। ১০ হল চন্দ্রযানের সিঁড়ি, যে সিঁড়ি বেয়ে পৃথিবীর প্রথম মানুষ এসে চাঁদের জমিতে দাঁড়াবেন।



অ্যাপোলো-১১ মহাকাশযানের বিভিন্ন অংশ

অ্যাপোলোর কমাণ্ড মডিউল অংশটি হল অভিযাত্রীদের আবাস-গৃহ। চন্দ্র-অভিযানের বেশির ভাগ সময় তাঁরা এই কক্ষটিতেই থাকবেন। অ্যাপোলোর এই একটিমাত্র অংশই পৃথিবীতে ফিরে আসবে। এর চেহারাটা হল কোণাকৃতি। উচ্চতা ৩·৩৬ মিটার এবং তলাকার ব্যাস হল ৩·৮৫ মিটার। কমাণ্ড মডিউলের

ভেতরের জায়গার পরিমাণটা হল একটি বড় জীপগাড়ির মত। তিনজন অভিযাত্রীর প্রত্যেকের জন্যেই রয়েছে প্রায় ২০৭০ কিউবিক সেন্টিমিটারের মত জায়গা।

কম্যাণ্ড মডিউলরূপী মহাকাশকক্ষটির দেয়াল জুড়ে সারি সারি যন্ত্রপাতি। খাবার দাবার ও জলের জন্যেও ঐ দেয়ালের মধ্যে সংরক্ষিত জায়গা রয়েছে। ঘরের মধ্যে বায়ুর চাপ তৈরি করা হয়েছে প্রতি বর্গ-ইঞ্চি বা ৩$\frac{১}{২}$ বর্গ-সেন্টিমিটার ক্ষেত্রে ৫ পাউণ্ডের মত—সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুর চাপের $\frac{১}{৩}$ ভাগ। রকেট ক্ষেপণের সময় অভিযাত্রীরা সাধারণ বাতাসকেই গ্রহণ করেন, কিন্তু ধীরে ধীরে বিশুদ্ধ অক্সিজেন সে জায়গা দখল করে নেয়। ঘরের তাপমাত্রা সব সময়েই ৭৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটের মাত্রায় বজায় রাখা হয়।

মহাকাশকক্ষের এই পরিবেশে অভিযাত্রীরা বেশির ভাগ সময় মহাকাশ-পোশাক ছাড়াই যাপন করেন। তবে কতকগুলো বিশেষ অবস্থায় যেমন রকেট উৎক্ষেপণ, বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করা, দুটি যানের সংযুক্তিসাধন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অভিযাত্রীদের মহাকাশ-পোশাক পরতেই হয়। তাপ প্রতিরোধের জন্যে কমাণ্ড মডিউলের বাইরেকার আবরণ অতি বিশেষ উপাদানে তৈরি করা হয়। পৃথিবী, চাঁদ ও আকাশ পর্যবেক্ষণের জন্যে কক্ষটির বাইরে আবার পুরু, স্বচ্ছ, আবরণযুক্ত কয়েকটি জানলা বসানো রয়েছে।

কমাণ্ড মডিউলের আধারে মাত্র ২৭০ পাউণ্ডের মত জ্বালানি রয়েছে, যার কাজ হল মহাকাশকক্ষটিকে চরকিবাজির মত পাক খাওয়াবার রকেট-ব্যবস্থাকে চালু রাখা, যাতে তাপটা সমভাবে চারদিকে ছড়িয়ে যায়। ৪২০০০ পাউণ্ডের মত জ্বালানির আসল সঞ্চয় রয়েছে সার্ভিস মডিউলের ট্যাঙ্কে। বাহক স্যাটার্ন রকেটের শেষ পর্যায়টি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পর চাঁদ পর্যন্ত গোটা রাস্তা জুড়ে ওর বেগ ও দিক পরিবর্তনের কাজের দায়িত্ব হল সার্ভিস মডিউলের। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৭ মিটারের মত এবং ব্যাস হল ৩.৮৫ মিটার। বেশির ভাগ অক্সিজেন, জলের সঞ্চয় এবং বিদ্যুৎশক্তির ব্যবস্থাও এই অংশটির মধ্যেই থাকে।

চন্দ্রযান লুনার মডিউলকে একটি সত্যিকার মহাকাশযান বলা যেতে পারে, কেননা বায়ুমণ্ডলে পরিচালনা বা প্রবেশের কোন ব্যবস্থাই এর মধ্যে নেই। তাই পৃথিবী থেকে রকেটের ঘাড়ে চড়ে বেরোনোর সময় একটি অ্যালুমিনিয়ামের আবরণী দিয়ে এটি ঢাকা থাকে।

এই দ্বিতল মহাকাশযানটির উচ্চতা হল ৬.৯ মিটার এবং ব্যাস ৬.৩ মিটার। এর ওজন হল ৩২০০০ পাউণ্ডের মত, যার $\frac{২}{৩}$ ভাগটাই হল জ্বালানি। চন্দ্রযানের ওপরের অংশে দুজন অভিযাত্রীর থাকার জন্যে যে পরিমাণ স্থানের ব্যবস্থা রয়েছে,

তার পরিমাণ হল ৪½ ঘন মিটার—খুব প্রশস্ত জায়গা মোটেই নয়। বাইরে ৭½ সেন্টিমিটার পুরু তাপ-প্রতিরোধক আবরণী, ভেতরে বিশুদ্ধ অক্সিজেনের পরিমণ্ডল এবং সুষম তাপের পরিবেশ। মহাকাশ বা চাঁদের ওপরকার তাপ ও ঠাণ্ডার প্রচণ্ড তারতম্য চন্দ্রযানের ভেতরে কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারবে না—এভাবেই ওকে তৈরি করা হয়েছে।

সমগ্র অ্যাপোলো মহাকাশযানের মধ্যে ছিল ৫০ লক্ষেরও বেশি যন্ত্রাংশ এবং বাহক স্যাটার্ন রকেটে ছিল ১৫ লক্ষের মত যন্ত্রাংশ। এরা সবাই কাজ করেছে নির্ভুলভাবে। প্রতিটি যন্ত্রাংশের মধ্যে ছিল একটি যুগ্ম ব্যবস্থা, অর্থাৎ সেটি অচল হলে সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপ আর-একটি যন্ত্রাংশ তার জায়গায় কাজ করতে আরম্ভ করবে।

পৃথিবী ছাড়িয়ে

১৯৬৯ সালের ২১শে জুলাই ভারতীয় সময় সন্ধ্যে ৭টা বেজে ২ মিনিটে মহাকাশযান অ্যাপোলোর তিনজন যাত্রীকে নিয়ে বাহক-রকেট স্যাটার্নের যাত্রা হল শুরু। এঞ্জিন চালু হবার পরেও ৮·৯ সেকেণ্ড ধরে অ্যাপোলো মাটির বন্ধনে বাঁধা থাকে। একটি কম্পিউটার যন্ত্রের কাছ থেকে যখন নির্দেশ এল যে স্যাটার্ন রকেটের প্রথম পর্যায়ের পাঁচটি এঞ্জিন প্রায় ৭৭ লক্ষ পাউণ্ডের মত ধাক্কা তৈরি করতে পেরেছে, একমাত্র তখনই ৪০,০০০ পাউণ্ডের ইস্পাতের তৈরি চারটি বিরাট বাহু সরে গিয়ে ফুঁসতে থাকা দৈত্যের মত চেহারার রকেটটাকে দিল মুক্তি।

প্রতি সেকেণ্ডে ১৫ টনের মত জ্বালানিকে পুড়িয়ে খাক করতে করতে স্যাটার্ন আকাশপথে পাড়ি জমাল। তিন পর্যায়ের রকেটের সাহায্যে অ্যাপোলোর বেগ বেড়ে ঘণ্টায় প্রায় ২৮,০০০ কিলোমিটারে এসে দাঁড়ায় এবং পৃথিবী থেকে ১৬০ কিলোমিটার দূরে এক বৃত্তাকার কক্ষপথে অ্যাপোলোর পৃথিবী পরিক্রমার পালা শুরু হয়। রকেট ক্ষেপণের পর এ পর্যন্ত ঘটনা ঘটতে সময় লেগেছিল ১২ মিনিটের মত।

যাত্রা শুরুর প্রায় আড়াই ঘণ্টা বাদে, পৃথিবীকে দেড় চক্কর পাক খাবার পর, রকেটের তৃতীয় পর্যায়ের এঞ্জিনটি আবার সচল হয়ে ওঠে। ৫ মিনিট ২৯ সেকেণ্ড সময় চালু থেকে এ অ্যাপোলোর বেগ পৌঁছে দেয় ৩৯,২০০ কিলোমিটারে। এ হল 'নিষ্ক্রমণ বেগ'—পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলের টানের বিরুদ্ধে ছুটে চাঁদ বা অন্য গ্রহের দিকে পাড়ি জমাবার বেগ।

অভিযাত্রীরা তাঁদের মহাকাশ অভিযানের বেশির ভাগ সময় জুড়েই সম্পূর্ণ ওজনবিহীন অবস্থার মধ্যে কাটিয়েছেন। (ওজনবিহীন অবস্থা সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।) ওজনবিহীন অবস্থায় সাধারণভাবে খাদ্য-গ্রহণ করার যথেষ্ট অসুবিধা ছিল। অভিযাত্রীদের বিভিন্ন সময়ে আহারের জন্যে খাবারের সামগ্রী ছিল প্রায় ৭০ থেকে ৭৫ রকমের। এই খাবার জিনিসগুলো থেকে জলীয় পদার্থ সম্পূর্ণরূপে বার করে নিয়ে সেগুলোকে বিভিন্ন প্যাকেটের মধ্যে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছিল। প্যাকেটগুলো ছিল অনেকটা টুথপেস্টের মত।

আহারের আগে, সেদিনের জন্যে যে অভিযাত্রী পাচকের কাজ করছেন তিনি খাবারের প্যাকেটগুলোর মধ্যে জল ঢুকিয়ে নিয়ে মিনিট-তিনেক ধরে সেগুলোকে ভাল করে নাড়বেন। ফলে খাবারগুলো খানিকটা ফুলে ফেঁপে উঠবে। এরপর খাবারের প্যাকেটের মাথাগুলো কেটে নিয়ে সোজা মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে টিপে টিপে অভিযাত্রীরা খাদ্য গ্রহণ করবেন।

খাবার পর অভিযাত্রীরা খালি খাবারের প্যাকেটগুলোর মধ্যে বীজাণুনাশক ওষুধ রেখে দিতেন, যাতে খাবারের টুকরোগুলো পচে গিয়ে গ্যাস তৈরি না হয়ে বসে। প্যাকেটগুলোকে এরপর গুটিয়ে নিয়ে অপ্রয়োজনীয় জিনিষ রাখবার ছোটখাট একটা গুদামঘরের মধ্যে রেখে দেওয়া হত।

দাঁতমুখ পরিষ্কার রাখার জন্যে অভিযাত্রীদের সাধারণভাবে জল ব্যবহার করার কোন উপায় ছিল না। এ কাজটা তারা করেছেন চুয়িং গাম এবং এমন টুথপেস্টের সাহায্যে যা খেয়ে ফেলা যায়।

পান করার জন্যে এবং খাবারের সঙ্গে মেশানোর জন্যে জলের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত পরিমাণেই ছিল। ব্যবহারের জন্যে কিছুটা জল পাওয়া যেত সার্ভিস মডিউলের কাছ থেকে। সেখানে 'জ্বালানি সেলের' (fuel cell) হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটিয়ে একই সঙ্গে বিদ্যুৎশক্তি এবং জল পাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

মহাকাশযানে শরীরকে পরিচ্ছন্ন রাখাও ছিল এক সমস্যার ব্যাপার। অভিযাত্রীরা ভিজে তোয়ালের সাহায্যে এ কাজটা করতেন। ক্ষৌরকর্মের ব্যাপারটা তাঁরা বেশ রপ্ত করে নিয়েছিলেন। বৈদ্যুতিক ক্ষুরের সঙ্গে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার লাগিয়ে তাঁরা এই কাজটা সারতেন। নাহলে চুলগুলো ওজনবিহীন অবস্থায় ঘরময় ঘুরে বেড়াত।

মহাকাশযানের মধ্যে ওজনবিহীন অবস্থায় মলত্যাগ করাটা কোন কঠিন

কাজ ছিল না। মলগুলোকে বীজাণুনাশক ঔষধপূর্ণ প্লাস্টিকের ছোট ছোট থলির মধ্যে পুরে আলাদা কোন জায়গায় রেখে দেওয়া হত। অভিযানের সমাপ্তির পর সেগুলোকে জীববিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখবেন। মূত্রপূর্ণ থলিগুলোকে কমাণ্ড মডিউলের ভাল্‌ভ্‌রূপী ছিদ্রপথের মধ্য দিয়ে বাইরে ফেলে দেওয়া হত। ইতিপূর্বে কিছু কিছু মহাকাশ অভিযানের অভিযাত্রীরা সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময়টাকে এই কাজটা করার জন্যে বেছে নিয়েছিলেন। মূত্রের জলকণাগুলো সূর্যের আলোয় যে ফুলঝুরি সৃষ্টি করত, সেগুলো দেখতে তাঁদের খুব ভাল লাগত। যোগাযোগ কেন্দ্রের বিজ্ঞানীদের কাছে তাই এটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার বলে মনে হয়ে ছিল যে কিভাবে অভিযাত্রীরা ঠিক ৯০ মিনিট বাদে বাদে মূত্র ত্যাগ করছেন। পৃথিবীকে একচক্কর ঘুরে আসাতে মহাকাশযানের ঠিক ৯০ মিনিট সময় লাগছিল বলে একটি সূর্যোদয় থেকে আর একটি সূর্যাস্তের সময়ের ব্যবধানও ছিল ৯০ মিনিট।

চাঁদের কাছে

তিনদিন ধরে অ্যাপোলোর অভিযাত্রীরা চাঁদের দিকে এগিয়ে চলতে থাকেন। ৭৬ ঘণ্টা বাদে ৩,৭৯,২০০ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে ২০শে জুলাই প্রায় চাঁদের কাছাকাছি যখন তাঁরা এসে পেঁছিলেন, তখন অ্যাপোলোর বেগ ঘণ্টায় মাত্র ৩৩৩০ কিলোমিটারে এসে দাঁড়িয়েছে। চাঁদের অভিকর্ষের টানে অ্যাপোলোর বেগ আবার বেড়ে চলে। কিন্তু অ্যাপোলোর অভিযাত্রীরা তাঁদের মূল রকেটকে এমনভাবে চালু করেন যাতে উল্টোদিকে সামান্য পরিমাণে একটা ছুট তৈরি করে চাঁদের অভিকর্ষের টানটাকে কাটানো যায়। এভাবে অ্যাপোলোর বেগ আরো খানিকটা কমে আসে এবং প্রথমে উপবৃত্তাকার এবং পরে এক প্রায়-বৃত্তাকার কক্ষপথে অভিযাত্রীরা চাঁদকে পরিক্রমা করে চলেন।

চাঁদের চারপাশে অ্যাপোলোর কক্ষপথ নির্ধারণের সময় বিজ্ঞানীদের অ্যাপোলো-১০ অভিযানের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হয়েছিল। চাঁদের নিচে নাকি ম্যাসকন নামে ঘনসন্নিবদ্ধ লোহা-নিকেল জাতীয় বস্তুর সমাবেশের জন্যে অ্যাপোলো-১০-এর কক্ষপথে কিছুটা বিচ্যুতি ঘটেছিল ; এই তথ্যের ভিত্তিতে অ্যাপোলো-১১-র কক্ষপথকে কিছুটা সংশোধন করেছিলেন বিজ্ঞানীরা। তা না হলে ম্যাসকনদের জন্যে চাঁদের অভিকর্ষের টান এক এক জায়গায় হয়ত এতটাই বেড়ে উঠত যে, চাঁদের দিকে নেমে আসার সময় সেই টানে একটি চন্দ্রযানের হঠাৎ চাঁদের জমির ওপর আছড়ে পড়ার সম্ভাবনাও ছিল।

চাঁদে নামার পালা

চাঁদকে বেশ কয়েকবার পরিক্রমার পর অ্যাপোলোর দুজন অভিযাত্রী আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন চাঁদে নামার প্রস্তুতির কাজ শুরু করেন। তাঁরা অ্যাপোলোর কমাণ্ড মডিউল থেকে এক সুড়ঙ্গপথে চন্দ্রযান লুনার মডিউলে এসে প্রবেশ করেন। তারপর লুনার মডিউলের ওপরের অংশের রকেটকে চালু করে মূল মহাকাশযান থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে নেন এবং ধনুকের ছিলের মতো এক মস্ত লম্বা বাঁকা পথে চাঁদের দিকে নেমে আসতে শুরু করেন। চাঁদের উল্টো পিঠে থাকার সময়েই অভিযাত্রীদের চন্দ্রযানের রকেটকে চালু করতে হয়েছিল যাতে তাঁরা পূর্বদিকে চাঁদের বিষুবরেখার ঠিক ওপরে 'প্রশান্ত সাগরে' অবতরণের নির্দিষ্ট জায়গাটির কাছাকাছি পেঁছিতে পারেন।

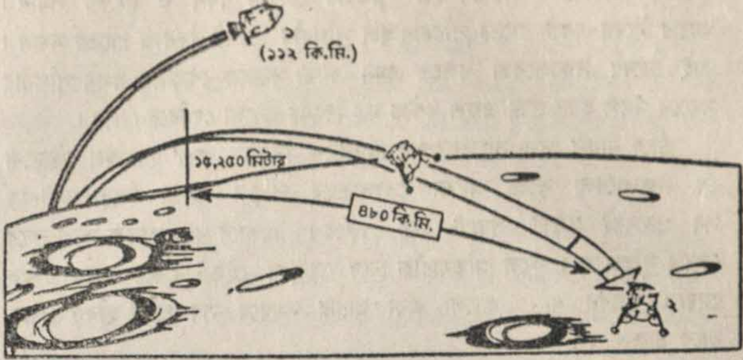
এখানেও কয়েকটি উৎকণ্ঠার মুহূর্ত দেখা দিয়েছিল। চাঁদের আড়াল থেকে অ্যাপোলো ৩৫ মিনিট বাদে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত পৃথিবী থেকে জানার কোন উপায়ই ছিল না, চন্দ্রযান আদৌ চাঁদে নামার ব্যবস্থাকে কার্যকরী করতে পেরেছে কি না। অ্যাপোলোর যাত্রী কলিন্স ছিলেন এই ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী। চন্দ্রযান থেকে তাঁর দূরত্ব তখনো খুব বেশি নয়।

চন্দ্রযানের রকেটগুলোর কাজ হল চাঁদের অভিকর্ষের উল্টোদিকে একটা ছুট তৈরি করে সেই টানের জোরটাকে কমানো। এ যেন একটা দড়ির লড়াইয়ের খেলা চলেছে—চাঁদের দিকে যে দড়ির টানের জোরটা ছিল বেশি।

চাঁদে নামার ব্যবস্থাটাকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। চন্দ্রযানের রকেটগুলো প্রথমে ২৯·৮ সেকেণ্ডের মত কাজ করে তার বেগ ঘণ্টায় ৭৩৬০ কিলোমিটারে নামিয়ে আনল।

চন্দ্রযান যখন চাঁদের জমির ১৫২৫০ মিটার ওপরে রয়েছে এবং নামার জায়গা থেকে রয়েছে প্রায় ২৯ কিলোমিটার দূরে, তখন ১১ মিনিট ৫৮ সেকেণ্ডের জন্যে আর একদফা রকেটগুলোকে চালু করে চন্দ্রযানকে ঘুরিয়ে অভিযাত্রীদের তাঁদের পায়ের ওপর দাঁড় করানো হল। অর্থাৎ, এতক্ষণ অভিযাত্রীদের পিঠের দিকটা ছিল চাঁদের দিকে, এবারে তাঁরা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলেন। আর্মস্ট্রং এবারে চন্দ্রযানের র‍্যাডার যন্ত্রকে চালু করলেন।

র‍্যাডার যন্ত্র প্রতি মুহূর্তে সংকেত জ্ঞাপন করছে, চাঁদের জমি থেকে চন্দ্রযানের দূরত্ব আর কতখানি। চাঁদের জমির মাত্র ৩০০ মিটারের মধ্যে যখন এসে পৌঁছেছে চন্দ্রযান, তখন চন্দ্রযানের কম্পিউটার যন্ত্র এক ভুল নির্দেশ দিয়ে বসে। চাঁদের জমির যে জায়গায় সে চন্দ্রযানকে নামার জন্যে নির্দেশ দিল, সেটি ছিল একটি বিরাট মৃত জ্বালামুখ—যার ভেতরটা ভাঙাচোরা, এবড়ো-খেবড়ো এবং বড়



চন্দ্রযান লুনার মডিউল চাঁদের জমিতে নেমে এসেছিল একটা ধনুকের ছিলের মত মস্ত লম্বা বাঁকা পথে।

বড় প্রস্তরখণ্ডে বোঝাই হয়ে আছে। সেখানে নামলে চন্দ্রযানটি নিশ্চিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হত এবং যাত্রী মানুষ দুটি হয় মারা পড়তেন, না হয় চন্দ্রযানটিকে নিয়ে তাঁরা আর চাঁদের জমি থেকে উঠে আসতে পারতেন না। এই বিপদের ব্যাপারটা চন্দ্রযানের দুজন যাত্রী আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন যে মুহূর্তে বুঝতে পারলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা চন্দ্রযানের পরিচালন-ব্যবস্থাকে কম্পিউটারের হাত থেকে নিজেরা গ্রহণ করলেন। তখন হাতে আর মাত্র দু-মিনিটের মত জ্বালানি অবশিষ্ট রয়েছে।

কম্পিউটার কেন ভুল নির্দেশ দিল, তার কারণ পরে অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়েছিল। অতিরিক্ত মাত্রায় কাজের চাপের ফলেই নাকি কম্পিউটারের নির্দেশের (প্রোগ্রামিং) মধ্যে সামান্য ত্রুটি দেখা দেয়। কিন্তু কম্পিউটারের সামান্য ত্রুটি বাস্তবে কি ভয়াবহ পরিণতিকে ডেকে আনতে পারত, তা তো আমরা সহজেই বুঝতে পারছি।

লুনার মডিউলের পাইলট অলড্রিন নিজে চন্দ্রযানটিকে পরিচালনা করে নিরাপদে চাঁদের 'প্রশান্তি সাগরের' নির্দিষ্ট জায়গার ওপর এনে তাকে দাঁড় করান। সময়টা ছিল ২৬শে জুলাই, ভারতীয় সময় অনুযায়ী রাত প্রায় একটা। একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত, সন্দেহ নেই। মানুষ এই সর্বপ্রথম চাঁদের মাটিতে নেমেছে, যদিও সে এখনো রয়েছে চন্দ্রযানের নিরাপদ আশ্রয়ের আড়ালে।

চাঁদে নামার পর

চন্দ্রযান যে সময়টায় চাঁদের মাটিতে নেমেছিল, সেটা ছিল চাঁদের সকাল-বেলা। চাঁদের সকালবেলা অর্থে কিন্তু পৃথিবীর সকালবেলা নয়। কারণ

চাঁদের একটা দিনের পরিমাণ হল পৃথিবীর চোদ্দটা দিন ও রাতের সমান। আবার চাঁদের একটা রাতের পরিমাণ হল পৃথিবীর চোদ্দটা দিন ও রাতের সমান। তাই চাঁদের সকালবেলা বলতে এমন একটা সময়কে বোঝাবে, যখন পৃথিবীর সময়ের মাপে হয়ত প্রায় একশ ঘণ্টার মত দিনের আলো পেরিয়ে গেছে।

চাঁদে নামার জন্যে সকালবেলার সময়টাকে নির্বাচন করা হয়েছিল এইজন্যে যে, সকালবেলা সূর্যের আলো তেরছাভাবে পড়ে। ফলে চাঁদে ছোট-বড় সব গঠনেরই ছায়াটা লম্বাটে হয়ে পড়বে। এভাবে বস্তুগুলোকে ভাল করে দেখার সুবিধা হবে, ফলে অভিযাত্রীরা চাঁদে আচম্‌কা হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে আঘাত পাবেন না। আলো এবং ছায়ার সমন্বয়ে সব বস্তুরই ছবিও তোলা যাবে ভালভাবে।

চন্দ্রযান চাঁদে নামার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার হিউসটনের যোগাযোগ-কেন্দ্রের সঙ্গে অভিযাত্রীদের বেতার-সংযোগ স্থাপিত হয়। শুধু হিউসটনের সঙ্গে অভিযাত্রীদের বেতার যোগাযোগ সব সময়ের জন্যে থাকবে না, কেননা পৃথিবী আপন অক্ষের ওপর ঘুরে চলেছে। চন্দ্রযানের সঙ্গে সব সময়ে বেতার যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে পৃথিবীর ওপর ১২০ ডিগ্রীর ব্যবধানে অন্তত তিনটি যোগাযোগ কেন্দ্র থাকা দরকার, যাদের বেতার এরিয়ালের ব্যাস হবে প্রায় ৪০ মিটারের মত। এই তিনটি কেন্দ্রকে তৈরি করা হয়েছিল যথাক্রমে স্পেনের ম্যাড্রিড শহর, ক্যালিফোর্নিয়ার গোল্ডস্টোন এবং অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরার কাছে। এই স্টেশনগুলো থেকে প্রতিটি সঙ্কেত এসে পেঁছত হিউসটনে, যেখানে ছিল প্রধান কেন্দ্রীয় যোগাযোগ-ব্যবস্থা। অ্যাপোলো মহাকাশযানের পৃথিবী থেকে চাঁদ পর্যন্ত সারাটা পথ জুড়েই যোগাযোগের এক অবিচ্ছিন্ন ব্যবস্থা কার্যকরী করতে হয়েছিল।

চন্দ্রযান চাঁদের মাটি স্পর্শ করার আগে এঞ্জিন ঘরের নিষ্ক্রমণ-পথ দিয়ে যে জোরালো গ্যাসের স্রোত বেরিয়ে আসছিল, তার সংঘাতে চাঁদের জমির বেশ কিছু ধুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে। পৃথিবীতে ধুলো উৎক্ষিপ্ত হলে বাতাসের মধ্য দিয়ে সেগুলো আবার খুব ধীরগতিতে নেমে আসে। কিন্তু চাঁদে যেহেতু কোন বাতাস নেই, তাই চন্দ্রযান চাঁদে নামার পরেও অভিযাত্রীরা দেখলেন যে তা থেকে উৎক্ষিপ্ত ধুলো তখনও মাটিতে নেমে আসেনি। অনেক দূরে দেখা গেল, সেগুলো তখনো দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। সেই ধুলোর মধ্য দিয়ে চাঁদের জমির বিভিন্ন বস্তুকে দেখতেও কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

চাঁদের জমিতে চন্দ্রযান যখন নেমে এল, স্বভাবতই অভিযাত্রী আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ

কাজ সারবার জন্যে তাঁরা উদ্যোগী হন। ট্যাঙ্কগুলোতে তখনো যেটুকু জ্বালানি রয়েছে তাকে তক্ষুনি বার করে ফেলে দিতে হবে, যাতে চন্দ্রযানের তলাকার অংশের এঞ্জিনের তাপকে তা শুষে না নেয়। এই তাপ এবং চাঁদের জমির তাপ যুক্ত হয়ে জ্বালানির তাপকে বাড়িয়ে তুলবে এবং এর ফলে মারাত্মক একটা বিস্ফোরণ ঘটা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

অভিযাত্রীরা এবারে চন্দ্রযানের জানলার মধ্য দিয়ে চাঁদের দিকে তাকান। এত কাছে থেকে চাঁদ এই প্রথম তার বিচিত্র প্রকৃতিকে মানুষের দৃষ্টির সামনে প্রকাশ করে ধরল। আর্মস্ট্রং পৃথিবীর প্রধান যোগাযোগ-কেন্দ্র হিউসটনের বিজ্ঞানীদের কাছে চাঁদের প্রথম বার্তা পাঠাতে শুরু করেন। তিনি বলে চলেন, যেদিকে তাকানো যায় শুধু অজস্র পাথরের মেলা। পাথরের রকম, চেহারা এবং গঠনের বৈচিত্র্যের যেন আর শেষ নেই।

পাথরগুলোর রঙের ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত। ওদের সাধারণ কোন রঙ আছে বলে মনে হয় না। কোনদিক থেকে কিভাবে পাথরগুলোকে দেখা হচ্ছে সেই অনুযায়ী ওদের রঙগুলোও যেন বদলে যাচ্ছে।

চন্দ্রযান চাঁদের যে জায়গায় নেমেছে সে জায়গাটা মোটামুটি সমতল। আশেপাশে বিভিন্ন মাপের সব জ্বালামুখ ছড়িয়ে আছে—ওদের ব্যাস দেড় থেকে পনের মিটারের মত। এক মিটারের চেয়ে ছোট জ্বালামুখের সংখ্যা যে কত হাজারের কোঠায় দাঁড়াবে, তা বলে ওঠা যায় না। ছোটখাট একটা পাহাড়ও দূরে চোখে পড়ছে যেন।

আগে থেকে ঠিক করা ছিল যে অভিযাত্রীরা প্রথমে চন্দ্রযানের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতির খুঁটিনাটি পরীক্ষার কাজ সারবেন। তারপরে ঘণ্টা চারেকের মত বিশ্রাম করে তবেই চাঁদে হাঁটার ঐতিহাসিক কর্মসূচীর কাজ শুরু করবেন।

কিন্তু অভিযানের নায়ক আর্মস্ট্রং হিউসটনের কাছ থেকে অনুমতি চাইলেন যে দেরি না করে তাঁদের এক্ষুণি চাঁদে নামতে দেওয়া হোক। অনুমতি পাওয়া গেল সহজেই। চাঁদে নামার আগে অভিযাত্রীদের পরতে হবে বিশেষভাবে তৈরি এক জটিল মহাকাশ-পোশাক, মানুষের জীবদেহের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রতিকূল চাঁদের পরিবেশে যে পোশাক তাঁদের রক্ষা করবে।

চাঁদে নামার পোশাক

চাঁদে নামার প্রাথমিক কাজ হিসেবে আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন মহাকাশ-পোশাক পরতে শুরু করেন। পৃথিবীতে এপর্যন্ত তৈরি সবচেয়ে জটিল এই পোশাকটিকে একটি নিখুঁত যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায় সহজেই।

এই পোশাকটি একটির ওপর আর একটি—এভাবে চাপানো ১৬টি স্তর দিয়ে তৈরি। প্রতিটি স্তরের মধ্যে রয়েছে হাজার হাজার অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র, যাদের মধ্য দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হতে পারে। পোশাকটি তৈরির মুন্সিয়ানা এমনই যে, কোন দুটি স্তরের ছিদ্র একটি আর একটির ওপরে এসে পড়ে না। তার ফলে মহাকাশের যে-কোন একটি ধূলোকণা পোশাকের সঙ্গে কখনো সংঘাত সৃষ্টি করলেও একটির পর আর একটি ছিদ্রের সুড়ঙ্গপথ দিয়ে মানুষের শরীরের কাছাকাছি কখনোই গিয়ে পৌঁছতে পারবে না।

পোশাকটির মধ্যে অভিযাত্রীদের প্রশ্বাসকাজের জন্যে সাধারণ বায়ুর পরিবর্তে রয়েছে বিশুদ্ধ অক্সিজেনের ব্যবস্থা এবং প্রতি বর্গ-সেণ্টিমিটার ক্ষেত্রের ওপর বায়ুর চাপের মাত্রা রাখা হয়েছে ২৬০ গ্রামের মত।

পোশাকটির তাপ ও ঠাণ্ডা-প্রতিরোধক ব্যবস্থা এতটাই নিখুঁত যে চাঁদে দিন ও রাতের বা আলো ও অন্ধকার অঞ্চলে তাপমাত্রা ২৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে গিয়ে পৌঁছলেও এই পোশাকটির অভ্যন্তরে তা কোন প্রভাবই সৃষ্টি করতে পারবে না। পোশাকটির ভেতরের মানুষটির মনে হবে তিনি যেন সব সময়েই ৭০ থেকে ৭৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটের এক স্বাভাবিক তাপমাত্রার পরিবেশের মধ্যেই রয়েছেন।

এছাড়া মহাকাশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বায়ুহীন চাঁদের ওপর যে সব মারাত্মক তেজস্ক্রিয় রশ্মি (যেমন অতিবেগুনি রশ্মি, রঞ্জন রশ্মি, মহাজাগতিক রশ্মি ইত্যাদি) এসে পৌঁছচ্ছে তারা এই পোশাকের দুর্ভেদ্য স্তরগুলো পেরিয়ে অভিযাত্রীদের জীবদেহের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। এছাড়া ক্ষুদ্র উল্কাকণার যে-সব দল মহাকাশের মধ্য দিয়ে ঘণ্টায় প্রায় ১,০২০০০ কিলোমিটার বেগে ছুটে চলেছে তাদের সংঘাতের বিরুদ্ধেও প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে এই পোশাকের মধ্যে।

এই অভিনব পোশাকটির একেবারে বাইরের স্তরটি 'সুপার বিটা' নামে বস্তুর দ্বারা গঠিত। ফাইবার গ্লাসের ওপরে নাইলনৎজাতীয় একটি দৃঢ় প্লাস্টিক পদার্থ টেফলনের আস্তরণের সমবায়ে এটি তৈরি। এর ওপরে আবার দুটি জোরালো প্লাষ্টিকের আবরণ রয়েছে। অভিযাত্রীদের একেবারে দেহের কাছে পোশাকের যে স্তরটি রয়েছে তা নাইলনের দ্বারা তৈরি এবং এর মধ্যে রয়েছে সরু নালীর সুদীর্ঘ ব্যবস্থা। এই নালীর মধ্য দিয়ে সব সময়ে জল প্রবাহিত হয়ে অভিযাত্রীদের শরীরের তাপমাত্রার সমতা রক্ষিত হচ্ছে।

অভিযাত্রীদের পিঠের ওপরে ১৮০ পাউণ্ডের মত (পৃথিবীর ওজনের মাপে—কিন্তু চাঁদে মাত্র ৩০ পাউণ্ড) একটি বোঝা রয়েছে। এই বোঝারূপী আধারটির মধ্যে রয়েছে অক্সিজেন এবং জলের ট্যাঙ্ক। এই জলের ট্যাঙ্ক থেকে জল

পোশাকের প্রথম স্তরের নালীগুলোর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এছাড়াও বোঝাটির মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা এবং বেতার-যোগাযোগ-ব্যবস্থা। এই বেতার-যোগাযোগ-ব্যবস্থার মাধ্যমে অভিযাত্রীরা বায়ুহীন চাঁদের ওপর যেমন পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন তেমনি পৃথিবীর যোগাযোগ-কেন্দ্রগুলোর সঙ্গেও তাঁদের যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ থাকবে।

মহাকাশ-পোশাকের দ্বারা সর্বাঙ্গ আবৃত থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি অভিযাত্রী একটি দ্বিতীয় হেলমেট পরিধান করেছেন যার সামনেটা অতি দুর্ভেদ্য কাঁচের দ্বারা তৈরি এবং তার ওপরে আবার একটি রাসায়নিক বস্তুর (ধাতব অক্সাইড) প্রলেপ মাখানো। এই প্রলেপ সূর্যের আলোর ঝলকানি থেকে অভিযাত্রীদের চোখকে রক্ষা করবে। এ ছাড়াও অভিযাত্রীরা পরেন একজোড়া অতিরিক্ত দস্তানা এবং চাঁদের জন্যে তৈরি একজোড়া জুতো।

সমগ্র মহাকাশ-পোশাক এবং পিঠের বোঝার ওজন মহাকাশ-যাত্রীদের দৈহিক ওজনের চেয়েও বেশি, কিন্তু চাঁদে পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ অভিকর্ষ-বলের জন্য এই ওজনটা অনেকখানিই কম (পৃথিবীর ওজনের এক ষষ্ঠাংশ) হয়ে দাঁড়ায়।

চাঁদে প্রথম মানুষ

মহাকাশ পোশাকে সজ্জিত হয়ে চন্দ্রযানের বাইরে আসার আগে আরো একটি কাজ অভিযাত্রীদের জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে। চন্দ্রযানের যে কক্ষের মধ্যে তাঁরা রয়েছেন, সেখানে বায়ুর চাপকে সম্পূর্ণভাবে কমিয়ে ফেলতে হবে। তা না হলে বাইরে বেরোবার দরজাই খোলা যাবে না। চাঁদ যেহেতু সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য অঞ্চল, তাই ভেতরের ঘরকেও বায়ুশূন্য করার জন্যে সেখানকার অক্সিজেনকে একটি ভাল্‌ভের মধ্য দিয়ে বাইরে বার করে দিতে হবে।

চন্দ্রযানের দরজাটা খোলার পর অভিযাত্রী আর্মস্ট্রং মহাকাশ পোশাক পরিহিত অবস্থায় দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাইরের পাটাতনের ওপর এসে দাঁড়ান। চন্দ্রযানের ভেতর থেকে অভিযাত্রীরা যখন সূর্যের আলোয় ঝলমলিয়ে ওঠা চাঁদের জমিকে দেখছিলেন, তখন তাঁদের মনে হয়েছিল, একটা সাধারণ জামা পরে ঐ রোদে গা ভাসিয়ে যেন নেমে পড়লেই হয়। সেই চাঁদের পরিবেশে মানুষ এখন একা। চাঁদের মাটি যেন মানুষের পদচিহ্নের অপেক্ষায় রয়েছে।

আর্মস্ট্রং চন্দ্রযানের সিঁড়ির পাশে এসে দাঁড়ালেন। সিঁড়ির পাশে চন্দ্রযানের নিচেকার অংশের একটি ডালা খুলে তিনি একটি টেলিভিশন ক্যামেরার মুখ উন্মুক্ত করেন। এবারে আর্মস্ট্রং ধীরে ধীরে সিঁড়ির ধাপগুলো বেয়ে চাঁদের জমির

দিকে নেমে আসতে শুরু করেন। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ টেলিভিশনে সেই ঐতিহাসিক ঘটনা রুদ্ধশ্বাসে প্রত্যক্ষ করছেন।

২৬শে জুলাই ভারতীয় সময় সকাল ৮টা বেজে ২৭ মিনিটে পৃথিবীর প্রথম মানুষের পদচিহ্ন পড়ল চাঁদের বুকে। অভিযাত্রী আর্মস্ট্রং চাঁদের মাটি ছুঁয়েই বলে উঠলেন—'একটি মানুষের পক্ষে এ একটি ক্ষুদ্র পদক্ষেপ, কিন্তু সমগ্র মানব-জাতির পক্ষে এ হল এক বিরাট পদক্ষেপ।' পৃথিবীর বাইরে আর একটি নতুন জগতে এসে পৌঁছেছে মানুষ। স্বভাবতই তার মনে কি বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি হতে পারে, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি।

চাঁদে প্রথম আধঘণ্টা

চাঁদের জমিকে নিয়ে বিজ্ঞানীদের কত যুগ ধরে কত প্রশ্ন, কত জিজ্ঞাসা। স্বভাবতই পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা চাঁদে প্রথম অভিযাত্রীদের মুখ থেকে চাঁদের জমি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা শোনার জন্যে উন্মুখ হয়ে ছিলেন।

আর্মস্ট্রং বেতারে জানাতে থাকেন, চাঁদের যে জমির ওপর তিনি পা রেখেছেন, তার ওপরটায় খুব মিহি এবং পাউডারজাতীয় বস্তু ছড়ানো রয়েছে। তাঁর জুতোর গোড়ালির সাহায্যে তিনি সেই বস্তুকে খুব আলতোভাবে তুলেও নিতে পারছেন। জুতোর শুকতলায় এবং দুপাশে কয়লার গুঁড়োর মত চাঁদের মৃত্তিকার মিহি স্তর জমে উঠছে। ভিজে বালির মধ্যে পা যেভাবে বসে যায়, ঠিক তেমনি তাঁর পা চাঁদের জমিতে আধ সেণ্টিমিটারের মত বসে যাচ্ছে। তাঁর জুতোর ছাপটা তিনি স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছেন। চাঁদের অভিকর্ষ-পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের ১/৬ ভাগ হওয়া সত্ত্বেও হাঁটাচলা করতে তাঁর কোন অসুবিধা হচ্ছে না। তবে পা-টা যেন মাঝে মাঝে পিছলে পড়ার উপক্রম হচ্ছে।

আর্মস্ট্রং এবারে চন্দ্রযানকে পরীক্ষা করেন। দেখা গেল, চন্দ্রযান নামার সময় কোনরকমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এবং নামার জায়গাতে জ্বলন্ত গ্যাসের স্রোতের ঝাপটায় কোন গভীর গর্তও তৈরি হয়ে বসে নি। চন্দ্রযান চাঁদের জমিতে নামার সময় যদি জমির ওপর লম্ব অবস্থা থেকে পনের ডিগ্রির চেয়ে বেশি হেলে নামত, তাহলে চন্দ্রযান চাঁদ থেকে আর কখনোই উঠে আসতে পারত না। অভিযাত্রীরা চাঁদের মাটিতেই বন্দী হয়ে পড়তেন। চন্দ্রযান চাঁদের মাটিতে লম্ব অবস্থা থেকে ৪½ ডিগ্রি হেলে নেমেছিল।

চাঁদে নামার পরেই পাছে কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্যে চন্দ্রযানকে চাঁদ ছেড়ে উঠে আসতে হয়, তাই চাঁদে নেমেই চাঁদের কিছু পাথর এবং মৃত্তিকার নমুনা সংগ্রহ করে নেবার নির্দেশ ছিল আর্মস্ট্রং-এর ওপরে। সে কাজটা করতে

গিয়ে আর্মস্ট্রং এক বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করলেন। চাঁদের জমির ওপরটা খুব নরম বস্তু দিয়ে তৈরি বলে মনে হলেও যখনই তিনি নমুনা-সংগ্রাহক যন্ত্রকে জমির খানিকটা ভেতরে ঢোকাবার চেষ্টা করছেন, তখনই কঠিন পদার্থের সন্ধান পাচ্ছেন।

আর্মস্ট্রং যে পাথরের নমুনা সংগ্রহ করলেন, পৃথিবীর আগ্নেয় শিলা ব্যাসল্টের সঙ্গে তার অনেক মিল রয়েছে। কিছু শিলার গঠন পিউমিস স্টোন বা ঝামা-পাথরের মত। তপ্ত লাভা-স্রোত থেকে বুদ্বুদের আকারে গ্যাস বেরিয়ে যাবার পর জমে গিয়ে যে পাথর তৈরি হয়, এ হল অনেকটা তাই।

অলড্রিন ইতিমধ্যে চন্দ্রযান থেকে রোপওয়ে বা দড়ি-পথ বেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র চাঁদের জমিতে আর্মস্ট্রংয়ের কাছে পাঠাতে আরম্ভ করেছেন। চাঁদের জমিতে আধ ঘণ্টার মত সময় কাটিয়েছেন আর্মস্ট্রং। এবারে সঙ্গী অলড্রিনের তাঁর সঙ্গে যোগ দেবার পালা।

এক বিচিত্র জগৎ

অলড্রিন ধীরে ধীরে চন্দ্রযানের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসেন চাঁদের জমিতে। দুজন অভিযাত্রী আবার একসঙ্গে মিলিত হলেন।

অলড্রিন চাঁদের মাটিতে পা দিয়েই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। হৃদয়ের এই আবেগ প্রকাশের মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছুই ছিল না। চাঁদের নিঃসঙ্গ, রুক্ষ প্রকৃতি দুজন অভিযাত্রীকেইগভীরভাবে স্পর্শ করে। চাঁদের দিগন্তকে দেড় কিলোমিটারের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে। দিগন্ত পর্যন্ত যেদিকেই তাঁরা তাকান, কোথাও এতটুকু সমতল ভূমির চিহ্ন নেই। চাঁদের সমগ্র চেহারাটাই যেন ভাঙাচোরা, অজস্র গর্তে ভর্তি, ছোট বড় পাথরের স্তূপ অবিন্যস্তভাবে এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। আর চারদিকে ছড়িয়ে আছে ছোট ছোট অজস্র জ্বালামুখ। একটা ছোট পাহাড়ও তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু সেটার দূরত্ব নির্ণয় করা সহজ ব্যাপার নয়। পৃথিবীতে মরুভূমির ওপর দূরত্ব মাপার মতই চাঁদেও এ জাতীয় একটা অসুবিধে তাঁরা বোধ করেছেন।

চাঁদের জমির চেহারা যতটা ভাঙাচোরা এবং গর্ত ও ফাটলে ভর্তি বলে আগে জানা গিয়েছিল, চাঁদের জমির ওপর দাঁড়িয়ে অভিযাত্রীদের মনে হয়েছে, আসলে চাঁদ তার চেয়েও অনেক বেশি ভাঙাচোরা। আমেরিকার একটি মরুভূমির সঙ্গে চাঁদের এই চেহারার তুলনা খুঁজে পেয়েছেন তাঁরা। কোথাও একফোঁটা সবুজের চিহ্ন নেই, কোন জল বা প্রাণের চিহ্ন নেই। কিন্তু চাঁদের এই প্রাণহীন, বিচিত্র, রুক্ষ প্রকৃতিরও একটা বন্য সৌন্দর্য আছে, যা পৃথিবীর দুটি মানুষের চোখকে মুগ্ধ না করে পারে নি।

চাঁদের যে রঙটা প্রধানভাবে অভিযাত্রীদের চোখে ধরা পড়েছে, সে হল তার ধূসর বর্ণ। কিন্তু চাঁদের ধুলোর মধ্যে কখনো বা কোকোর মত রঙও দেখেছেন তাঁরা। আবার ধূসরবর্ণ দু-একটা পাথরও তাঁদের নজরে এসেছে। চাঁদের যে জায়গায় সূর্যের আলো পড়ছে, সেখানটায় যেমন প্রচুর আলো, তেমনি তাপমাত্রাও প্রায় ২০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের মাত্রায় পৌঁছে যাচ্ছে। আবার যেখানে অন্ধকার, সেখানে যেমন অমানিশার নিশ্ছিদ্র রাতের মত অন্ধকার, তেমনি তাপমাত্রাও প্রায় — ২৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের কোঠায় নেমে বসে আছে।

চাঁদে দিনের বেলাতেও আলো এবং অন্ধকার জায়গাতে তাপমাত্রার এই প্রচণ্ড তারতম্যের কারণটা হল এই, সেখানে সূর্যের আলো এবং তাপকে চারদিকে প্রতিফলিত করে ছড়িয়ে দেবার জন্যে বায়ুরূপী কোন উপাদান নেই। চাঁদে তাপমাত্রার এই প্রচণ্ড তারতম্য অভিযাত্রীরা অবশ্য কিছুমাত্রও বোধ করেন নি। যে মহাকাশ-পোশাক তাঁরা পরেছেন, তার তাপকে সমভাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেবার ক্ষমতার কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি ;

এরপর আর্মষ্ট্রং এবং অলড্রিন একটি ফলক স্থাপন করেন চাঁদের জমিতে। ফলকে উৎকীর্ণ লেখার মধ্যে ছিল, ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে পৃথিবীর মানুষ প্রথম চাঁদের মাটিতে পা রেখেছিল। তাঁরা মানবজাতির কাছ থেকে শান্তির বাণী বয়ে নিয়ে এসেছিলেন চাঁদে। এছাড়া তাঁরা মহাকাশ জয়ের অভিযানে শহীদ সোভিয়েট ইউনিয়নের দুজন মহাকাশযাত্রী গ্যাগারিন ও কোমারভ এবং আমেরিকার মহাকাশযাত্রী গ্রিসম, চ্যাফি এবং হোয়াইটের মেডেল এবং ব্যাজ চাঁদের মাটিতে রেখে আসেন।

চাঁদে হাঁটার মহড়া

চাঁদের মাটিতে প্রায় দু-ঘণ্টা কাটাবার পর চাঁদের স্বল্প-অভিকর্ষ-বলের পরিবেশে হাঁটাচলার কায়দাকানুন রপ্ত করার কাজে লাগলেন পৃথিবীর অভিযাত্রীরা। চাঁদের অভিকর্ষ পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলের ১/৬ ভাগ। তাই পৃথিবীতে আমরা যতটা জোরে পা ফেলতে বা তুলতে অভ্যস্ত, চাঁদে সেভাবে চলতে গেলে অনেক বেশি লাফিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। ফলে আচমকা পড়ে গিয়ে হাত পা জখম হয়ে বিপদ দেখা দিতে পারে। তাই অভিযাত্রীদের ওপর বিজ্ঞানীদের নির্দেশ ছিল, ক্যাঙারুর মত দু-পা জোড়া করে আস্তে আস্তে চাঁদের ওপর লাফিয়ে চলা।

অভিযাত্রী অলড্রিন বলেছেন, চাঁদে ক্যাঙারুর মত হাঁটার চেষ্টা করতে গিয়ে তিনি দেখেছেন, নিজের গতিবিধির ওপর নিয়ন্ত্রণটা খুব সহজে রাখা যায় না।

চাঁদে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটাটাই তাঁর কাছে সবচেয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা মনে হয়েছে। এর ফলে প্রায় একটা ভেসে বেড়াবার মত অনুভূতি দেখা দেয়। তবে চাঁদে পা ফেলবার আগে, চার পাঁচ পা বাদে কোথায় গিয়ে পা-টা পড়ছে, তা আগে থেকে খেয়াল রাখতে হবে। চলতে চলতে থামবার ইচ্ছে হলেও, আরো দু-তিন পা এগিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত চলার বেগ বন্ধ করা যাবে না। চলার দিক পরিবর্তনের বেলাতেও একই কথা খাটে। আসল ব্যাপারটা হল, চাঁদে হাঁটার সময় শরীরের ভরকেন্দ্রটা (centre of mass) ঠিক কোথায় রয়েছে, সেটা সব সময়ে খেয়াল রাখতে হবে, তা না হলেই বিপদ।

চাঁদের মাটিতে গর্ত খোঁড়াটা অভিযাত্রীদের কাছে বেশ শক্ত কাজ বলে মনে হয়েছে। চাঁদের স্বল্প-অভিকর্ষের পরিবেশে ওজনটাও কমে পৃথিবীর ১/৬ ভাগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই কোন জিনিসের ওপর ঘা মেরে কাজ করতে হলে নিজের স্বল্প ওজনটাকেও খুব বেশি কাজে লাগানো যায় না। আবার সমগ্র ওজনটাকেও কাজে লাগানোর অসুবিধা রয়েছে, কেননা নিজের শরীরের কিছুটা ওজনকে হাতে রাখতে না পারলে কাজ করার সময় তাল সামলানো মুস্কিল হয়ে উঠবে।

চাঁদের পাউডার-জাতীয় মৃত্তিকার ওপর পা ফেলতে গিয়ে অভিযাত্রীদের জুতো কোথাও হয়ত মাত্র ১,২ সেণ্টিমিটারের মত চাঁদের জমির ভেতরে ঢুকে গেছে। কিন্তু ছোট ছোট জ্বালামুখগুলোর চারপাশে এবং মাথার ওপরে নরম মৃত্তিকার স্তরটা ছিল আরো খানিকটা গভীর। সেখানে অভিযাত্রীদের বুটজুতো কোথাও কোথাও চাঁদের জমিতে ৮ থেকে ১০ সেণ্টিমিটারের মত বসে যাচ্ছিল। বুটজুতো শক্ত কিছুর ওপর গিয়ে ঠেকতেই পা পিছলে পাশের দিকে পড়ে যাবার উপক্রম হচ্ছিল। তাই অভিযাত্রীরা চাঁদে যতটা সম্ভব সমান জমির ওপর হাঁটবার চেষ্টা করেছেন। জ্বালামুখের ছোট গর্তগুলো তাঁরা এড়িয়ে যাবারই চেষ্টা করেছেন।

চাঁদে হাঁটাচলা এবং বিভিন্ন কাজ করার মধ্য দিয়ে আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন কিন্তু কখনোই ক্লান্ত হয়ে পড়েন নি। কখনো দাঁড়িয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করার প্রয়োজনও তাঁরা বোধ করেন নি। হিউসটনের বিজ্ঞানীরা হাঁটাচলার সব সময়েই আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিনের প্রতিটি জৈবিক প্রক্রিয়ার ওপর সজাগ নজর রেখেছিলেন। চাঁদে হাঁটার সময় দুজনের হৃদস্পন্দনের মাত্রা ছিল ৯০ থেকে ১২৫-এর মধ্যে। আর্মস্ট্রং-এর ক্ষেত্রে এই মাত্রা এক সময়ে ১৬০-এর কোঠায় গিয়ে পৌঁছেছিল। ঐ সময়টায় তাঁকে অবশ্য খুব শ্রমসাধ্য কাজ করতে হচ্ছিল।

চাঁদে ঘোরাঘুরির সময় অভিযাত্রীদের দেহের তেজস্ক্রিয়তার মাত্রারও কোন

বৃদ্ধি ঘটতে দেখা যায় নি। সূর্যের ক্ষেত্রে সৌরোচ্ছ্বাসজাতীয় ক্রিয়া প্রক্রিয়ার সঙ্গে এই তেজস্ক্রিয়তা বৃদ্ধির সম্পর্ক রয়েছে। সূর্যের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলেন বিজ্ঞানীরা।

চাঁদের জমির ওপর তেজস্ক্রিয়তার মাপের স্বল্পতায় বিজ্ঞানীরা যথেষ্ট উৎসাহিত হয়েছেন। ভবিষ্যতে আরো বেশি সময়ের জন্য তাঁরা মানুষকে চাঁদে রাখতে পারবেন।

চাঁদের আকাশে পৃথিবী

অভিযাত্রীরা চাঁদের জমির ওপর দাঁড়িয়ে যখন পৃথিবীর দিকে ফিরে তাকিয়েছেন, তখন পৃথিবীকে চাঁদের আকাশে এক বিরাট আধফালি চাঁদের মত দেখাচ্ছিল। পূর্ণিমার রাতে চাঁদকে আমরা যত বড় দেখি, চাঁদের আকাশে গোটা পৃথিবীকে তার চেয়ে বারগুণ বড় এক বিরাট বলের মত দেখতে পাবার কথা।

মানুষ এই প্রথম তার পৃথিবীকে ছাড়িয়ে সৌরজগতের আর একটি বাসিন্দা, পৃথিবীরই চাঁদের মাটিতে পা রেখেছে। মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের মাঝে পৃথিবীরও যে একটি আসন রয়েছে, সেই আসনে তাকে দেখার মধ্য দিয়ে মানুষের মনে এক মহাজাগতিক চেতনার উদয় না হয়ে পারে না।

পৃথিবীর মহাদেশের সবুজ রঙকে অভিযাত্রীরা দেখেছেন। মহাদেশের সীমারেখাগুলো তাঁদের চোখে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। পৃথিবীকে ঘিরে নীল রঙের এক বিরাট উজ্জ্বল কান্তি তাঁদের সমগ্র দৃষ্টিকে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল সন্দেহ নেই।

সূর্যের জোরালো আলোয় চাঁদের সমগ্র দেহ ঝলমলিয়ে উঠছিল। সেই আলোর বন্যায় পৃথিবীর আলোও ম্লান হয়ে ওঠে। পৃথিবীর জ্যোৎস্নার আলোর ছটা অভিযাত্রীরা তখনই উপলব্ধি করেছেন, যখন চাঁদকে পরিক্রমার সময় চাঁদের অন্ধকারাচ্ছন্ন পিঠকে সেই আলোয় তাঁরা উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে দেখেছেন।

নিকষ কালো মহাকাশের পটভূমিতে বিরাট পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে মানুষের মনে এই চেতনাটাই বড় হয়ে দেখা দেবে যে সে কোন একটি বিশেষ দেশ থেকে আসেনি। সে এসেছে সৌরজগতেরই একটি গ্রহ থেকে, যার নাম হল পৃথিবী।

চাঁদে বৈজ্ঞানিক কাজ

অলড্রিন চাঁদের মাটিতে নেমেই বৈজ্ঞানিক কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত 'সূর্যের বাতাস' সম্পর্কিত পরীক্ষার কাজ শুরু করেন। একটি অতি পাতলা অ্যালুমিনিয়ামের চাদরকে একটি দণ্ডের সঙ্গে বেঁধে তিনি চাঁদের জমির ওপর বসিয়ে দেন।

সূর্য থেকে সব সময়েই সূর্যের বাতাসের (solar wind) সঙ্গে হিলিয়াম, আরগন, নিয়ন, ক্রিপটন, জেনন প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য (noble) গ্যাসীয় বস্তুদের পরমাণুরা ছুটে বেরোচ্ছে। প্রতি সেকেণ্ডে এরা ছোটে ১৬০০ কিলোমিটার বেগে। যে অ্যালুমিনিয়ামের চাদরটিকে অলড্রিন চাঁদের জমির ওপর বসিয়েছেন, তার জালের মধ্যে এই পরমাণুরা প্রবেশ করে বন্দী হয়ে পড়বে। চাদরটিকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার পর বিজ্ঞানীরা যখন গবেষণাগারে সেটিকে তপ্ত করবেন, তখন বন্দী পরমাণুগুলো মুক্তি পাবে। ওদের গণনা করে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারবেন, চাঁদে সূর্যের বাতাসের গ্যাসীয় পরমাণুরা কি সংখ্যায় এসে পৌঁছচ্ছে।

চাঁদে বৈজ্ঞানিক কর্মসূচীর আর একটি কাজ ছিল—একটি ভূকম্প-নির্দেশক যন্ত্র-ব্যবস্থাকে বসানো, যার মধ্যে আসলে ছিল চারটি ভূকম্প মাপার যন্ত্র। চাঁদে আদৌ কোন ভূমিকম্প ঘটছে কি না, এই যন্ত্রের কাছ থেকে তার নির্দেশ পাওয়া যাবে। যন্ত্রগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যে একটি ওজন প্রলম্বিত অবস্থায় রয়েছে। চাঁদের জমিতে কম্পনের ফলে যন্ত্রের অন্য অংশ কেঁপে উঠলেও ওজনটি স্থানচ্যুত হবে না। যন্ত্রটির দুটি অংশের মধ্যে এই আপেক্ষিক বেগ হল একটি সংকেত। এই সংকেতটি বিদ্যুৎ তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে চাঁদের জমির নড়াচড়ার মাত্রা এবং কম্পন-সংখ্যাকে নির্দেশিত করে তুলবে। এই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ আবার একটি বেতার-প্রেরক যন্ত্রে বেতার-তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে পৃথিবীর যোগাযোগ-কেন্দ্রে এসে পৌঁছবে। দুটি সৌর ব্যাটারি সূর্যের আলোকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে যন্ত্রটির শক্তির চাহিদা মেটাচ্ছিল।

ভূকম্প-নির্দেশক যন্ত্রটির ওপর বসানো হয়েছিল একটি ধূলাসংগ্রাহক যন্ত্র, যার কাজ হবে যন্ত্রটির ওপর কি পরিমাণ ধুলো জমে তার পরিমাণ সংগ্রহ করা।

লেসার আলোর পরীক্ষা

এছাড়া চাঁদে একটি লেসার আলোর প্রতিফলক-ব্যবস্থাকে বসানো হয়েছিল। প্রতিফলকটির মুখ ঘোরানো ছিল পৃথিবীর দিকে।

একটি লেসার আলোর প্রেরক-যন্ত্র থেকে আলো নির্গত হয় পেন্সিলের মত অতি সরু রেখায়, অতি শৃঙ্খলিত সুসম্বদ্ধ তরঙ্গের মাধ্যমে। একটি ফ্লাশলাইট থেকে আলো যেমন চারদিকে ছড়িয়ে যায়, লেসার আলোর ক্ষেত্রে তেমন হয় না। লেসার আলো পৃথিবী থেকে ৩,৪০০০০ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে যখন চাঁদ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে, তখন সেই জায়গায় ঐ আলোর বিস্তৃতি দাঁড়াবে মাত্র চার কিলোমিটারের মত।

যে প্রতিফলক যন্ত্রটিকে অভিযাত্রীরা চাঁদে বসালেন, পৃথিবী থেকে লেসার আলোকে যদি তার ওপর সঠিকভাবে লক্ষ্য করে ফেলা যায় তাহলে সে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ আলোকে আবার একই পথে ফিরিয়ে দেবে।

বিজ্ঞানীরা ঠিক $\frac{১}{১,০০,০০০}$ সেকেণ্ড বাদে বাদে পৃথিবী থেকে লেসার আলোর রশ্মিকে প্রতিফলকটির দিকে ছুঁড়ে মারবেন। আলোর বেগ সেকেণ্ডে ৩,০০,০০০ কিলোমিটার। একটি লেসার রশ্মির পৃথিবী থেকে চাঁদ পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসতে কত সময় লাগল, আলোর বেগের মাপে সেটাকে হিসেব করে বিজ্ঞানীরা পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের মাপকে অতি সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারবেন।

ইতিপূর্বে পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের যে সব মাপ পাওয়া গেছে, বিজ্ঞানীরা বলছেন তার মধ্যে নাকি বেশ কয়েক মিটারের মত ত্রুটি রয়ে গেছে। লেসার আলোর পরীক্ষার মাধ্যমে এই ত্রুটিকে তাঁরা মাত্র ১০ থেকে ১৫ সেণ্টিমিটারের মধ্যে নামিয়ে আনতে চান।

এছাড়া লেসার আলোর পরীক্ষাটির মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা আরো কয়েকটি পুরনো প্রশ্নের উত্তর পাবার আশা রাখেন। যেমন, আপন অক্ষের ওপর ঘূর্ণনের সময় পৃথিবীর মাথার দিকটা একপাশ থেকে আর একপাশে যে খানিকটা আন্দোলিত হয় (wobble), তার পরিমাপ কত? বিজ্ঞানীদের মতে কালক্রমে পৃথিবীর এই আন্দোলনের ব্যাপারটা কমে আসার কথা ছিল। কিন্তু অজ্ঞাত কিছু কারণের জন্যে, সম্ভবত ভূকম্পের জন্যেও হতে পারে—পৃথিবীর এই বিচিত্র বেগের ব্যাপারটা নাকি ঘটেই চলেছে। লেসার প্রতিফলক ব্যবস্থার মাধ্যমে যদি এই বেগের সঠিক পরিমাপ করা কখনো সম্ভব হয়, তাহলে পৃথিবীতে ভূমিকম্প ঘটার আগেই তার পূর্বাভাস জানানো সম্ভবপর হতে পারবে।

লেসার প্রতিফলক পরীক্ষাটির বিভিন্ন পরিমাপ থেকে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে আর একটি বিচিত্র ঘটনা সম্বন্ধে আলোকপাত করতে চান—সেটি হল ভাসমান মহাদেশের ব্যাপারটি। ভাসমান মহাদেশের তত্ত্ব অনুযায়ী আটলাণ্টিক মহাসাগরের দুই পারে আমেরিকা এবং ইয়োরোপ-আফ্রিকার মধ্যকার দূরত্ব নাকি অতি ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে। এরকম প্রমাণও নাকি পাওয়া গেছে যে প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশটা হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জকে নিয়ে প্রতি বছর কয়েক সেণ্টিমিটার করে আমেরিকা মহাদেশের কাছ থেকে জাপানের দিকে সরে চলেছে। তার ফলে এশিয়া মহাদেশের সমগ্র জমির ওপরে যে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হচ্ছে, তারই জন্যে হয়ত জাপান এবং কাছাকাছি সমস্ত দ্বীপগুলোতে এত বেশি ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গার ঘটতে দেখা যায়।

ভাসমান মহাদেশগুলোর বেগ যদি প্রতি বছরে এক সেণ্টিমিটারের চেয়েও কম মাপের হয়ে দাঁড়ায়, তাহলেও লেসার আলোর পরীক্ষার মাধ্যমে তা ধরা পড়তে পারে।

চাঁদ আদৌ পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে কি না, এটাও বিজ্ঞানীদের কাছে একটা প্রশ্ন। একদল বিজ্ঞানীর ধারণা, জন্মের প্রথম লগ্নে চাঁদ নাকি পৃথিবী থেকে বর্তমানের ৩,৪০০০০ কিলোমিটারের জায়গায় মাত্র ১৭৫০০ কিলোমিটার দূরে ছিল। তারপর থেকে শুরু হয়েছে চাঁদের পথযাত্রা। গত ২০০ বছরের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জ্যোতির্বিদরা নাকি জানতে পেরেছেন যে চাঁদ প্রতি বছর ৮ সেণ্টিমিটার করে পৃথিবীর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

কিছু বিজ্ঞানীর মতে, চাঁদের এই দূরে সরে যাবার বেগ নাকি ক্রমেই বাড়ছে। এটা ঘটার কারণ নাকি হল এই যে, যে অভিকর্ষ-বলের দ্বারা পৃথিবী চাঁদকে বেঁধে রেখেছে তার জোরটাই যাচ্ছে কমে। বিজ্ঞানীরা এ প্রসঙ্গে আরো যে ভয়ঙ্কর কথাটা বলেছেন সেটা হল এই যে, সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়েই নাকি এই অভিকর্ষের জোর কমার পালা শুরু হয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যখন বয়সের বিচারে ছিল নবীন, তখন এই অভিকর্ষের জোরটা ছিল বেশি। কিন্তু যত দিন যাবে সেই জোরটা ক্রমেই কমে আসতে থাকবে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যকার দূরত্বের মাপটা লেসার আলোর পরীক্ষার মাধ্যমে যদি দশ বছর ধরে চালিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে পৃথিবীর অভিকর্ষ আদৌ কমছে কিনা এই রহস্যের ওপর আলোকপাত করা সম্ভবপর হবে।

অভিযাত্রীরা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য যে সব যন্ত্র চাঁদে বসিয়ে এসেছেন, তাদের মাধ্যমে চাঁদ সম্বন্ধে যে সব নতুন তথ্য ধরা পড়ল, সে আলোচনায় আমরা খানিক পরেই আসব।

চাঁদে কাজ শেষ

চাঁদের মাটিতে অভিযাত্রীদের আর একটি কাজই বাকি রয়েছে। সে হল চাঁদের পাথর ও মৃত্তিকার বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করা। সে কাজটা এবারে তাঁরা শুরু করেন। চাঁদের জমির তলা থেকে শিলার-নমুনা সংগ্রহ করার জন্যে একটি ফাঁপা দণ্ডকে ভেতরে বসানোর জন্যে তার ওপরে হাতুড়ির ঘা মেরে চলেন অলড্রিন। মাত্র বার সেণ্টিমিটার নিচেই শক্ত কঠিন বস্তুর সন্ধান মেলে, যার ভেতর দিয়ে দণ্ডটাকে আর ঢোকানো যায় না কোনমতেই। চাঁদের জমিটা ওপর থেকে শক্ত হতে হতে এখানে এসেই যেন লোহার মত দৃঢ়তাকে লাভ করে বসেছে।

চাঁদের বস্তুর এই আশ্চর্য দৃঢ়তার কারণের কথা ভাবতে গিয়ে অভিযাত্রীদের মনে হয়েছে, চাঁদে বাতাস না থাকার ফলে চাঁদের বস্তু যেমন একদিকে ঘন-সন্নিবদ্ধ হবার সুযোগ পেয়েছে, তেমনি উল্কাদের ক্রমাগত সংঘাতের ফলে যে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়েছিল চাঁদের জমির ওপরে, তাই আজ হয়ত তার এই কঠিন রূপের মধ্যে ধরা পড়ছে।

চাঁদে যেহেতু কোন জল নেই, বাতাস নেই—তাই পৃথিবীর মত তার কোন ক্ষয় নেই। দিন ও রাতের প্রচণ্ড তারতম্যের ফলেই চাঁদে যেটুকু ক্ষয় হয়ে থাকে। চাঁদে শিলা ও মৃত্তিকা তাই বহু জায়গায় হয়ত তার জন্মলগ্ন থেকে আদ্যিকালের বদ্যিবুড়োর মত একই অবস্থার মধ্যে রয়েছে। এই শিলা ও মৃত্তিকার নমুনা বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা যেমন চাঁদের জন্ম ও বিবর্তন সম্বন্ধে বহু রহস্যের ওপর আলোকলাভ করার আশা রাখেন, তেমনি পৃথিবীর জন্ম ও বিবর্তন সম্বন্ধেও এই অনুসন্ধান থেকে অনেক কিছু জানার সম্ভাবনা রয়েছে বলে তাঁদের বিশ্বাস। এই জন্যেই চাঁদ থেকে মৃত্তিকা ও শিলার নমুনা সংগ্রহ করাটা অ্যাপোলো-১১-র চন্দ্র-অভিযানের সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য বলে অভিহিত হয়েছিল।

চাঁদের মাটির কাছ থেকে এবারে অভিযাত্রীরের বিদায় গ্রহণ করতে হবে। তাঁদের অক্সিজেনের সঞ্চয়ের মেয়াদ ছিল চার ঘণ্টার মত। যদিও পুরো সময়টা পেরিয়ে যায় নি, তাহলেও বিজ্ঞানীরা অভিযাত্রীদের নিরাপত্তার খাতিরে কোন সুযোগ নিতে রাজি নন।

অলড্রিন 'সূর্যের বাতাস' পরীক্ষার চাদরটিকে গুটিয়ে নেন। তারপরে তিনি উঠে যান চন্দ্রযানের ওপরের অংশে। আর্মস্ট্রং নিচে থেকে আবার রজ্জুপথের (রোপওয়ে) সাহায্যে অ্যালুমিনিয়ামের চাদরটি, চাঁদের পাথর ও মৃত্তিকা, ক্যামেরা—একটি একটি করে এই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো অলড্রিনের হাতে তুলে দেন। এরপর আর্মস্ট্রং উঠে আসেন ওপরে।

চন্দ্রযানের কেবিন-ঘরে প্রবেশ করার পর অভিযাত্রীরা তাঁদের অক্সিজেন ও অন্যান্য জৈবিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর জন্যে চন্দ্রযানের নিজস্ব ব্যবস্থার সঙ্গে তাঁদের মহাকাশ-পোশাকের ব্যবস্থার সংযোগ সাধন করেন। চাঁদ থেকে অভিযাত্রীরা প্রায় ৫০ পাউণ্ডের (পৃথিবীর ওজন অনুযায়ী) মত পাথর ও মৃত্তিকা সংগ্রহ করেছেন। এই বাড়তি ওজনের ভারসাম্য হিসেবে তাঁরা তাঁদের পিঠের বোঝাটি এবং আরো বেশ কিছু জিনিসপত্র চাঁদের জমির ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেন। চাঁদের জমির ওপর টেলিভিশন ক্যামেরা এবং আরো বহু জিনিসই পড়ে রইল।

চাঁদের জমির ওপর যে সব বস্তুকে ব্যবহার করেছেন অভিযাত্রীরা, নিতান্ত প্রয়োজনীয় দু-একটি ছাড়া সবগুলোকেই সেখানে ফেলে রেখে আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। এসব বস্তুর সঙ্গে যদি চাঁদের কিছু বীজাণু গিয়ে পৃথিবীতে হাজির হয়, তাহলে পৃথিবীর বীজাণুদের জীবনের ক্ষেত্রে তা কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে, সেটা বিজ্ঞানীদের সঠিকভাবে জানা নেই। তাই এই সাবধানতা। চন্দ্র-অভিযাত্রীরা ফিরে আসার পর ওঁরা নিজেরাও চাঁদের বীজাণুর দ্বারা সংক্রামিত হয়েছেন কি না তারও পরীক্ষা চলবে ২১ দিন ধরে।

এবারে চন্দ্রযানের দরজা বন্ধ করে দিয়ে অভিযাত্রীরা তাঁদের কেবিন-ঘরে আবার বাতাসের প্রয়োজনীয় চাপ তৈরি করে তোলেন। তাঁরা তাঁদের হেলমেট এবং হাতের দস্তানা খুলে ফেলেন। চাঁদের বাইরের পরিবেশের সঙ্গে চন্দ্রযানের কেবিন-ঘরের আর কোন যোগাযোগ নেই। এ এখন এক সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় জগত, যেখানে মানুষের প্রতিটি জৈবিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা রয়েছে।

চাঁদের জমিতে মানুষের প্রথম অভিযান শেষ হল। আর্মস্ট্রং চাঁদের জমিতে কাটিয়েছিলেন ২ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট। অলড্রিন কাটিয়েছিলেন ২ ঘণ্টা ১৭ মিনিট। যে ইতিহাস এঁরা সৃষ্টি করে এলেন চাঁদের মাটিতে, তার বিস্ময়ের চমক থেকে পৃথিবীর মানুষ তখনো নিজেদের মুক্ত করে নিতে পারেন নি।

ফেরার পালা

অভিযাত্রীরা চাঁদের মাটিতে সবশুদ্ধ ছিলেন ২২ ঘণ্টার মত। অভিযান-পর্বের সমাপ্তির পর চাঁদের কক্ষপথে পৌঁছে মূল মহাকাশযান অ্যাপোলোর কমাণ্ড মডিউলের সঙ্গে মিলিত হতে হবে এবার।

চন্দ্রযানের নিচেকার অংশটির কাজ শেষ হয়েছে। সেটিকে ক্ষেপণ-মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করে অভিযাত্রীরা ওপরের অংশটিকে রকেট-ব্যবস্থার সাহায্যে পরিচালিত করে, চাঁদের অভিকর্ষ-বলের টানের বিরুদ্ধে ছুটে চাঁদের কক্ষপথে পাড়ি জমাবার মত প্রয়োজনীয় বেগ তৈরি করেন। চন্দ্রযান ঘণ্টায় প্রায় ৪৯০০ কিলোমিটার বেগে চাঁদের চারপাশে এক উপবৃত্তাকার কক্ষপথে প্রতিষ্ঠিত হয়, চাঁদের জমি থেকে যার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দূরত্ব ছিল যথাক্রমে ৮৮ ও ১৭ কিলোমিটার। চন্দ্রযানের যাত্রীরা তাঁদের যানটিকে এবারে কমাণ্ড মডিউলের কক্ষপথে নিয়ে আসেন, যে বস্তুটি চাঁদের জমির প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে এক বৃত্তাকার কক্ষপথে চাঁদকে পরিক্রমা করে চলেছে।

কমাণ্ড মডিউল থেকে চন্দ্রযানের দূরত্ব ক্রমেই কমে আসে এবং অবশেষে

দুটি যানের চালক কলিন্স ও অলড্রিন অতি নিপুণভাবে পরিচালনা করে তাদের মহাকাশ যান দুটিকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করেন।

আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন চাঁদের শিলা ও মৃত্তিকা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু নিয়ে সুড়ঙ্গপথে ফিরে আসেন তাঁদের পুরোনো আশ্রয়স্থলে। চন্দ্রযান অতি বিশ্বস্ততার সঙ্গে এ পর্যন্ত তার দায়িত্বকে পালন করেছে। তার কাজ এখন শেষ। অভিযাত্রীরা তাকে ঠেলে দেন চাঁদের একটি কক্ষপথে। সেখানে চন্দ্র-পরিক্রমার কাজে তার নতুন জীবন শুরু হবে।

অ্যাপোলো ৬০ ঘন্টায় চাঁদকে সর্বমোট ৩০ বার পরিক্রমা সম্পূর্ণ করার পর, চাঁদের উল্টো পিঠের ওপর দিয়ে যাবার সময় অভিযাত্রীরা অ্যাপোলোর সার্ভিস মডিউলের সঙ্গে যুক্ত মূল এঞ্জিনকে আবার চালু করে তোলেন। পৃথিবীর দিকে যাত্রা শুরুর জন্যে চাঁদের অভিকর্ষ-বলের টানকে কাটাবার মত প্রয়োজনীয় বেগকে এবারে অর্জন করতে হবে। এই বেগের পরিমাণ হল ঘণ্টায় প্রায় ৮৫০০ কিলোমিটার। চাঁদ থেকে বেরোবার নিষ্ক্রমণ-বেগ বলা যায় একে।

পৃথিবীর দিকে

ঘণ্টায় ৮৫০০ কিলোমিটারের নিষ্ক্রমণ-বেগ নিয়ে চাঁদের কাছে বিদায় জানিয়ে অ্যাপোলো ছুটে চলে পৃথিবীর দিকে। চাঁদ থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসতে সময় লেগেছিল ৬০ ঘন্টা। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার আগে অভিযাত্রীরা অ্যাপোলোর সার্ভিস মডিউলটিকে বিচ্ছিন্ন করে ছেড়ে দেন। সেটা চলে যায় সূর্যের দিকে। অ্যাপোলোর বেগ এখন এসে দাঁড়িয়েছে ঘণ্টায় প্রায় ৪০০০০ কিলোমিটার। সেই বেগ নিয়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের সমস্যা সম্বন্ধে অ্যাপোলো-৮ মহাকাশ অভিযান প্রসঙ্গে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

২৪শে জুলাই তারিখে অ্যাপোলোর তিন অভিযাত্রীকে নিয়ে কমাণ্ড মডিউল নিরাপদে সাগরের জলে এসে অবতরণ করে। সমগ্র পৃথিবীর মানুষ অ্যাপোলোর তিন অভিযাত্রীর বীরত্ব ও সাহসের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

একুশ দিন অ্যাপোলোর অভিযাত্রীদের সম্পূর্ণভাবে আলাদা করে রাখা হয়। চাঁদে যদি কোন বীজাণু থাকে, তাহলে তার দ্বারা অভিযাত্রীরা কোনরকমভাবে সংক্রামিত হয়েছেন কি না সেটা যেমন বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখবেন, তেমনি চাঁদের বীজাণুদের দ্বারা পৃথিবীর প্রাণীজগতও যাতে কোনরকমভাবে বিপন্ন না হয়ে পড়ে সে ব্যাপারেও তাঁরা সতর্কতা অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন।

এগার দিন বাদে অভিযাত্রীরা মুক্তি পেলেন। বোঝা গেল, তাঁরা কোনরকম

ভাবে সংক্রামিত হন নি। মানুষের প্রথম চন্দ্র-অভিযানের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি ঘটল এভাবে।

লুনা-১৫

অ্যাপোলো-১১ মহাকাশ-অভিযান শুরু হবার তিনদিন আগে ১৩ই জুলাই সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা চাঁদের দিকে লুনা-১৫ নামে একটি স্বয়ংক্রিয় মহাজাগতিক স্টেশনকে পাঠান। লুনা-১৫-র অভিযান সারা পৃথিবীতে এক বিরাট কৌতূহল ও উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল।

অ্যাপোলো-১১ অভিযানের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য ছিল—মানুষ চাঁদ থেকে শিলা ও মৃত্তিকার নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে। অনেকেই দৃঢ়ভাবে অনুমান করতে শুরু করলেন যে লুনা-১৫-কে চাঁদে পাঠানোর পেছনে সোভিয়েট রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের নিশ্চয়ই একটা রহস্যপূর্ণ উদ্দেশ্য রয়েছে। ও'রা বস্তুটিকে নিরাপদে চাঁদের মাটিতে নামিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাঁদের শিলার কিছু নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে অ্যাপোলো-১১-র আগেই ওকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনবেন।

এভাবে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা আমেরিকার বিজ্ঞানীদের ওপর টেক্কা দিয়ে এ-কথাটাই নাকি প্রমাণ করতে পারবেন যে, বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় করে চাঁদে মানুষকে পাঠিয়ে যে কাজটা করা হচ্ছে, তা শুধু যন্ত্রপাতি-সমন্বিত একটি চন্দ্রযানকে পাঠিয়েও সম্ভব হতে পারে।

কিন্তু ২১শে জুলাই লুনা-১৫ যখন চাঁদের জমির ওপরে আছড়ে নামল, তখন পৃথিবীর বহু মানুষই নিরাশ হলেন। তাঁরা প্রশ্ন তুললেন, তাহলে শুধু শুধু নাটকীয়ভাবে লুনা-১৫-কে অ্যাপোলো অভিযানের কিছুদিন আগে চাঁদে পাঠানো হল কেন।

এ প্রশ্নের জবাবটা খুবই সহজ। পৃথিবী থেকে কোন বস্তুকে চাঁদে পাঠাতে গেলে দেখতে হবে চাঁদ পৃথিবী থেকে সঠিক দূরত্বে এবং জায়গায় অবস্থান করছে কি না। কাজেই দুটি দেশ যদি পৃথিবী থেকে মহাকাশে চাঁদের একটি সঠিক অবস্থানের সময় ওখানে কোন অভিযান করতে চান তাহলে খুব কাছাকাছি সময়ের মধ্যেই ঘটনা দুটো ঘটবে। নভোমণ্ডলীয় গতিবিদ্যার (celestial mechanics) অমোঘ নিয়মের জন্যেই ঘটনাটা এভাবে ঘটছে। এটাকে কারুর পক্ষেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

১৩

চাঁদের নতুন খবর

অ্যাপোলো-১১-র অভিযাত্রীরা চাঁদে যে ভূকম্প-নির্দেশক যন্ত্রটি বসিয়ে এসেছিলেন তার কাছ থেকে বেশ কিছু সঙ্কেত বিজ্ঞানীরা পেয়েছিলেন। সেই তথ্য এবং অভিযাত্রীরা যে শিলা এবং মৃত্তিকার নমুনা চাঁদ থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলেন, তার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে চাঁদের সম্পূর্ণ নতুন একটা ছবি ধরা পড়ল।

চাঁদের গঠন

ভূকম্প-নির্দেশক যন্ত্রটির কাছ থেকে পাওয়া সঙ্কেতের মাধ্যমে ধরা পড়েছে যে, পৃথিবীর যেমন একটি শীতল ত্বক, তার নিচে একটি তপ্ত গদ্রুমণ্ডল (mantle) এবং একেবারে কেন্দ্রে তপ্ত ধাতব শিলার একটি কেন্দ্রমণ্ডল রয়েছে, চাঁদের আভ্যন্তরীণ গঠনের মধ্যে সে-জাতীয় কোন স্তরবিন্যাস আদৌ নেই। গোড়ার দিকে যন্ত্রটির ভুলভাবে কাজ করার ফলে এর ঠিক উল্টো খবরটাই ধরা পড়েছিল, অর্থাৎ চাঁদেরও নাকি পৃথিবীর মত একটি স্তরবিন্যাস রয়েছে। পরে যন্ত্রটি সঠিকভাবে কাজ করবার ফলে আসল খবরটি জানা যায়।

আরো ধরা পড়ে, চাঁদের সমগ্র অভ্যন্তরভাগটা ঠাণ্ডা—তাপের কোন বালাই সেখানে নেই। চাঁদের সর্বাঙ্গ জুড়ে শুধু শিলার রাজত্ব, কিন্তু এই শিলাময় দেহটা ভাঙা এবং ফাটলে পূর্ণ। চাঁদের অনেক ফাটল ভেতরের দিকে বহুদূর পর্যন্ত নেমে গেছে।

পৃথিবীতে ভূমিকম্প হলে যে ধরনের সঙ্কেত পাওয়া যায়, চাঁদের ওপর বসানো ভূকম্প-নির্দেশক যন্ত্রটির সঙ্কেতগুলো কিন্তু মোটেই সেরকম নয়। এরা অনেক বেশি ছড়ানো এবং খুব ছোট মাপের। এ থেকে বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন, হয় চাঁদে প্রচণ্ড আলোড়ন বা উল্কাপিণ্ডের সংঘাত-জাতীয় ভূকম্প তৈরির কোন ঘটনা ঘটছে না, অথবা চাঁদের দেহটা একেবারে ভেঙে যাওয়া বস্তুর সমবায়ে তৈরি বলে তা কম্পনগুলোকে আত্মসাৎ করে নিয়ে অবিন্যস্তভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

চাঁদে কোন ভূকম্প বা উল্কাপিণ্ডের সংঘাত ঘটছে না—এই সম্ভাবনাটার

ওপরেই বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। চাঁদ থেকে কম্পনের যে সঙ্কেতগুলো পাওয়া গেছে, তা চাঁদের শিলাস্তরের মধ্যে ফাটলের দেওয়াল দিয়ে গড়িয়ে-পড়া শিলার সংঘাত থেকেও তৈরি হয়ে থাকতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন।

চাঁদের দেহটা এমনভাবে ভেঙে গেল কী করে, সে প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বিশেষজ্ঞেরা বলছেন যে, চাঁদের শৈশব অবস্থায় ক্রমাগত উল্কাপিণ্ডের বিপুল সংঘাতের ফলেই হয়ত সেটা ঘটে থাকবে। চাঁদের ভাঙা চেহারা থেকে আর একটা অনুমান বোধহয় করা যায় যে, চাঁদ হয়ত কখনোই পৃথিবীর গড়ার প্রথম যুগের মত একেবারে তরল অবস্থায় ছিল না।

চাঁদের যে ধুলো অভিযাত্রীরা নিয়ে এসেছিলেন তাকে বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, বস্তু এবং গঠনের বিচারে পৃথিবীর মৃত্তিকার সঙ্গে তার বিশেষ কোন মিল নেই। চাঁদের ধুলোর শতকরা ৫০ ভাগ হল কাঁচ। পৃথিবীর দুই অভিযাত্রী আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন চাঁদে আসলে হাঁটছিলেন কালো কাঁচের পাতলা স্তরের ওপর দিয়ে। এরই জন্যে তাঁরা বলেছিলেন, চাঁদে পা ফেলবার সময় পা-টা যেন মাঝে মাঝে পিছলে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল।

পৃথিবীতে উল্কাপিণ্ডের সংঘাতের জায়গাগুলোতে অল্প কিছু কাঁচের সন্ধান পাওয়া যায়। কাজেই চাঁদের জমিতে যে কিছু কাঁচ পাওয়া যাবে সেটা আগেই অনুমান করা গিয়েছিল। কারণ চাঁদে অতীতে উল্কাপিণ্ডের সংঘাত অজস্র পরিমাণেই ঘটেছে।

চাঁদের শিলা

চাঁদের 'প্রশান্ত সাগরে'র এলাকা থেকে যে শিলার নমুনা অভিযাত্রীরা নিয়ে এসেছেন, রাসায়নিক গঠনের বিচারে পৃথিবীর পরিচিত কোন শিলার সঙ্গেই তার বিশেষ কোন মিল নেই। চাঁদের শিলার সঙ্গে পৃথিবীর ব্যাসল্ট জাতীয় আগ্নেয় শিলার কিছুটা মিল থাকলেও বহু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। রাসায়নিক গঠনের মধ্যে এই পার্থক্যের কারণ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা বলেছেন যে পৃথিবী ও চাঁদের অভিকর্ষ-বলের তারতম্যই হয়ত এর মূলে রয়েছে।

কিভাবে যে চাঁদের শিলা গড়ে উঠেছে, সে সম্বন্ধে এখনো কোন নিশ্চিত ধারণা পোষণ করা যাচ্ছে না। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও চাঁদের জীবনের প্রথম পর্বে উল্কাপিণ্ডের সংঘাত, দুটি ঘটনারই মিলিত প্রভাবকে অথবা চাঁদের কেন্দ্রে অপরিচিত কোন তাপীয় প্রক্রিয়া—এদের যে-কোন একটিকেই চাঁদের শিলার গঠনের সম্ভাব্য কারণ হিসেবে অনুমান করা যেতে পারে।

চাঁদের শিলার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে টাইটেনিয়াম পাওয়া গেছে। এ ছাড়া ক্রোমিয়াম, জারকোনিয়াম এবং ইট্রিয়ামও পাওয়া গেছে যথেষ্ট পরিমাণে।

এই মৌলিক পদার্থগুলোর গলনাঙ্ক (melting point) স্বতন্ত্রভাবে অত্যন্ত বেশি, যেটা অবশ্য মিশ্রিত অবস্থায় খানিকটা কমে আসে।

টাইটেনিয়াম পৃথিবীতে একটি অতি দুষ্প্রাপ্য মৌলিক পদার্থ। এ খুব হালকা, কিন্তু ভয়ানক শক্ত। তাই বিমান এবং রকেট, মহাকাশযান প্রভৃতি তৈরির কাজে একে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। অন্য সব খনিজের মধ্যে চাঁদে টাইটেনিয়াম যে কেন এত বেশি পরিমাণে পাওয়া গেল, তা একটা রহস্যের ব্যাপার সন্দেহ নেই।

চাঁদের শিলার মধ্যে দুটি খনিজ পদার্থ পাওয়া গেছে, যেগুলো হল অ্যাপেটাইট ও ট্রয়লাইট। বিশুদ্ধ ট্রয়লাইট হল ফেরাস সালফাইড। একে পৃথিবীতে স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় না, একমাত্র উল্কাপিণ্ডের মধ্যেই এর সন্ধান মেলে।

চাঁদের শিলার মধ্যে কিন্তু কোন সোনা রূপো বা প্ল্যাটিনাম পাওয়া যায় নি। এই মহার্ঘ মৌলিক পদার্থগুলো চাঁদে বিশেষ নেই বলেই মনে হচ্ছে।

সীসে, বিসমাথ, সোডিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ, যাদের গলনাঙ্ক নিচের দিকে, চাঁদের শিলার নমুনার মধ্যে তাদের এপর্যন্ত কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নি।

চাঁদের শিলার মধ্যে কি কি উপাদান রয়েছে, সেটা জানার জন্যে বিজ্ঞানীরা স্পেকট্রোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে অনুসন্ধান চালান। একটি প্রিজম্ যেমন সূর্যের আলোকে সাতটি রঙে ভাগ করে ফেলে, তেমনি একটি স্পেকট্রোমিটার যন্ত্র একটি বস্তুর নমুনা থেকে প্রতিফলিত আলোকে বিশ্লেষণ করে তার রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে অনেক তথ্যই জানাতে পারে।

চাঁদের শিলার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আর্গন গ্যাস পাওয়া গেছে। পৃথিবীর ত্বকের খুব প্রাচীন শিলার মধ্যেই আর্গন গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়।

চাঁদের শিলার বয়স নিরূপণের ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা পটাসিয়াম-আর্গন কাল নিরূপণের পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়েছিলেন। এই পদ্ধতির মোদ্দা কথাটা হল, পটাসিয়ামের সঙ্গে দুষ্প্রাপ্য গ্যাস আর্গন-৪০-এর অনুপাতকে নির্ণয় করা। পটাসিয়ামের একটি তেজস্ক্রিয় রূপ হল পটাসিয়াম-৪০। পটাসিয়াম-৪০-এর ভর ক্রমাগত আলফা, বিটা ও গামা রশ্মিতে রূপান্তরিত হয়ে শেষ পর্যন্ত বস্তুটি আর্গন-৪০-এ রূপান্তরিত হয়। যে বস্তুর মধ্যে পটাসিয়াম-৪০ রয়েছে, তার মধ্যে আর্গন-৪০-ও থাকবেই। আর্গন-৪০-এর পরিমাণ যদি খুব কম হয়, তাহলে

বুঝতে হবে বস্তুটি বয়সের বিচারে খুবই নবীন। আর আর্গন-৪০-এর পরিমাণ যদি খুব বেশি হয়, তাহলে বস্তুটি অনেক প্রাচীন বলে ধরে নিতে হবে।

পটাসিয়াম-আর্গন পদ্ধতির মাধ্যমে ধরা পড়ল যে, চাঁদ থেকে অভিযাত্রীরা যে শিলার নমুনা নিয়ে এসেছেন তার বয়স ২৫০ কোটি থেকে ৩৫০ কোটি বছরের মধ্যে। অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, এই শিলা ঐ সুদীর্ঘ কাল ধরেই চাঁদের জমির ওপর পড়ে আছে—অভিযাত্রীরা যে জায়গা থেকে ওদের সংগ্রহ করেছিলেন, সম্ভবত সে জায়গাতেই।

চাঁদের শিলা সংগ্রহের ক্ষেত্রটি ছিল একটি মেরিয়া বা জমাট-বাঁধা লাভার সমুদ্রের অংশ। মেরিয়ার তুলনায় চাঁদের মহাদেশরূপী উচ্চভূমি বয়সের বিচারে অনেক বেশি প্রাচীন। তাই বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, চাঁদের উচ্চভূমিতে সন্ধান করলে এমন শিলার সন্ধান পাওয়া বিচিত্র নয় যাদের বয়সটা চাঁদেরই সমান, অর্থাৎ, প্রায় ৪৫০ কোটি বছরের কাছাকাছি।

পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রাচীন যে শিলার সন্ধান আমরা এ পর্যন্ত পেয়েছি তার বয়স হল ৩৩০ কোটি বছর। কিন্তু এই শিলাও রয়েছে মাটির অনেক গভীরে। পৃথিবীর বয়সের সমান, অর্থাৎ ৪৫০ কোটি থেকে ৫০০ কোটি বছর বয়সের প্রাচীন শিলার সন্ধান বিজ্ঞানীরা আজও পৃথিবীর কোথাও খুঁজে পান নি।

চাঁদের ৩৫০ কোটি বছরের প্রাচীন শিলা জমির ওপরে পড়ে আছে উন্মুক্তভাবে ; শুধু ওদের বয়সটা নির্ণয় করে ফেলার অপেক্ষা আর কি।

বায়ুহীন, জলহীন চাঁদের জমির কোন ক্ষয় নেই, পরিবর্তন নেই। চাঁদ, পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহের প্রথম জীবনের ইতিহাসের পর্যালোচনার জন্যে চাঁদের জমিটা হল তাই প্রকৃতির হাতে-গড়া এক চমৎকার সুন্দর গবেষণাগার। এই ধারণা পরে অবশ্য পালটাতে হয়েছে।

চাঁদের শিলা ও মৃত্তিকার গবেষণার মধ্য দিয়ে বয়সের বিচারে চাঁদের জমির প্রাচীনত্বের যে আবিষ্কার, বিজ্ঞানীরা তাকেই চাঁদের অনুসন্ধান-কাজের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ঘটনা বলে অভিহিত করেছেন।

চাঁদে জল ও প্রাণ

চাঁদের শিলা ও মৃত্তিকার মধ্যে তন্ন-তন্ন করে অনুসন্ধান করেও বিজ্ঞানীরা একফোঁটা জলের সন্ধান পান নি। পৃথিবীতে সবচেয়ে রুক্ষ কঠিন শিলার মধ্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে অতি সামান্য পরিমাণে হলেও ছিটেফোঁটা জল পাওয়া যায়। কিন্তু চাঁদে জমির ওপরে বর্তমানে কোথাও কোন জল নেই।

শিলার দল যেদিন থেকে রাজত্ব করছে চাঁদে, সেদিন থেকেই সেখানে কোন জল নেই।

চাঁদের জমির ওপর জল না থাকার সবচেয়ে বড় কারণ হল যে চাঁদে কোন বাতাস নেই এবং চাঁদের অভিকর্ষ-বলের জোরটাও খুব কম বলে সে তার জলকে (যদি কোনদিন সেখানে জল থেকে থাকত) ধরে রাখতে পারে নি। তবে, বিজ্ঞানীদের একটা আশা ছিল যে হয়ত চাঁদের ভেতরে কোথাও বহুদিনের প্রাচীন জল জমে গিয়ে বরফের আকারে রয়েছে। কিন্তু আজ বোধহয় তাঁদের সে সব আশাই ত্যাগ করতে হবে।

চাঁদে জলের এই সম্পূর্ণ অভাব থেকে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয় যে, চাঁদের জীবনের সুদীর্ঘ কাল ধরে কোনদিনই সেখানে কোন প্রাণের উদ্ভব হয় নি।

চাঁদে কোন প্রাণের অস্তিত্বের প্রশ্ন সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত হবার জন্যে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বহু গাছপালা এবং প্রাণীদেহকে চাঁদের মৃত্তিকা এবং ধুলোর দ্বারা সংক্রামিত করেছিলেন। এর ফলে গাছপালাগুলোর স্বাভাবিক বৃদ্ধির মধ্যে কোন ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা যায় নি। যে হাজার হাজার প্রাণীকে চাঁদের মৃত্তিকা খাওয়ানো হয়েছিল বা তার দ্বারা সংক্রামিত করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে ছিল ২৯০টি ইঁদুর ও তাদের সন্ততি, ৩০টি জাপানী কাঠবেড়ালি, মাছি, আরশোলা প্রভৃতি কয়েক হাজার পোকা, মাছ, ঝিনুক এবং শামুক। সমান-সংখ্যক প্রাণীকে স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে রাখা হয়েছিল, যাতে তাদের অবস্থার সঙ্গে চাঁদের ধুলোর দ্বারা সংক্রামিত প্রাণীগুলোর অবস্থার তুলনা করা চলে।

এ-পর্যন্ত চাঁদের ধুলোর দ্বারা সংক্রামিত একটি প্রাণীর মধ্যেও সামান্যতম অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ঘটতে দেখা যায় নি। এ থেকে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে হয় যে, চাঁদে বীজাণুজাতীয় অতি নিম্নশ্রেণীর প্রাণেরও অস্তিত্ব নেই।

পৃথিবী ও চাঁদের দূরত্ব

লেসার আলোর যে প্রতিফলকটিকে অ্যাপোলো-১১-র অভিযাত্রীরা চাঁদের জমির ওপর বসিয়ে এসেছিলেন, ১৯৬৯ সালের ১লা আগস্ট তারিখে সেটিকে কাজে লাগানো হল। ঐদিন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লিক্ মানমন্দির থেকে বিজ্ঞানীরা পৃথিবী ও চাঁদের গড়পড়তা ৩৬৫, ১৯৬ কিলোমিটার দূরত্বের সঠিক পরিমাপের এক পরীক্ষা শুরু করলেন।

মানমন্দিরের ২৫৪০ মিলিমিটার (১০০ ইঞ্চি) ব্যাসবিশিষ্ট দূরবীনের ওপর একটি লেসার গান বসিয়ে তা থেকে বিজ্ঞানীরা লেসার আলোক রশ্মি চাঁদের

দিকে ছুঁড়ে মারলেন। ঐ আলো চাঁদের জমির ওপর বসানো প্রতিফলক থেকে প্রতিফলিত হয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে এল। লেসার আলোর যাতায়াতের সময়ের পরিমাপ থেকে পৃথিবী ও চাঁদের দূরত্বের এ পর্যন্ত সবচেয়ে সূক্ষ্ম একটি হিসেব পাওয়া গেল। দূরত্বের একেবারে সঠিক পরিমাপের সঙ্গে তুলনায় এই হিসেবের তারতম্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ৪৫ মিটার (১৫০ ফুট)। ইতিপূর্বে সংগৃহীত পৃথিবী ও চাঁদের দূরত্বের একই পরিমাপের ক্ষেত্রে এই তারতম্যের পরিমাণ ছিল ১·৫ কিলোমিটারের মত।

চাঁদের অতীত ইতিহাস

চাঁদের ধুলোর মধ্যে কাঁচের প্রাচুর্য, চাঁদের শিলার মধ্যে তেজস্ক্রিয়তার আধিক্য, চাঁদের জমির অন্য অঞ্চলের তুলনায় চাঁদের শিলার অতি উচ্চ ঘনত্ব, চাঁদের 'প্রশান্তি সাগরে'র শিলার ৩৫০ কোটি বছর বয়স—এই ব্যাপারগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছলেন যে, চাঁদের জন্ম ও বিবর্তনের ইতিহাস পৃথিবীর ইতিহাসের তুলনায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

চাঁদের জন্ম যে আদৌ পৃথিবী থেকে হয় নি, অ্যাপোলো-১১- চন্দ্র-অভিযানের তথ্যগুলো যেন সেই ধারণাকেই স্পষ্ট করে তুলছিল। চাঁদের জন্ম ঠিক কিভাবে হয়েছিল, সে সম্বন্ধে এখনো সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভবপর নয়। তবে ভবিষ্যতে বোধহয় দুটি তত্ত্বের মধ্য থেকে একটিকে বিজ্ঞানীদের বেছে নিতে হবে। সে দুটি হল—হয় মহাকাশের ধুলোকণা এক জায়গায় জড়ো হয়ে হয়ে পৃথিবী ও চাঁদের জন্ম হয়েছিল একই মহাজাগতিক পদ্ধতিতে, তা না হলে পৃথিবী কোন সময়ে সৌরজগতে ভ্রাম্যমাণ চাঁদকে আপন অভিকর্ষের জালে বন্দী করে নিয়েছিল। (চাঁদের জন্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।)

বিজ্ঞানীরা আনুমানিকভাবে বলছেন, চাঁদের জীবনের প্রথম ১৫০ কোটি বছর ধরে চাঁদে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এবং উল্কাপিণ্ডের সংঘাত বিপুল পরিমাণে ঘটেছিল। কিন্তু গত ৩০০ কোটি বছর ধরে চাঁদের ত্বক এবং অভ্যন্তরভাগ সম্পূর্ণ শান্ত অবস্থায় রয়েছে। চাঁদের উপরিভাগ তাই বহুদিনের প্রাচীন, স্পর্শবিহীন, শান্ত একটা ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরছে।

চাঁদের এ ছবির সঙ্গে পৃথিবীর কোন মিল নেই। আমাদের মাতা বসুন্ধরা ভূতাত্ত্বিক বিচারে বহু কোটি বছর আগে যেমন সক্রিয় ছিল, আজও ঠিক তেমনই রয়েছে। তার দেহ জুড়ে আজও চলেছে পর্বত গড়ার কাজ, আগ্নেয় প্রক্রিয়া—শান্ত হতে তার এখনো বহুদিন বাকি।

১৪

সইয়ুজ ও অ্যাপোলো-১২

অ্যাপোলো-১১ চন্দ্র-অভিযানের নাটকীয় ঘটনার পর স্বভাবতই পৃথিবীর মানুষ মহাকাশ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরো চমকপ্রদ ঘটনার অপেক্ষায় ছিলেন। পরবর্তী অ্যাপোলো-১২ চন্দ্র-অভিযানের দিন পর্যন্ত এর মধ্যে স্থির হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা মহাকাশে এক নতুন পরীক্ষার আয়োজন করে বসলেন। একাধিক মহাকাশযাত্রী ও মহাকাশযান এই পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেছিল।

১৯৬৯ সালের ১১ই অক্টোবর তারিখে সইয়ুজ-৬ নামে একটি মহাকাশযানে জির্য়জি সোনিন এবং ভ্যালেরি কুবাসভ নামে দু-জন মহাকাশযাত্রীকে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর কাছাকাছি এক কক্ষপথে প্রতিষ্ঠা করলেন। এর পরে ১৩ই অক্টোবর মহাকাশযান সইয়ুজ-৭-এ তাঁরা আরো তিনজন অভিযাত্রীকে পাঠালেন মহাকাশে। এঁরা হলেন আনাতলি ফিলিপচেঙ্কো, ভ্লাদিস্লাভ ভলকভ এবং ভিক্টর গর্‌বাটকভ। মহাকাশে সইয়ুজ-৬-এর অভিযাত্রীদের সঙ্গী হয়ে এলেন এঁরা। বিস্ময়ের চমক কাটতে না কাটতেই সইয়ুজ-৮ উঠে এল মহাকাশে—১৪ই অক্টোবর তারিখে। এই মহাকাশযানের যাত্রী ছিলেন ভ্লাদিমার সাটালভ এবং অ্যালেক্সি এলিসিয়েভ।

একসঙ্গে তিনটি মহাকাশযানে সাতজন মহাকাশযাত্রীর পৃথিবী পরিক্রমার কাজ শুরু হল। মহাকাশে এ ছিল একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল, মহাকাশে বায়ুহীন এবং ওজনবিহীন অবস্থায় ওয়েল্‌ডিংয়ের পরীক্ষা করা, দুটি মহাকাশযানের মধ্যে সংযুক্তি সাধন এবং পরস্পরের খুব কাছাকাছি থেকে তিনটি মহাকাশযানের একসঙ্গে পৃথিবী পরিক্রমার গতিবিধির সমস্যাবলী পরীক্ষা করা।

সইয়ুজ-৭ ও সয়ুজ-৮-এর মধ্যে সংযুক্তিসাধন করা হয়। সইয়ুজ-৬ থেকে দুটি মহাকাশযানের পারস্পরিক গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হয়। সইয়ুজ ৬-এ অবশ্য সংযুক্তির কোন ব্যবস্থা ছিল না।

মহাকাশে ওয়েল্‌ডিংয়ের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে কয়েকটি মহাকাশ-

যানকে একসঙ্গে যুক্ত করে স্থায়ী মহাকাশ-স্টেশন তৈরির প্রাথমিক পরীক্ষা করা হল।

সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের এই অভিযানটির এক বিরাট তাৎপর্য ছিল। মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরবর্তী বড় কাজটি হল একটি স্থায়ী মহাকাশ স্টেশন তৈরি করা। ঐ স্টেশন থেকে শুধু যে পৃথিবী সম্বন্ধে নানা ধরনের পরীক্ষা এবং গবেষণা কাজ চালিয়ে যাওয়া যাবে তাই নয়, ভবিষ্যতে দূরবর্তী গ্রহজগতে পাড়ি জমাতে গেলে মহাকাশ স্টেশনের ভূমিকা হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবী থেকে মহাকাশ স্টেশন পর্যন্ত হবে যাত্রার প্রথম ধাপ। সেখানে নতুন করে জ্বালানি সংগ্রহ করে নিয়ে আবার যাত্রা শুরু হবে। পৃথিবী থেকে এক দৌড়ে চাঁদে বা গ্রহজগতে পাড়ি জমানোর যে অসুবিধেগুলো রয়েছে, সেগুলো তাহলে আর মাথা তুলে দাঁড়াবে না।

অনেকেই মন্তব্য প্রকাশ করলেন, চন্দ্র-অভিযানের গতানুগতিক ঘটনার পুনরুক্তির তুলনায় মহাকাশ-স্টেশন তৈরির প্রাথমিক পরীক্ষাকাজের পেছনে অনেক বেশি বাস্তব উপযোগিতার ভিত্তি রয়েছে।

অ্যাপোলো-১১

চাঁদে মানুষের অবতরণের দ্বিতীয় অভিযান শুরু হয়েছিল ১৯৬৯ সালের ১৪ই নভেম্বর তারিখে। এই অভিযানের যাত্রী ছিলেন তিনজন মহাকাশযাত্রী। এঁরা হলেন—চার্লস কনরাড, রিচার্ড গর্ডন এবং অ্যালান বীন।

বাহক-রকেট স্যাটার্ন-৫ অ্যাপোলো-১২ মহাকাশযানের তিনজন যাত্রীকে নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল ভারতীয় সময় রাত প্রায় দশটা নাগাদ। অনেকগুলো বিপদের মধ্যে অভিযানটি শুরু হয়। যাত্রাশুরুর কাউন্ট-ডাউন বা সময়-গণনা যখন চলেছে তখন রকেটের প্রথম পর্যায়ের জ্বালানির একটি ট্যাঙ্কে ছিদ্রের আবিষ্কার ঘটে। ট্যাঙ্কটিকে পাল্টাতে হয়।

এছাড়া আবহাওয়ার অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। মহাকাশ বন্দরের এলাকা জুড়ে তখন প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি চলেছে। যাত্রা শুরু হবার পর রকেটের বেগ যখন দ্রুত বেড়ে উঠছিল, তখন ভিজে বাতাসের সংস্পর্শে যে স্থায়ী বিদ্যুৎ জমা হচ্ছিল রকেটের বিরাট ধাতব দেহটার ওপরে, তা পরিমাণে খুব বেশি হলে কী দুর্ঘটনা ঘটত বলা যায় না। রকেটের দেহের সঙ্গে একবার বজ্র-বিদ্যুতের সংঘাতও ঘটেছিল এবং পরিমাণে তা বেশি হলে যে-কোন দুর্ঘটনাই ঘটতে পারত। সোজা কথায় বলা যায়, কিছু প্রাকৃতিক ঘটনাসংযোগে বিপদের সম্ভাবনাগুলো চূড়ান্ত সীমা পেরিয়ে যায় নি।

পৃথিবী থেকে চাঁদ পর্যন্ত অ্যাপোলোর অভিযানে নতুনত্ব কিছু ছিল না। এবারে অ্যাপোলোর চাঁদে নামার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল চাঁদের দৃশ্য পিঠের পশ্চিম প্রান্তে, 'ঝড়ের সাগর' নামে একটি মেরিয়া অঞ্চলে। জায়গাটির আরো একটি বিশেষত্ব ছিল। ১৯৬৭ সালের ২০শে এপ্রিল আমেরিকার বিজ্ঞানীরা ঐ একই জায়গায় সার্ভেয়ার-৩ নামে একটি স্বয়ংক্রিয় মহাজাগতিক স্টেশনকে নামিয়েছিলেন। সার্ভেয়ার-৩-এর প্রায় গা ঘেঁষে অ্যাপোলো-১২-র চন্দ্রযানকে বিজ্ঞানীরা চাঁদে নামাতে চেয়েছিলেন। লক্ষ্যভেদের এমন আশ্চর্য সাফল্য বিজ্ঞানীরা অ্যাপোলো-১১-র ক্ষেত্রে অর্জন করতে পারেন নি। অ্যাপোলো-১১-র চন্দ্রযান তার নির্ধারিত জায়গা থেকে প্রায় ১২০০ মিটার দূরে এসে নেমেছিল।

আসলে ব্যাপারটা ঘটলও তাই। ১৯শে নভেম্বর বুধবার ভারতীয় সময় দুপুর বারটা নাগাদ চন্দ্রযানে চেপে কনরাড ও বীন চাঁদের ঝড়ের সাগরের যে জায়গায় এসে নেমেছিলেন, সেখান থেকে সার্ভেয়ারের দূরত্ব ছিল মাত্র ২০০ মিটার।

চার ঘণ্টা বাদে কনরাড চাঁদের প্রতিকূল পরিবেশের উপযোগী মহাকাশ পোশাকে সজ্জিত হয়ে চাঁদের মাটিতে নেমে এলেন। এবারে কোন উচ্ছ্বাস নেই, কোন আনুষ্ঠানিক ব্যাপার নেই। আধ ঘণ্টা বাদে বীন এসে যোগ দেন কনরাডের সঙ্গে।

চাঁদের জমিতে

চাঁদের স্বল্প-অভিকর্ষ-বলের পরিবেশে চলাফেরায় কিছু সময়ের মধ্যে অভ্যস্ত হয়ে নিয়েই অভিযাত্রীরা তাঁদের জন্যে নির্দিষ্ট কাজে লেগে পড়েন।

চাঁদের যে জায়গায় অভিযাত্রীরা নেমেছেন, তাকে অ্যাপোলো-১১-র চন্দ্রযানের অবতরণ-ক্ষেত্রের তুলনায় অনেক বেশি অসমতল এবং বন্ধুর মনে হচ্ছিল। জায়গাটার আর একটি বিশেষত্ব—চারিদিকে ধুলোর যেন আর অন্ত নেই। ধুলোর স্তরটা যে খুব গভীর এবং অভিযাত্রীদের পা যে তাতে একেবারে ডুবে যাচ্ছিল, তাও নয়। কিন্তু চলাফেরা করবার সময় তাঁদের সারা পোশাকটা ধুলোয় ধূসরিত হয়ে উঠছিল।

অভিযাত্রীরা চাঁদে বেশ কিছু শিলার নমুনা সংগ্রহ করা এবং ছবি তোলার বিস্তৃত কাজ শুরু করে দেন। এবারে রয়েছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি—চাঁদে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার যন্ত্রপাতি বসানো। তাঁরা সবশুদ্ধ ছটি যন্ত্রকে বসিয়েছিলেন চাঁদে।

একটি যন্ত্রের নাম হল—solar wind shade। সূর্যের বাতাসের

মাধ্যমে দুষ্প্রাপ্য গ্যাস—যেমন হিলিয়াম, আর্গন, নিয়ন প্রভৃতি কি অনুপাতে এবং পরিমাণে চাঁদে পৌঁছচ্ছে—এই যন্ত্রটি তার পরিমাপ গ্রহণ করবে। চাঁদ থেকে ফিরে আসার সময় যন্ত্রটিকে অভিযাত্রীরা সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন।

অভিযাত্রীরা চাঁদে একটি ম্যাগনিটোমিটার যন্ত্র বসিয়েছিলেন। এর কাজ ছিল চাঁদের বৈদ্যুতিক ধর্মাবলী এবং তার চৌম্বক ক্ষেত্রের অস্তিত্ব যদি আদৌ থেকে থাকে তাহলে তার প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি বিশদ ছবি তুলে ধরা। এছাড়া বসানো হয়েছিল একটি ভূকম্প-নির্দেশক যন্ত্র, যার কাজ ছিল উল্কাপিণ্ডের সংঘাত অথবা আগ্নেয় প্রক্রিয়া বা চাঁদের অভ্যন্তরে ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া—এদের কোন্‌টি আসলে ভূমিকম্পের কারণ তা নির্ণয় করা।

Solar wind spectrometer নামে একটি যন্ত্রকে চাঁদে বসানো হয়েছিল, যার কাজ ছিল সূর্য থেকে সূর্যের বাতাসের সঙ্গে যে সব ইলেকট্রন এবং প্রোটন-কণিকা চাঁদে এসে পৌঁছচ্ছে তাদের শক্তি, ঘনত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্য জোগানো। এই যন্ত্রটিকেও অভিযাত্রীরা চাঁদ থেকে ফেরার সময় সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।

এছাড়া চাঁদে বসানো হয়েছিল একটি cold cathode gaugeকে, যার কাজ ছিল চাঁদে সামান্য পরিমাণেও যদি কোন বায়ুমণ্ডল থাকে তাহলে তার পরিমাপকে পরীক্ষা করা। এই অতি-তনু বায়ুমণ্ডল চাঁদের অভ্যন্তরভাগে যে শিলাস্তর রয়েছে, হয়ত সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত স্বল্প গ্যাসের সমবায়ে গড়ে উঠে থাকবে।

Ionosphere Detector নামে যে যন্ত্রটিকে অভিযাত্রীরা চাঁদে বসিয়েছিলেন, তার কাজ ছিল চাঁদের জমির সামান্য ওপরে যদি তড়িতাবিষ্ট কণিকারা থাকে তাহলে তাদের পরিমাপ সংগ্রহ করা।

প্রতিটি যন্ত্রপাতি বিজ্ঞানীদের হাতে চাঁদ সম্বন্ধে বহু নতুন তথ্য তুলে দিয়েছে যার বিশ্লেষণ কাজ চলবে দীর্ঘদিন ধরে।

চাঁদে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্যে যে সব যন্ত্রপাতি অভিযাত্রীরা বসিয়েছিলেন, তাদের জন্যে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎশক্তি তৈরির একটি অভিনব ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ব্যবস্থাটি হল—একটি তেজস্ক্রিয় তাপীয় বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদক যন্ত্র (radio-active thermal generator)। একটি ধাতুর সিলিণ্ডারের বা নলের মাঝে একটি পেন্সিলের আকারের প্লুটোনিয়াম-২৩৮-এর টুকরো বসানো আছে। প্লুটোনিয়াম হল একটি স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ এবং প্লুটোনিয়াম-২৩৮ হল স্বাভাবিক প্লুটোনিয়ামের একটি আইসোটোপ যার পরমাণুর কেন্দ্রকে রয়েছে ৯৪টি প্রোটন এবং ১৪৪টি নিউট্রন (দুয়ের যোগফল দাঁড়ায়

২৩৮)। প্লুটোনিয়াম-২৩৮ পরমাণুর ভর সব সময়েই আল্‌ফা, বিটা এবং গামা রশ্মির আকারে শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। একই সঙ্গে তৈরি হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে তাপশক্তি। সেই তাপশক্তি সরাসরি একটি থার্মোকাপ্‌ল্‌ (thermocouple) ব্যবস্থার দ্বারা বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে যন্ত্রগুলোর কাছে গিয়ে পৌঁছচ্ছে।

ক্ষুদে পারমাণবিক স্টেশনটির চারপাশে যন্ত্রগুলো বৃত্তাকারে সাজানো রয়েছে। যন্ত্রগুলোর লিপিবদ্ধ তথ্য ঐ স্টেশনটির আর একটি যন্ত্রাংশে বেতার তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে টেলিমেট্রিক ব্যবস্থায় পৃথিবীতে নির্দিষ্ট যোগাযোগ-কেন্দ্রে এসে পৌঁছচ্ছে। আবার ঐ স্টেশনই পৃথিবী থেকে বিজ্ঞানীদের নির্দেশ অনুযায়ী যন্ত্রগুলোকে চালু করা, বন্ধ করা বা কাজের পদ্ধতি পালটানোর সঙ্কেত জ্ঞাপন করছে।

স্টেশনটির বিদ্যুত-উৎপাদনকেন্দ্রটি দীর্ঘকাল ধরে কাজ করে চলবে।

চাঁদের জমিতে দ্বিতীয়বার

চাঁদের জমিতে প্রথম পর্যায়ে তিন ঘণ্টারও বেশি সময় পরিক্রমা সম্পূর্ণ করার পর অভিযাত্রীরা চন্দ্রযানে ফিরে আসেন। বার ঘণ্টা বাদে অক্সিজেনের আধার পূর্ণ করে নিয়ে আবার তাঁরা চাঁদের জমিতে দ্বিতীয়বার অনুসন্ধানের কাজে নেমে পড়েন।

এবারে তাঁরা ২০০ মিটার হেঁটে গিয়ে পৌঁছবেন সার্ভেয়ার-৩ যানটির কাছে, চন্দ্রযান থেকেই যেটিকে তাঁরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন। সার্ভেয়ার নেমেছিল একটি ছোট জ্বালামুখের ঢালু দেওয়ালের গায়ে। অভিযাত্রীরা তার কাছে পৌঁছে দেখেন, সূর্যের প্রচণ্ড তাপে তার আসল রঙটা ঝলসে গিয়ে এখন প্রায় তামাটে হয়ে উঠেছে। তাঁরা সার্ভেয়ারের টেলিভিশন ক্যামেরা এবং আরো কিছু যন্ত্রাংশ খুলে নেন পৃথিবীতে নিয়ে আসার জন্যে। ওদের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে জানা যাবে, চাঁদের পরিবেশে ওরা কতটুকু বিকৃতি লাভ করেছে এবং কোন বীজাণুর দ্বারা আদৌ আক্রান্ত হয়েছে কি না।

চাঁদের জমিতে অভিযাত্রীরা খুব স্বচ্ছন্দভাবেই হাঁটাচলা করেছেন। শুধু তাঁরা মাঝে মাঝে তৃষ্ণার্ত বোধ করছিলেন। মহাকাশ-পোশাকের ব্যবস্থার সঙ্গে দু-এক চুমুক জলের আয়োজন থাকলে ভাল হত বলে তাঁদের মনে হয়েছে।

চাঁদের জমিতে হাঁটার সময় অভিযাত্রী কনরাড একবার হঠাৎ পড়ে যান। সৌভাগ্যক্রমে তিনি আহত হন নি বা তাঁর মহাকাশ-পোশাকেরও কোন ক্ষতি

হয় নি। যদি পোশাকটি ছিঁড়ে যেত, তাহলে ভেতরের সমস্ত অক্সিজেন মুহূর্তের মধ্যে বাইরে বেরিয়ে আসত এবং বায়ুহীন চাঁদের পরিবেশে তাঁর দেহের ওপর বায়ুর কোন চাপ আর থাকত না। ফলে শরীরের রক্তস্রোতের সঙ্গে মিশে রয়েছে যে নাইট্রোজেন গ্যাস, যারা ভেতর থেকে একটা চাপ (এই চাপকে বলা হয় alveolar pressure) সৃষ্টি করে শরীরের কাঠামোটাকে বজায় রেখেছে বলা যায়, তারা বুদ্বুদের আকারে বাইরে বেরিয়ে এসে সেই চাপটাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলত। ফলে সমস্ত শরীরটা ফেটে চুপসে গিয়ে এক চরম যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু অভিযাত্রীকে গ্রাস করে বসত।

অভিযাত্রীরা চাঁদের জমিতে গোটা সময়টা জুড়ে নিজেদের মধ্যে এবং পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের সঙ্গে এতটাই খোশমেজাজে কথা বলছিলেন যে কিছু-কিছু সংবাদ-পত্রের রিপোর্টার তা শুনে এক কৌতুকজনক মন্তব্য করে বসেন। অভিযাত্রীরা যেহেতু বিশুদ্ধ অক্সিজেনকে প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করছিলেন, ফলে তাঁদের স্নায়বিক প্রক্রিয়া কিছুটা পরিমাণে বিপর্যস্ত হয়ে তাঁদের নাকি অমন খোশমেজাজের করে তুলেছিল। আসলে অবশ্য ব্যাপারটা মোটেই তা ছিল না।

চাঁদের জমিতে দ্বিতীয়বার পর্যটনের কাজ শেষ করে অভিযাত্রীরা ফিরে আসেন তাঁদের চন্দ্রযানে। চাঁদের জমিতে তাঁরা সর্বমোট হেঁটেছিলেন প্রায় আড়াই কিলোমিটারের মত পথ। চাঁদে ৩১ ঘণ্টা কাটাবার পর চন্দ্রযান উঠে এসে মিলিত হয় অ্যাপোলোর কমাণ্ড মডিউলের সঙ্গে। এবারে পৃথিবীতে ফিরে আসার পালা। দ্বিতীয় চন্দ্র-অভিযানের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তির পর ২৪শে নভেম্বর অভিযাত্রীরা নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

অ্যাপোলো-১২-র বৈজ্ঞানিক সাফল্য

চন্দ্রযানে চাঁদের জমি থেকে উঠে এসে অ্যাপোলোর কমাণ্ড মডিউলের সঙ্গে মিলিত হবার পর অভিযাত্রীরা চন্দ্রযানটিকে যখন চাঁদের জমির ওপর আছড়ে ছুঁড়ে মারেন, তখন চাঁদের অভ্যন্তরে একটি দীর্ঘস্থায়ী কম্পনের সৃষ্টি হয়। একটি ঘণ্টাকে আঘাত করলে তা থেকে যেমন প্রতিধ্বনির তরঙ্গ তৈরি হতে থাকে, এও ছিল অনেকটা তাই। চাঁদের জমির ওপর বসানো ভূকম্প-নির্দেশক যন্ত্রে চাঁদের এই কম্পন ধরা পড়ে এবং বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে সেই তথ্য বিজ্ঞানীদের হাতে এসে পৌঁছয়। এই কম্পনের কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে, বুঝতে পারলেন বিজ্ঞানীরা।

চাঁদ সম্বন্ধে দ্বিতীয় বড় খবরটি পৌঁছে দেয় ম্যাগ্‌নিটোমিটার যন্ত্রটি,

অ্যাপোলোর অভিযাত্রীরা যেটিকে চাঁদে বসিয়ে এসেছিলেন। এই যন্ত্রের নির্দেশে চাঁদে একটি অতি দুর্বল চৌম্বক-ক্ষেত্রের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে, যার মাপ হল ৩০ থেকে ৪০ গামার (গামা হল চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তির পরিমাপের একক) মত। বিশেষজ্ঞদের অনুমান-মত এই শক্তির মাপ হওয়া উচিত ছিল ২ থেকে ৮ গামার মত।

পৃথিবীর তুলনায় চাঁদের এই চৌম্বক-ক্ষেত্রের শক্তির মাপ অবশ্য খুবই কম। পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই মাপ হল প্রায় ১৫০০০ গামার মত। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, চাঁদের এই চৌম্বক-ক্ষেত্রের মূলে রয়েছে বেশ বড় আকারের কোন উৎস, কিন্তু তার সঠিক অবস্থান এখনই নির্ণয় করা সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে চাঁদের জমিতে এক সঙ্গে চারটি ম্যাগনিটোমিটার যন্ত্র বসিয়ে এ পরীক্ষাটা করা সম্ভবপর হবে।

চাঁদ থেকে যে প্রায় ৮০ পাউণ্ডের মত শিলা অভিযাত্রীরা এবারে নিয়ে আসেন, তাদের কিছু নমুনা বিজ্ঞানীদের গভীর কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিল। একটি নমুনা ছিল বড় বড় দানাযুক্ত এবং সেটিকে পরীক্ষা করে বোঝা যায় যে চাঁদের জমির অনেক তলায় ছিল ওর আদি বাসস্থান। কেলাসভবনের **(crystallisation)** চমৎকার নিদর্শন রয়েছে ঐ শিলার দেহে।

চাঁদের অত গভীর থেকে শিলা জমির ওপরে এল কিভাবে, এই প্রশ্নের জবাবে বিজ্ঞানীরা বলছেন, শিলাটির অবস্থানক্ষেত্র থেকে প্রায় ৩২০ কিলো-মিটার দূরে কোপার্নিকাস নামে যে বিশাল চেহারার জ্বালামুখটি (যার ব্যাস হল ৯৭ কিলোমিটার) রয়েছে, সুদূর অতীতে তারই একটি বিস্ফোরণের ধাক্কায় চতুর্দিকে এক বিরাট এলাকা জুড়ে গলিত শিলাবৃষ্টি চলতে থাকে। তারই একটি নমুনা নাকি অভিযাত্রীরা বর্তমানে কুড়িয়ে পেয়েছেন। চাঁদের জীবনের এক নাটকীয় ঘটনার সাক্ষ্য বুকে নিয়ে ঐ শিলা সুদীর্ঘকাল ধরে যেন পৃথিবীর মানুষেরই অপেক্ষায় ছিল।

১৫

চাঁদে যান্ত্রিক রোবট

সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা চাঁদে মানুষকে নামানোর প্রতিযোগিতায় যদিও অংশীদার হন নি কিন্তু স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযান পাঠিয়ে চাঁদে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাজ তাঁদের অব্যাহতভাবেই চলছিল।

লুনা-১৬

১৯৭০ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা লুনা-১৬ নামে একটি স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযানকে চাঁদের দিকে পাঠালেন, সেটা গিয়ে নিরাপদে চাঁদের উর্বর সাগরে (সী অব্ ফার্টিলিটি) নামল। লুনা-১৬-র মধ্যে ছিল খননকারী যন্ত্র, যার সাহায্যে ৩½ আউন্সের মত চান্দ্র শিলাকে সে খুঁড়ে নিল এবং ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে এল। যদিও পূর্ববর্তী দুটি অ্যাপোলো অভিযানে সংগ্রহের তুলনায় এই চান্দ্র শিলার পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য কিন্তু এই সংগ্রহ-কাজের মধ্য দিয়ে চাঁদের পৃষ্ঠভাগের শিলার গঠন-প্রকৃতি সম্বন্ধে হাতেনাতে যেটুকু তথ্য পাওয়া গেল তার ফলে চাঁদে একটি স্বয়ংক্রিয় রোবট পাঠিয়ে বিস্তৃত গবেষণার পথ হল প্রশস্ত।

লুনাখোদ-১

১৯৭০ সালের ১০ই নভেম্বর লুনা-১৭ রওনা হল পৃথিবী থেকে এবং চাঁদের দৃশ্য পিঠের 'ঝড়ের সাগর' নামে একটি জমাট-বাঁধা লাভার সমুদ্রের ওপর এসে নামল ১৭ই নভেম্বর তারিখে। লুনা-১৭ ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে এসেছে এক বিচিত্র যান্ত্রিক রোবটকে, যার নাম হল লুনাখোদ-১। পৃথিবী থেকে সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের এক বেতার-সংকেতের খোঁচায় একজোড়া সিঁড়ি লুনা-১৭-র দুপাশ থেকে চাঁদের জমি বরাবর নেমে এল। সিঁড়ির পতনের ধাক্কা থেকে কিছু জ্ঞানদা (সেনসর) বা সংকেত-গ্রহণের যন্ত্রপাতির বুঝে নিতে অসুবিধে হল না, সিঁড়ির কোন্ দিকে চাঁদের জমির গঠন তুলনামূলকভাবে শক্ত। সেদিক দিয়ে এবারে লুনাখোদ নেমে এল চাঁদের মাটিতে।

একটি আট-চাকাওয়ালা ছোট মোটরগাড়ির মত হল লুনাখোদ। দৈর্ঘ্য হল ২$\frac{১}{২}$ মিটার এবং উচ্চতা ১$\frac{১}{২}$ মিটার। লুনাখোদের প্রতিটি চাকার নিজস্ব চালক-ব্যবস্থা রয়েছে—সৌরশক্তি-চালিত একটি মোটরের ওপর আবার যাদের চালু রাখার দায়িত্ব। সৌর-ব্যাটারিগুলো বসানো রয়েছে লুনাখোদের মাথার ওপরে।

লুনাখোদের চন্দ্র-পরিক্রমা এবারে শুরু হল। চলার উপযুক্ত রাস্তা নেই, ট্রাফিক সিগনাল নেই, রাস্তায় অন্য কোন যান-বাহনও নেই প্রয়োজন হলে যাদের কাছ থেকে একটি টায়ার বা স্পার্ক প্লাগ চেয়ে নেওয়া যেতে পারে। ট্র্যাফিক পুলিশের মত কেউ বলে দেবারও নেই, কোনদিকে রয়েছে গর্ত, ফাটল বা বড় বড় পাথরের মেলা। লুনাখোদের ভেতরে কোন চালক নেই। তার চালক রয়েছে ৩৮৪০০০ কিলোমিটার দূরে পৃথিবীতে, যেখান থেকে রেডিও সংকেতের দ্বারা তার আভ্যন্তরীণ প্রতিটি যন্ত্রপাতি পরিচালিত হচ্ছে।

লুনাখোদের মধ্যে বসানো রয়েছে টেলিভিশন ক্যামেরা ; চলমান অবস্থায় সেই ক্যামেরার চোখে চারপাশের প্রকৃতির সবকিছুই ধরা পড়ছে। পৃথিবী থেকে বিজ্ঞানীরাও একই সঙ্গে সবকিছুই নজর করতে পারছেন। ফাটল বা গর্ত বা পাথরের স্তূপ এড়িয়ে যেতে লুনাখোদের কোনই অসুবিধে হচ্ছিল না। ভেতরে 'গ্র্যাভিটি ব্যাল্যান্স' বসানো রয়েছে, অনুভূমিক তল থেকে নতি (ইনক্লিনেশন) যদি দশ ডিগ্রির বেশি হয়, তাহলে ঐ যন্ত্র থেকে সংকেত গিয়ে পৌঁছবে আভ্যন্তরীণ ব্রেক ব্যবস্থায়, সঙ্গে সঙ্গে লুনাখোদের আটটি চাকাই নিশ্চল হয়ে পড়বে।

চাঁদের একটি দিনের পরিমাণ হল পৃথিবীর চোদ্দটি দিন ও রাতের সমান, একটি রাতের পরিমাণও তাই। লুনাখোদের যন্ত্রপাতি চাঁদের দিনের বেলা তাদের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎশক্তি লাভ করছিল সৌর ব্যাটারিগুলো থেকে, যাদের কাজ ছিল সূর্যের তাপশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা ; কিন্তু চাঁদের রাত্রিবেলা ওদের কাছ থেকে আর কোন বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যাবে না। তখন লুনাখোদের গতিও হবে স্তব্ধ। একটি আইসোটোপরূপী স্টোভ থেকে বিদ্যুৎ তৈরির ব্যবস্থা ছিল ভেতরে, যার দ্বারা লুনাখোদের অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি যন্ত্রকে রাতেও চালু রাখা সম্ভব হবে। চাঁদের তাপমাত্রার দিনে রাতে বিরাট তারতম্যের ফলে লুনাখোদের যন্ত্রপাতি কিন্তু এতটুকুও বিকল হয় নি। আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রাও সব সময়ে রক্ষিত হচ্ছিল ১৫ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডের মাত্রায়।

দিনের আলোয় লুনাখোদ আবার সচল হয়। দিন এবং রাতের পালাবদল এভাবে চলতে থাকে। পরিক্রমা-পথের পাঁচশো জায়গায় চান্দ্র মৃত্তিকার ভৌতিক

ও যান্ত্রিক গুণাবলী এবং পঁচিশ জায়গায় রেডিও স্পেকট্রোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে তার রাসায়নিক ধর্ম নির্ধারণ করা হয়।

সেই তথ্য রেডিও সংকেতের মাধ্যমে পৃথিবীতে বসেই সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা লাভ করেন। মানুষের কাজ যন্ত্রের দ্বারাই সিদ্ধ হল এভাবে।

লুনাখোদ চাঁদের জমির প্রায় ৮০,০০০ বর্গ মিটার ক্ষেত্রের ওপর নিখুঁতভাবে তথ্য অনুসন্ধানের কাজ চালায়, ৫০০,০০০ বর্গ মিটার ক্ষেত্রকে পর্যবেক্ষণ করে এবং ২০,০০০ ছবি তুলে পৃথিবীতে পাঠায়। এই বিস্তৃত কর্মসূচীর ফলে চাঁদের সমুদ্র-এলাকায় জ্বালামুখ, শিলা এবং অন্যান্য চান্দ্র গঠনের পরিমাণগত সমাবেশের একটি ধারণা সর্বপ্রথম গঠন করা সম্ভবপর হয়েছে।

লুনাখোদের মধ্যে ছিল একটি এক্স-রে দূরবীন যন্ত্র, যার সাহায্যে মহাকাশে এক্স-রে বা রঞ্জন রশ্মির উৎস—নক্ষত্র না আন্তর্নাক্ষত্রিক ক্ষেত্রে ধুলো ও গ্যাসের পুঞ্জ, ইত্যাদি বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট গবেষণা-কাজ পরিচালনা করা সম্ভবপর হয়েছে।

লুনাখোদের মধ্যে তাপীয় শক্তির উৎস আইসোটোপরূপী যে ব্যবস্থাটি ছিল, তা স্বাভাবিকভাবে নিঃশেষিত হবার পর লুনাখোদের কর্মজীবনও সমাপ্ত হয়। পৃথিবীর হিসেব অনুযায়ী লুনাখোদের যন্ত্রপাতি ৩০০ দিন চালু ছিল। এই সুদীর্ঘ জীবন-কাল প্রমাণ করল, মহাকাশের যে-কোন ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের কাজে স্বয়ংক্রিয় বৈজ্ঞানিক রোবটের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এক অনিশ্চিত পরিবেশের মধ্যে মানুষকে পাঠাবার আগে এরাই হবে অগ্রগামী দূত।

১৬

অ্যাপোলো—১৩ ও ১৪

পরবর্তী চন্দ্র অভিযান অ্যাপোলো-১৩ এক চরম বিয়োগান্ত পরিণতির হাত থেকে সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পায়। অভিযাত্রী জেমস লভেল, ফ্রেড হেস এবং জন সোয়াইগার্ট ১৯৭০ সালের ১১ই এপ্রিল যখন চাঁদের দিকে প্রায় ৩২৮,০০০ কিলোমিটার পথ এগিয়ে গেছেন তখন মহকাশযান এক প্রচণ্ড সংঘাতের সম্মুখীন হল। কমাণ্ড মডিউলের সংলগ্ন সার্ভিস মডিউলের দুটি ফুয়েল বা জ্বালানি সেল সেই সংঘাতে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মহাকাশযান এবং অভিযাত্রীদের জন্যে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ এবং জল-সরবরাহের ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তুলল। দুর্ঘটনার খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে হিউসটনের উৎকণ্ঠিত বিজ্ঞানীরা চাঁদে নামার পরিকল্পনাকে বাতিল করলেন। এখন সমস্যা দাঁড়াল, অভিযাত্রীদের কিভাবে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা যায়।

দুর্ঘটনাটা ঘটল কিভাবে? ঘটনাটার সময় মহাকাশযানের জানালার বাইরের দিকে তাকিয়ে অভিযাত্রীদের মনে হয়েছিল, উল্কার মত একটা বস্তুর সঙ্গে সংঘাতে হয়ত জ্বালানি সেলের আধারগুলো বিদীর্ণ হয়ে পড়েছে। সঠিক কারণ অবশ্য অভিযাত্রীরা পৃথিবীতে ফিরে আসার পর বিস্তৃত অনুসন্ধানের মাধ্যমেই ধরা পড়েছিল।

মহাকাশযানে জ্বালানি সেলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ একদিকে যেমন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া ঘটিয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি তৈরি করছে. তেমনি একই সঙ্গে তৈরি করছে জল এবং তাপশক্তিকে। অভিযাত্রীদের পানীয় জলের আধার জ্বালানি সেল থেকে জলের জোগানে সমৃদ্ধ হচ্ছিল। তাপশক্তির কিছুটা চক্রাকারে জ্বালানি সেল ব্যবস্থাতেই আবার ফিরে আসে এবং বাকিটা রেডিয়েটরের মাধ্যমে মহাকাশে ছেড়ে দেওয়া হয়।

বিদ্যুৎশক্তি নেই, তাই অক্সিজেন এবং জলের অভাবে অ্যাপোলো মহাকাশ-যানের কমাণ্ড মডিউল অভিযাত্রীদের পক্ষে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বাসের অনুপযোগী হয়ে উঠবে। অভিযাত্রী লভেল এবং হেস তাড়াতাড়ি সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে চন্দ্রযানে প্রবেশ করে সেখানকার বিদ্যুৎ-ব্যবস্থাকে চালু করে তোলেন এবং

চন্দ্রযানের অক্সিজেন ও জলের ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের মহাকাশ পোশাকের সংযোগ সাধন করেন। সোৎয়াইগার্ট রইলেম কমাণ্ড মডিউলের মধ্যে। সুড়ঙ্গের পথে চন্দ্রযান থেকে অক্সিজেন এবং তাপ প্রতিরোধক জলের সরবরাহ তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়া হল। সার্ভিস মডিউলের সঙ্গে এখন সমস্ত সংযোগ বিচ্ছিন্ন। সোৎয়াইগার্ট কমাণ্ড মডিউলের নিজস্ব বিদ্যুৎ-শক্তির উৎস তিনটি রাসায়নিক ব্যাটারির সঙ্গেও সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে অন্ধকার কক্ষের মধ্যেই রইলেন। ঐ ব্যাটারিগুলোর আয়ু মাত্র দশ ঘণ্টা। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার সময় ঐ বিদ্যুৎ-শক্তির প্রয়োজন হয়ে পড়বে, কাজেই তার এতটুকুও এখন খরচ করা চলবে না।

হিউসটনের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে পরামর্শের পর, ১৪ই এপ্রিল অভিযাত্রীরা লুনার মডিউলের এঞ্জিনটাকে ৩০ সেকেণ্ডের জন্যে চালু করে, চাঁদের উল্টো পিঠকে ঘুরে চাঁদের অভিকর্ষের টানটাকেই কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর দিকে রওনা হলেন। দুর্ঘটনার সময় অ্যাপোলো চাঁদের এতই কাছাকাছি চলে এসেছিল যে, চাঁদের অভিকর্ষের টানকে কাটিয়ে তার পক্ষে তক্ষুণি সরাসরি পৃথিবীর দিকে ফেরা সম্ভবই ছিল না। বিজ্ঞানীরা অভিযাত্রীদের নির্ধারিত সময়ের ২৪ ঘণ্টা আগেই পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার জন্যে একটা সোজা রাস্তা বেছে নিতে পারতেন। কিন্তু তার জন্যে লুনার মডিউলের এঞ্জিনকে যেমন দু-ঘণ্টা বেশি সময় চালু রাখতে হত তেমনি ভারি এবং অকর্মণ্য সার্ভিস মডিউলটিকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়োজনও দেখা দিত। এর ফলে বাদবাকি মহাকাশযানটি নিজের চারপাশে এক অতিরিক্ত ঘূর্ণনের কবলে গিয়ে পড়ত।

লুনার মডিউলই এখন অভিযাত্রীদের একমাত্র ভরসা-স্থল। এর এঞ্জিন স্বল্পকাল চালু থেকে যে ধাক্কা তৈরি করেছিল তাই কমাণ্ড ও সার্ভিস মডিউলকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে পৃথিবীর দিকে। অ্যাপোলোর মূল এঞ্জিন সার্ভিস মডিউল থেকে বিদ্যুৎশক্তির অভাবে এখন নিষ্ক্রিয়। সৌভাগ্যবশত চাঁদে নামার আগেই এই বিদ্যুৎশক্তির ব্যবস্থাটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। যদি চাঁদে নামার পর পৃথিবীতে ফিরে আসার সময় দুর্ঘটনাটা ঘটত, তাহলে লুনার মডিউলের নিজস্ব অক্সিজেন এবং বিদ্যুত-শক্তির সঞ্চয় যেমন নিঃশেষিত হয়ে বসত, তেমনি পরিকল্পিত চান্দ্র-ভূকম্প তৈরির পরীক্ষার কাজে চন্দ্রযানও হয়ত নিক্ষিপ্ত হয়ে বসত চাঁদের জমিতে। সে অবস্থায় অভিযাত্রীদের বেঁচে পৃথিবীতে ফেরা আর কখনোই সম্ভব হয়ে উঠত না।

বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের আগে লুনার ও সার্ভিস মডিউল পরপর বিচ্ছিন্ন করা হল কমাণ্ড মডিউল থেকে। কমাণ্ড মডিউলের বিদ্যুৎ-ব্যবস্থাকে চালু করে

নিজস্ব রেট্রো বা ক্ষুদে রকেট-ব্যবস্থার সাহায্যে অভিযাত্রীরা ১৭ই এপ্রিল নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে এলেন।

পৃথিবীতে ফিরে আসার পর ১৫০ জন বিশেষজ্ঞ কয়েক মাস ধরে সমগ্র দুর্ঘটনাটির পুংখানুপুংখ তদন্তের কাজে নিযুক্ত হলেন। তদন্তের ফলে যে ত্রুটিগুলো ধরা পড়ল, তা আমেরিকার মহাকাশ-বিজ্ঞান সংস্থা NASA-র ঐতিহাসিক কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে এক বিপুল সংশয়কে জাগ্রত করে তুলল। অনুসন্ধানের ফলে অভিযুক্ত হল কয়েকটি থার্মোস্ট্যাটিক সুইচ এবং একটি ছোট সংযোগরক্ষাকারী টিউব বা নল।

অ্যাপোলোর সার্ভিস মডিউলের মধ্যে যে দুটি তরল অক্সিজেনের ট্যাংক রয়েছে, তাই হল মহাকাশযানের মূল অক্সিজেনের উৎস। বৈদ্যুতিক হিটারের সাহায্যে ট্যাংকগুলোর মধ্যে সব সময়েই একটা নির্দিষ্ট চাপ বজায় রাখা হয়। ট্যাংকগুলোর মধ্যে যে থার্মোস্ট্যাটিক সুইচগুলো রয়েছে তাদের কাজ হল আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা যখনই ৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইটকে ছাড়িয়ে যাবে, তখনই হীটারগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া। এই সুইচগুলো ২৮ ভোল্ট ডি. সি. (ডাইরেক্ট কারেন্ট)-তে কাজ করার জন্যে তৈরি হয়েছিল। পরবর্তীকালে অ্যাপোলোর অক্সিজেন ট্যাংকের হীটারগুলোর ডিজাইন বা নক্সা এমনভাবে পরিবর্তন করা হয় যাতে ওদের ৬৫ ভোল্ট ডি. সি.তেও কাজ করানো যাবে। কিন্তু থার্মোস্ট্যাটিক সুইচগুলোকে আর বদলানো হল না ; ওরা ২৫ ভোল্টের জায়গায় ৬৫ ভোল্টে কাজ করতে পারবে কি না, তাও পরীক্ষা করে দেখা হল না—এটাই ছিল পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় মারাত্মক ত্রুটি।

অভিযানের সমাপ্তির পর ধরা পড়ল, এই সুইচগুলো যতক্ষন বন্ধ (ক্লোজড) অবস্থায় থাকছে, ততক্ষণ ৬৫ ভোল্ট ডি. সি-তে সঠিকভাবেই কাজ করতে পারছে, কিন্তু ঐ ভোল্টেজে ওদের খুলতে বা বন্ধ (অফ) করতে গেলেই দেখা গেল একটি জোরালো আর্ক তৈরি হয়ে সুইচের পয়েন্টগুলো প্রায় আঠার মত জুড়ে বসছে। সুইচগুলো ঐ পরিস্থিতিতে থাকলে, ওদের 'অফ' বা বন্ধ অবস্থাতে হীটারগুলোর যখন নেবা উচিত, তখনও ওরা জ্বলতেই থাকবে ফলে অক্সিজেন ট্যাংকের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা অস্বাভাবিক মাত্রায় বেড়ে (১০০০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডেরও বেশি) কিছু বৈদ্যুতিক তারের বাইরেকার আবরণী বা ইনসুলেশন জ্বলে গিয়ে একটা শর্ট-সার্কিট হওয়া মোটেই বিচিত্র ব্যাপার নয়। এরপরে বড় রকমের একটা বিস্ফোরণ ঘটার অপেক্ষা আর কি। অ্যাপোলো-১৩-র ক্ষেত্রে ঘটনাটা ঘটেছিলও ঠিক তাই।

অক্সিজেন ট্যাংকের সঙ্গে যুক্ত একটি ক্ষুদ্র (২½ সেন্টিমিটার দীর্ঘ) সংযোগ-সাধক নলের দুর্বল গঠন-ব্যবস্থাও দ্বিতীয় প্রধান ত্রুটিরূপে ধরা পড়ে।

প্রথম ত্রুটির জন্যে সমগ্র মহাকাশযানটিই টুকরো টুকরোভাবে ধ্বংস হয়ে যাবার কথা ছিল, কিন্তু তা না হয়ে অভিযাত্রীরা কিভাবে যে রক্ষা পেলেন, সেটাই ছিল বিজ্ঞানীদের কাছে এক পরম বিস্ময়জনক ব্যাপার। এক অসাধারণ জটিল যন্ত্র হল অ্যাপোলো—এর লক্ষ-লক্ষ যন্ত্রাংশের মধ্যে এ-জাতীয় ত্রুটি আরো কত রয়ে গেছে, সেটা ভাবতে গিয়েই বিশেষজ্ঞেরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠলেন।

অ্যাপোলো-১৪

অ্যাপোলো-১৩-র চন্দ্র অভিযান যে মারাত্মক পরিণতির হাত থেকে অব্যাহতি পেল, তার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে, পরবর্তী চন্দ্র অভিযানের আগে বিজ্ঞানীদের সে ব্যাপারে স্বভাবতই যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ৩১শে জানুয়ারি অ্যালান বি. শেপার্ড, স্টুয়ার্ট এ, রুসা ও এডগার ডি. মিচেল অ্যাপোলো ১৪-র অভিযাত্রীরূপে চাঁদের দিকে রওনা হলেন। মাঝপথেই একটি দুর্ঘটনায় এঁদের চাঁদে অবতরণের পরিকল্পনা প্রায় বাতিল হতে চলেছিল।

অ্যাপোলোর কমাণ্ড মডিউলকে চন্দ্রযান থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তাকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে আবার চন্দ্রযানের সঙ্গে মহাকাশে যুক্ত করা—এ হল প্রতিটি অভিযানের যাত্রাশুরুর পর আবশ্যকীয় কর্মসূচী। অ্যাপোলো-১৪-র ক্ষেত্রে, কম্যাণ্ড মডিউলকে বিচ্ছিন্ন করার পর চন্দ্রযানের সঙ্গে ওর সংযুক্তীকরণের প্রচেষ্টা বার-বার ব্যর্থ হতে থাকে। পাঁচবার ব্যর্থ হবার পর হিউসটনের বিজ্ঞানীরা প্রায় হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন, পরের বার আকস্মিকভাবে দুটি যানের মধ্যে সংযুক্তি ঘটল। বিজ্ঞানীদের অনুমান, বরফের একটি পাতলা স্তর সংযোগ-ক্ষেত্রের ওপর জমে গিয়েই গোলযোগটা ঘটাচ্ছিল।

অ্যাপোলোর নিয়ন্ত্রক কম্পিউটারের একটি ত্রুটিও বিপর্যয়কে ডেকে আনতে পারত ; এর অন্যতম কাজ ছিল, চন্দ্রযানের চাঁদে নামার নির্দিষ্ট পথকে নির্ধারণ করা। নামার চার ঘণ্টা আগে ধরা পড়ল, কম্পিউটার সে কাজ করে উঠতে পারছে না। তখন হিউসটনের অনুরোধে ম্যাসাচুসেটস ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজির বিজ্ঞানীরা খুব তাড়াতাড়ি করে কম্পিউটারের নতুন একটি প্রোগ্রাম বা কাজের ধারা ঠিক করলেন। হাতে তখন আর মাত্র দশ মিনিট সময় অবশিষ্ট ছিল।

এবারে নামার জন্যে বেছে নেওয়া হয়েছিল, ফ্রা মাওরো এলাকায় ১২২

মিটার উঁচু একটি ছোট পাহাড়ের ১২২০ মিটার পশ্চিমে একটি জায়গা। চাঁদে অভিযাত্রীদের কাজের ধারার মধ্যে কোন বৈচিত্র্য ছিল না, তবে একটু খাড়াই পথ উঠতে গিয়ে অভিযাত্রী শেপার্ড ও মিচেল প্রায় দম হারিয়ে ফেলেছিলেন। মিচেলের মহাকাশ পোশাকে আবার ছোট্ট একটি ফুটো দেখা দেয়— সেটাও ছিল একটা দুশ্চিন্তার কারণ।

চাঁদের অভিযাত্রীরা এই প্রথম দিক এবং গতিপথ নির্ণয় করতে অসুবিধে বোধ করেন। চোখ বন্ধ অবস্থাতেও রহস্যজনক আলোর ঝলকানি তাঁরা দেখতে পাচ্ছিলেন। বায়ুহীন চাঁদের জমির ওপর মহাজাগতিক রশ্মির সংঘাতের ফলেই নাকি ঘটনাটা ঘটছিল। মহাজাগতিক রশ্মির ঐ তীব্রতায় অভিযাত্রীদের অবশ্য কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই এটা বিজ্ঞানীরা জানিয়েছিলেন।

অভিযাত্রীদের অবতরণ-ক্ষেত্র থেকে ১২০০ কিলোমিটার দূরে 'ঝড়ের সাগরে' লুনাখোদের জীবনে তখন একটি রাত অতিক্রান্ত হয়ে আবার দিনের আলো ফুটতে আরম্ভ করেছে। তার সচল দেহের যন্ত্রপাতি আবার অজস্র বৈজ্ঞানিক তথ্য পাঠাতে শুরু করেছে সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের কাছে।

বিজ্ঞানীদের দুশ্চিন্তা ছিল, চন্দ্রযান চাঁদ থেকে উঠে আসার পর মূল মহাকাশযানের সঙ্গে সংযুক্ত হবার সময় আবার যদি পুরনো গলদটা মাথা তুলে দাঁড়ায়, তাহলে চান্দ্র শিলা সমেত চন্দ্রযানকে ত্যাগ করে অভিযাত্রীদের মহাকাশের মধ্য দিয়ে হেঁটে মূল মহাকাশযানে ফিরে আসতে হবে। কোন বন্ধনীর দ্বারা যেহেতু অভিযাত্রীরা মহাকাশযানের সঙ্গে বাঁধা থাকতেন না, তাই বিপদের সম্ভাবনা ছিল। আর কোন দুর্ঘটনা অবশ্য ঘটে নি এবং অভিযাত্রীরাও নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

বৈজ্ঞানিক তথ্য

অ্যাপোলো-১৪ অভিযানে সংগৃহীত শিলার নমুনার প্রাথমিক পরীক্ষায় বেশির ভাগ বিজ্ঞানী এই ধারণা পোষণ করে বসলেন যে গঠন-পর্বের প্রথম পর্যায়ে চাঁদের অভ্যন্তরভাগটা ছিল শীতল এবং বাইরের অংশটা ছিল তপ্ত। পূর্ববর্তী গৃহীত ধারণার এ হল সম্পূর্ণ বিপরীত। চাঁদে অতীতে একটি মোটামুটি জোরালো চৌম্বক ক্ষেত্র ছিল এ প্রমাণ যখন রয়েছে, তখন একটি তপ্ত কেন্দ্র-মণ্ডলের সপক্ষেই কি বেশি যুক্তি পাওয়া যাচ্ছে না—কিছু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এ কথা বললেন। এঁদের মতে, ৩৭০ কোটি বছর আগে চাঁদের অভ্যন্তরভাগ ছিল খুবই তপ্ত।

বিভিন্ন চান্দ্র শিলার নমুনা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে চাঁদের জন্মের যে ছবিটি

বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন তা হল এই, ৪৭০ কোটি বছর আগে ধুলো এবং গ্যাসের একটি মেঘ থেকে ঘনীভবনের মধ্য দিয়ে চাঁদের জন্ম হয়। গ্রহাণু এবং উল্কাদের ক্রমাগত সংঘাতে নবীন চাঁদের দেহ সমৃদ্ধ হতে থাকে। এই সময়ে আয়তনে বৃহদাকার পৃথিবী ছোট চাঁদকে উপগ্রহরূপে দখল করে বসে। চাঁদের দেহে গ্রহাণুদের সংযোজনের আগে কিংবা পরে কোন্ সময়ে এই ঘটনাটা ঘটেছিল, এ নিয়ে অবশ্য বিশেষজ্ঞদের মধ্যে তর্ক রয়েছে।

গ্রহাণুরা ছিল অত্যন্ত তেজস্ক্রিয় এবং প্রায় দশ লক্ষ বছর ধরে এরা চাঁদের আয়তনকে বাড়িয়ে চলে ও চাঁদের পৃষ্ঠভাগের ওপর প্রায় ৪৮০ কিলোমিটার পুরু একটি তপ্ত ত্বক তৈরি করে বসে। অ্যাপোলো-১৪-র অভিযাত্রীরা ফ্রা মাওরো উচ্চভূমি থেকে যে শিলা সংগ্রহ করেছেন, তা চাঁদের এককালের তেজস্ক্রিয় এবং অতি-তপ্ত ত্বকেরই অংশবিশেষ। এই অঞ্চলের বয়স এখনো নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি, তবে ধুলোর দুটি নমুনার প্রাথমিক রাসায়নিক সংশ্লেষের ফলে জানা যায়, ওদের বয়স ৪৫০ কোটি থেকে ৪৭০ কোটি বছরের মতো—সৌরজগতের বয়স সম্বন্ধে আধুনিক ধারণাও হল তাই।

সংগৃহীত শিলা বা ধুলো কোনটিই চাঁদের আদি বস্তু নয়। চাঁদের সুদূর অতীতে পৃষ্ঠভাগ প্রায় এক কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত গলিত অবস্থা লাভ করে আবার কঠিন হবার ফলেই নাকি এরা তৈরি হয়েছিল, এটাই অনুমান করা হচ্ছে।

১৭

মহাকাশ স্টেশন তৈরির পথে

সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে এক নতুন পরীক্ষা শুরু করেছিলেন। একটি স্থায়ী মহাকাশ স্টেশন তৈরির পরিকল্পনা তাঁদের অনেক দিনের; পৃথিবী-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুসন্ধান এবং গবেষণা কাজ পরিচালনার জন্যে যেটি হবে এক আদর্শ ক্ষেত্র। তারই যেন এক প্রাথমিক মহড়া হিসেবে তাঁরা স্যালিয়ুট-১ নামে একটি আরোহীবিহীন মহাকাশযানকে ১৯৭১ সালের ১৯শে এপ্রিল মহাকাশে পাঠালেন। ঠিক চারদিন বাদে ২৩শে এপ্রিল সইয়ুজ-১০ মহাকাশযানে তিন অভিযাত্রী ভ্লাদিমির সাটালভ, অ্যালেক্সি এলিসিয়েভ এবং নিকোলাই রুকাভিসনিকভ স্যালিয়ুটের সঙ্গে সইয়ুজের সংযোগ সাধন করলেন। ৪½ ঘণ্টা যুক্তভাবে মহাকাশ পরিচারণার পর দুটি যানকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে মহাকাশযাত্রীরা নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে এলেন।

আরোহীবিহীন এবং আরোহীযুক্ত দুটি মহাকাশযানকে বিভিন্ন সময়ে এবং দূরত্বে মহাকাশে পাঠিয়ে ওদের মধ্যে সংযুক্তি সাধনের পরীক্ষা এই সর্বপ্রথম সাধিত হল। ভবিষ্যতে মহাকাশ স্টেশন তৈরি হবে ঠিক এইভাবেই—একাধিক যানকে সংযুক্ত করে স্থায়ীভাবে বসবাস এবং গবেষণার একটি প্রশস্ত এবং স্বচ্ছন্দ পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে।

সইয়ুজ-১০-এর অভিযাত্রীরা পৃথিবীতে ফিরে আসার প্রায় দেড় মাস পর ৬ই জুন তারিখে তিন অভিযাত্রী জর্জি ডব্‌রভলস্কি, ভ্লাদিস্লাভ ভলকভ এবং ভিক্টর পাটসায়েভ সইয়ুজ-১১ মহাকাশযানে মহাকাশে পৌঁছে পৃথিবী পরিক্রমারত স্যালিয়ুট-১-এর সঙ্গে সংযোগ সাধন করলেন। মহাকাশ স্টেশন তৈরির আর-একটি মহড়া শুরু হল যেন।

স্যালিয়ুট-সইয়ুজ মিলিতভাবে বেশ বড় একটি যান—এ দৈর্ঘ্যে ২০ মিটার, ওজনে ২৫ টন এবং ভেতরটা এতটাই প্রশস্ত যে স্বচ্ছন্দে দুটি মোটরগাড়ির জায়গা হতে পারে। এক সুদীর্ঘকালীন মহাকাশযাত্রার জন্যে এসেছেন সইয়ুজের অভিযাত্রীরা। জীবদেহের ওপর সুদীর্ঘকালীন ওজনবিহীন অবস্থার প্রভাব

সম্বন্ধেও কিছু নতুন তথ্য পাবার আশা রাখেন সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা, যদিও এ বিষয়ে বহু অভিযানে বহু তথ্যই তাঁরা এপর্যন্ত লাভ করেছেন।

ওজনবিহীন অবস্থার গবেষণা

মানবদেহে রক্তসঞ্চালন, শক্তির ক্ষয়সাধন এবং চলাফেরা প্রভৃতি কাজের ওপর ওজনবিহীন অবস্থার প্রভাব সম্বন্ধে বিপুল পরিমাণ তথ্য এপর্যন্ত সংগৃহীত হয়েছে। ওজনবিহীন অবস্থায় শরীরের সমতা রক্ষার প্রয়োজন যেহেতু নেই, তাই পেশীরা বেশির ভাগ সময়েই বিশ্রাম লাভ করে থাকে। আবার শারীরিক যে-কোন প্রচেষ্টাই কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়, যেহেতু হাত-পায়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাও কমে আসে।

হৃদ্‌যন্ত্রের কাজটা অবশ্য সহজ হয়ে ওঠে, যেহেতু রক্তের কোন ওজন থাকে না এবং স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তকে ঠেলে মাথায় তোলার জন্যে হৃদ্‌যন্ত্রকে যে পরিশ্রমটা করতে হত, সে ঝকমারি থেকেও তার মুক্তি ঘটে। সোজা কথায়, শায়িত অবস্থায় হৃদ্‌যন্ত্রের ওপর চাপটা যতখানি কম পড়ে, মহাকাশচারীর ক্ষেত্রেও অবস্থাটা হয় ঠিক তাই।

কোন প্রত্যঙ্গ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বেশিদিন থাকলে ধীরে ধীরে তার প্রায় মৃত্যু ঘটে। ওজনবিহীন অবস্থায় বেশিদিন যাপন করলে এজাতীয় একটি ব্যাপার ঘটাও বিচিত্র নয়। প্রশ্নটা হল, সুদীর্ঘকালীন ওজনবিহীন অবস্থা থেকে মহাকাশচারী যখন পৃথিবীর স্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে ফিরে আসবেন, তখন প্রত্যঙ্গগুলো ওদের আগের কর্মক্ষমতা লাভ করবে তো ?

ইতিপূর্বে দেখা গেছে, মহাকাশে দীর্ঘকাল যাপনের পর অভিযাত্রীরা যখন পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন, তখন সোজাভাবে দাঁড়াতে তাঁদের বেশ বেগ পেতে হয়েছে। পৃথিবীর জমির দিকে কেউ যেন তাদের চেপে ধরে আছে, এজাতীয় একটা বিচিত্র অনুভূতি তাঁরা বোধ করেছেন। ১৯৭০ সালে ১৮ দিন মহাকাশ জীবন-যাপনের পর পৃথিবীতে ফিরে এসে সোভিয়েট ইউনিয়নের দুই মহাকাশ-যাত্রী আন্দ্রিয়ান নিকোলায়েভ এবং ভিতালী সেবাস্তিয়ানভের এই অস্বাছান্দ্যকর অভিজ্ঞতাই ঘটেছিল। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে তাঁদের বেশ কয়েক দিন লেগেছিল।

সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের ইতিপূর্বে মোটামুটি ধারণা ছিল, একটানাভাবে তিন সপ্তাহের বেশি ওজনবিহীন অবস্থায় থাকা মানবদেহের পক্ষে হয়ত সম্ভব নয়। তার পরের প্রতিক্রিয়াগুলো কিভাবে ঘটবে তা যেমন জানা নেই, তেমনি পৃথিবীর স্বাভাবিক জীবনে আবার অভ্যস্ত হয়ে ওঠার ব্যাপারেও অজ্ঞাত সব সমস্যা মাথা

তুলে দাঁড়াতে পারে। পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতায় অবশ্য এ ধারণা অমূলক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

মহাকাশবিজ্ঞানীরা জীববিদ্যাসংক্রান্ত আর একটি ব্যাপারে বিশেষ উৎকণ্ঠা বোধ করছিলেন। সেটি হল—মহাকাশে অভিযাত্রীদের দেহের অস্থির ক্যালসিয়াম কি কারণে এবং কতটা পরিমাণে তাঁদের রক্তস্রোতের মধ্য দিয়ে ধৌত হয়ে চলেছে। যদি এই 'ক্যালসিয়াম বিস্ফোরণ'কে একটি মাত্রার মধ্যে ধরে রাখা না যায়, তাহলে সেই ক্যালসিয়াম কিডনিতে জমা হয়ে ওঁদের ভারাক্রান্ত করে তুলবে এবং অভিযাত্রীদের জীবন হয়ে উঠবে বিপন্ন। তাই পৃথিবী-পরিক্রমাকালীন যে-কোন একটি দিনের শুরুতেই সোভিয়েট অভিযাত্রীদের প্রথম কাজ ছিল নিজেদের রক্তকে একবার পরীক্ষা করে দেখা।

অভিযানের বিয়োগান্ত পরিণতি

চব্বিশ দিনের এক সুদীর্ঘকালীন মহাকাশজীবন যাপনের পর সইয়ুজ-১১-র তিন অভিযাত্রী যখন পৃথিবীতে ফিরে আসছিলেন তখন এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আকস্মিকভাবে তাঁদের মৃত্যু হল। ঘটনাটা এতই অপ্রত্যাশিত যে বিজ্ঞানীরা প্রথমে ভেবেছিলেন, ওজনবিহীন অবস্থায় সুদীর্ঘকাল যাপনের পর অভিযাত্রীদের হৃদ্‌যন্ত্র এবং অন্যান্য প্রত্যঙ্গ আবার ওজনের পরিবেশে দ্রুতগতিতে খাপ খাইয়ে নিতে অক্ষম হবার ফলেই অভিযাত্রীরা প্রাণ হারিয়েছেন। পরে বিস্তৃত অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল ঘটনাটা তা নয় এবং গুরুতর কোন যান্ত্রিক ত্রুটি বা অজ্ঞাত কোন কারণও এর মূলে নয়। মহাকাশযানের যে দেয়াল নিশ্ছিদ্র থাকার কথা তারই জোড় বা সীল কোন কারণে এক জায়গায় ভেঙে গিয়ে একটি ছোট ছিদ্র তৈরি হয়ে বসে। রেট্রো-রকেট চালু করে পৃথিবীতে ফিরে আসার সময় সেই ছিদ্রটিই বৃহদাকৃতি হয়ে ওঠে এবং ভেতরের সমস্ত বাতাস তার মধ্য দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। ফলে ভেতরে বায়ুর চাপ অস্বাভাবিকভাবে নেমে আসে এবং অভিযাত্রীরা প্রাণ হারান।

আমাদের রক্তস্রোতের মধ্যে নাইট্রোজেন গ্যাস মিশ্রিত অবস্থায় রয়েছে এবং ভেতর থেকে বাইরের দিকে একটি চাপ সৃষ্টি করছে, শারীর-বিদ্যায় যাকে বলা হয় alveolar pressure। দেহের ওপর বায়ুর চাপকে এ যেন সামলে রেখেছে বলা যায়। বায়ুর চাপ হঠাৎ যদি মিলিয়ে যায়, তাহলে রক্তস্রোতের মধ্যে মিশ্রিত নাইট্রোজেন গ্যাস এত দ্রুতগতিতে বাইরে বেরিয়ে আসতে থাকবে যে মনে হতে পারে রক্ত যেন টগবগ করে ফুটতে আরম্ভ করেছে। এই ছোট-ছোট গ্যাসের বুদ্বুদেরা রক্তের স্বাভাবিক সঞ্চালনে বাধার সৃষ্টি করে যে ঘটনাটাকে রূপ

দেয় তাকে বলা হয় air embolism ; বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই air embolism হঠাৎ মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সইয়ুজের অভিযাত্রীদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই ঘটেছিল।

সইয়ুজ মহাকাশযানটি নিরাপদে পৃথিবীতে অবতরণ করে, কিন্তু নামার ৩০ মিনিট আগে অভিযাত্রীদের সঙ্গে বেতার-সংযোগ যখন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল, দুর্ঘটনাটা ঘটে সেই সময়েই। সমগ্র পৃথিবীর মানুষ এই সংবাদে শোকাচ্ছন্ন হয়ে ওঠেন। মহাকাশ-জয়ের অভিযানে আরো তিনজন শহীদ হলেন।

লুনা—২০

লুনা—১৬-র কেরামতিতে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা সারা পৃথিবীর মানুষকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। মানুষের জায়গায় একটি যান্ত্রিক রোবটকে পাঠিয়ে স্বয়ংক্রিয় ড্রিল যন্ত্রের সাহায্যে চাঁদের শিলার নমুনা সংগ্রহ করে আবার তাকে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে এসে এক অভূতপূর্ব সাফল্য তাঁরা অর্জন করেছিলেন। লুনা-২০ ছিল সেই একই পর্যায়ের দ্বিতীয় বড় ঘটনা।

১৯৭১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি পৃথিবী থেকে রওনা হয়ে লুনা-২০ চাঁদের উর্বর সাগর (সী অব্ ফার্টিলিটি) এবং সংকট সাগরের (সী অব্ ক্রাইসিস) মধ্যবর্তী একটি দুর্গম পার্বত্য এলাকায় গিয়ে অবতরণ করে এবং কিছু চান্দ্র শিলা ও মৃত্তিকা খুঁড়ে নিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসে। ইতিপূর্বে তিনটি অ্যাপোলো অভিযানের অভিযাত্রীরা চাঁদের সমুদ্র অঞ্চল থেকেই শিলার নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন, পার্বত্য অঞ্চল থেকে নয়।

বিজ্ঞানীদের অনুমান, চাঁদের মেরিয়া বা সমুদ্র অঞ্চলের বয়স ৩৫০ কোটি বছরের মত। তাঁদের মতে চাঁদের পার্বত্য অঞ্চলের বয়স হবে এর চেয়েও বেশি। কাজেই সেই অঞ্চলের শিলার নমুনা সংগ্রহ এবং গবেষণার গুরুত্ব যথেষ্ট রয়েছে, সন্দেহ নেই।

লুনা-২০-র সংগৃহীত শিলার রাসায়নিক বিশ্লেষণে ওর মধ্যে যে সব খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেল তারা হল প্লেজিওক্লেস, পাইরক্সিন, ইলমেনাইট, অগাইট, অ্যানরথোসাইট ইত্যাদি ; সবচেয়ে বেশি পরিমাণে রয়েছে অ্যানরথোসাইট, তারপরে হল অগাইট এবং ইলমেনাইট। এসব খনিজ পদার্থের অবস্থিতি থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে চান্দ্র শিলা হল প্রধানত ব্যাসল্ট জাতীয় আগ্নেয় শিলা।

অনুসন্ধানে আরো জানা গেল, চান্দ্র শিলা বেশ জোরালো চৌম্বকক্ষেত্রের পরিবেশের মধ্যেই তরল থেকে কঠিন অবস্থা লাভ করেছিল। নমুনাগুলোর

পরীক্ষায় বোঝা গেল, ৩৫০ কোটি বছর আগে চাঁদের চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তির মাপ ছিল পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের বর্তমান শক্তির প্রায় শতকরা দশ ভাগ বা ওর নিজের বর্তমান শক্তির তুলনায় প্রায় ১০০০ গুণ বেশি জোরালো।

পটাসিয়াম এবং আর্গন, রুবিডিয়াম এবং স্ট্রনসিয়াম, ইউরেনিয়াম এবং সিসে প্রভৃতি উপাদানের আইসোটোপগুলোর পারস্পরিক অনুপাত থেকে চান্দ্র শিলার বয়সের যে হিসেব পাওয়া গেল, তা থেকে অনুমিত হয় চাঁদ আজ থেকে প্রায় ৪৬০ কোটি বছর আগে গড়ে উঠেছিল।

সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা মানুষের তুলনায় যান্ত্রিক রোবট পাঠিয়ে চান্দ্র গবেষণার ওপরেই গুরুত্ব আরোপ করছেন বেশি। চাঁদে মানুষকে পাঠানোর প্রতিযোগিতায় তাঁরা নামেন নি কারণ এতে খরচের পরিমাণ অত্যধিক। মানুষের জৈবিক ব্যবস্থার জন্যে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম মহাকাশযানে এতটাই স্থান অধিকার করে বসে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার যন্ত্রপাতির জন্যে যথেষ্ট জায়গার ব্যবস্থা করা যায় না। এছাড়া অভিযাত্রীদের নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার দুশ্চিন্তা তো রয়েছেই।

১৮

অ্যাপোলো—১৫, ১৬, ১৭

পরবর্তী চন্দ্র অভিযান শুরু হল ১৯৭১ সালের ২৭শে জুলাই তারিখে। অভিযাত্রী ডেভিড স্কট, জেমস আরউইন এবং অ্যালফ্রেড ওয়ার্ডেন পৃথিবী থেকে অ্যাপোলো-১৫ মহাকাশযানে রওনা হলেন এবং চাঁদের জমিতে নির্বিঘ্নেই এসে নামলেন। এবারে অবতরণ-ক্ষেত্রটি নির্বাচিত হয়েছিল ৪০০০ মিটার উঁচু চাঁদের অ্যাপেনাইন পাহাড় ও ৩৬০ মিটার গভীর হ্যাডলি রিল (Hadley rille) নামে একটি বড় ফাটলের কাছাকাছি একটি জায়গা।

চাঁদে অ্যাপোলো-১৫-র অভিযাত্রীরা সবশুদ্ধ কাটিয়েছেন ৬৭ ঘণ্টা, এর মধ্যে তিনবার ১৯ ঘণ্টার মত সময় তাঁরা একটি ব্যাটারিচালিত জীপ গাড়িতে চাঁদের জমির ওপর পরিক্রমা করেছেন।

যে সব শিলার নমুনা অভিযাত্রীরা সংগ্রহ করে এনেছেন তার মধ্যে একটি ছিল মহার্ঘতম—স্পার নামে একটি জ্বালামুখের মধ্যে এর সন্ধান পাওয়া যায়। এই শিলার নমুনাটি দেখে মনে হচ্ছিল এ যেন চাঁদের একেবারে আদি শিলা অর্থাৎ যাদের সমবায়ে চাঁদ একদিন গড়ে উঠেছিল। অ্যানরথোসাইট নামে আর একটি শিলা সংগৃহীত হয় যার মধ্যে কেলাসভবনের চমৎকার সুন্দর নিদর্শন ছিল। চাঁদের ভূকম্প প্রক্রিয়া এবং উল্কাপাতের সহস্র সংঘাতের আক্রমণ থেকে ঐ শিলা তার গঠনের মধ্যে বিশাল কেলাসখণ্ডগুলোকে কিভাবে অবিকৃত রাখতে সক্ষম হল, সেটাই ছিল বিশেষজ্ঞদের কাছে এক বড় আশ্চর্যের ব্যাপার।

চাঁদের জমিতে পূর্ববর্তী তিনটি চন্দ্র অভিযানে সংগৃহীত তথ্য থেকে বিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছিলেন যে পৃথিবীর মত চাঁদের কোন স্তর-বিন্যাস নেই। কিন্তু অ্যাপোলো ১৫-র অনুসন্ধানে ঠিক তার উল্টো তথ্যটাই ধরা পড়ল। চাঁদের জমিতে একটি ত্রিভুজের আকারে তিনটি সিস্‌মোমিটার যন্ত্র বসিয়ে এবং কৃত্রিমভাবে তৈরি একটি ভূকম্পের তরঙ্গকে চাঁদের অভ্যন্তরভাগ থেকে প্রতিফলিত আকারে লিপিবদ্ধ করে জানা গেল, পৃথিবীর মত চাঁদেরও একটি স্তর-বিন্যাস রয়েছে।

চাঁদের গঠনপ্রকৃতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা এখন যে ধারণাটি গ্রহণ করতে চলেছেন তা হল এই যে চাঁদে ২৫ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত একটি শিলাস্তর রয়েছে। তার তলায় রয়েছে অজ্ঞাত বস্তুপুঞ্জের আর একটি স্তর এবং এর নিচে ১০০ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত অনেক বেশি ঘনবিন্যস্ত একটি শিলাস্তর।

চাঁদে একটি তাপ-প্রবাহের পরীক্ষার (heat flow experiment) ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। চাঁদের অভ্যন্তরভাগ কি পরিমাণ তাপ মহাকাশে বিকিরণ করছে, এই পরীক্ষার দ্বারা তার একটি সরাসরি পরিমাপ গ্রহণ করা সম্ভব হবে এবং এটাও নিখুঁতভাবে জানা যাবে যে চাঁদের অভ্যন্তরভাগ বর্তমানে কি পরিমাণ তপ্ত অথবা শীতল অবস্থায় রয়েছে এবং অতীতেই বা ওর অবস্থাটা কি ছিল।

অ্যাপোলো-১৬

পরবর্তী চন্দ্র অভিযান অ্যাপোলো-১৬-র যাত্রা শুরু হল ১৯৭২ সালের ১৬ই এপ্রিল তারিখে। অভিযাত্রী তিনজন হলেন জন ইয়ং, চার্লস ডিউক এবং টমাস ম্যাটিংলি।

চাঁদে অবতরণের আগেই এক বিপদের মধ্যে এসে পড়লেন অভিযাত্রীরা। লুনার মডিউল মহাকাশযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পর কমাণ্ড মডিউলের নিজস্ব এঞ্জিনকে স্বল্প সময়ের জন্যে চালু করে ওর অবস্থানগত পরিবর্তনের একটি বিশেষ কর্মসূচী পালন করতে হয়, যাতে চন্দ্রযান চাঁদ থেকে ফিরে আসার পর দুটি যানের মধ্যে খুব সহজেই সংযোগ সাধন করা যায়। কিন্তু যথাসময়ে কমাণ্ড মডিউলের এঞ্জিন চালু হল না, এবং ভবিষ্যতের জন্যে বিপদ জমা হয়ে থাকল। পরবর্তীকালে দুটি যানের মধ্যে সংযোগ যথাযথভাবে না ঘটলে তিনজন অভিযাত্রীর জীবনই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

যাত্রাশুরুর আগেই মহাকাশযানের মধ্যে কয়েকটি ত্রুটি ধরা পড়েছিল, যেমন কমাণ্ড ও লুনার মডিউলকে বিচ্ছিন্ন করার যান্ত্রিক ব্যবস্থা কয়েকটি আপৎকালীন অবস্থায় অকর্মণ্য হয়ে পড়া, বুস্টার রকেটের গতিপথনিয়ন্ত্রক গাইরোস্কোপ যন্ত্র-ব্যবস্থা সঠিকভাবে কাজ না করা ইত্যাদি। তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা খানিকটা ঝুঁকি নিয়েই অভিযান শুরু করলেন, কারণ ছোঁড়ার নির্দিষ্ট সময় (launch window) পেরিয়ে গেলে আবার একমাস অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় থাকবে না।

এবারে চাঁদে নামার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে দেকার্তে পর্বতের (পৃথিবীর এক দার্শনিকের নাম অনুসারে নামাঙ্কিত) ওপর একটি জায়গা, অ্যাপোলো-১১-র

অবতরণ-ক্ষেত্র থেকে যার উচ্চতা হল প্রায় ২২০০ মিটারের মত বেশি। চাঁদের জমির শতকরা ৮০ ভাগ জায়গা জুড়ে রয়েছে এই পার্বত্য অঞ্চল—বয়সের বিচারে এ চাঁদের মেরিয়া বা সমুদ্র-অঞ্চলের চেয়ে প্রাচীন। এই অঞ্চল থেকে সংগৃহীত শিলার নমুনায় চাঁদের অনেক প্রাচীন ইতিহাস ধরা পড়বে—এই ছিল বিজ্ঞানীদের ধারণা।

প্রাচীন শিলার সন্ধানে অভিযাত্রীরা ঘুরে বেড়িয়েছেন চাঁদের অতি উঁচু একটি পাহাড়ের পাদদেশে এবং একটি অতি গভীর জ্বালামুখের প্রান্তদেশ বরাবর। কিন্তু অনুসন্ধানের ফল হয়েছিল হতাশাব্যঞ্জক।

চাঁদের অভ্যন্তরভাগ থেকে তাপ প্রবাহ পরিমাপের জন্যে অভিযাত্রীরা একটি পারমাণবিক শক্তিচালিত বৈজ্ঞানিক স্টেশনকে চাঁদের জমিতে বসিয়েছিলেন, কিন্তু যে বৈদ্যুতিক তারের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক তথ্য চন্দ্রযানের বেতার-কেন্দ্রে পৌঁছে সেখান থেকে পৃথিবীতে প্রেরিত হচ্ছিল, তা হঠাৎ অভিযাত্রী ইয়ং-এর পায়ে জড়িয়ে ছিঁড়ে যায় এবং সমস্ত পরীক্ষাটি বানচাল হয়ে পড়ে। অভিযানে এটিই ছিল অন্যতম প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মসূচী।

একটি ক্ষুদে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার চাঁদে প্রতিষ্ঠা করা ছিল এবারের অভিযানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা-কাজ। অভিযাত্রীরা চাঁদে একটি 'আল্‌ট্রাভায়োলেট ক্যামেরা' বসান, মহাকাশে বহু দূরবর্তী অঞ্চলের হাইড্রোজেন গ্যাসের মেঘের অস্তিত্ব যার চোখে ধরা পড়বে। হাইড্রোজেন হল মহাবিশ্বের সবচেয়ে বিপুলতম উপাদান—শতকরা প্রায় ৯০ ভাগের মত। এদের মেঘপুঞ্জ থেকে যে আলট্রাভায়োলেট রশ্মি বিকিরিত হয়, তার গবেষণায় মহাবিশ্বের বিবর্তন এবং বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্বন্ধে আরো স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা গ্রহণের আশা রাখেন বিজ্ঞানীরা। পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডল এবং চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাবে মহাবিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা রশ্মি, যেমন আলট্রাভায়োলেট রশ্মি, রঞ্জন রশ্মি, গামা রশ্মি, মহাজাগতিক রশ্মি ওদের প্রাথমিক চরিত্র নিয়ে পৃথিবীর জমি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না এবং মাঝরাস্তায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে বন্দী হয়ে পড়ে। পৃথিবীর জমিতে বসে বিজ্ঞানীরা তাই মহাবিশ্বের বহু খবর থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। অ্যাপোলো-১৬-র পরীক্ষায় তাঁদের কিছুটা উদ্দেশ্য সফল হবে।

অ্যাপোলো-১৭

অ্যামেরিকার বিজ্ঞানীদের পরিকল্পিত তৎকালীন পর্যায়ের সর্বশেষ চন্দ্র অভিযান শুরু হল ১৯৭২ সালের ৬ই ডিসেম্বর। অভিযাত্রী তিনজন হলেন

ইউজীন সার্নান, হ্যারিসন স্মিট এবং রোনাল্ড ইভান্স্। এ'দের মধ্যে হ্যারিসন স্মিট ছিলেন একজন ভূবিদ্। এই প্রথম একজন বিজ্ঞানীকে মহাকাশযাত্রীরূপে নির্বাচন করা হল।

চাঁদের টাউরাস লিট্রো (টাউরাস লিট্রো) নামে যে জায়গাটি এবার অবতরণের জন্যে বেছে নেয়া হয়েছিল, সেটি চাঁদের উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত একটি উপত্যকা—'সী অব্ সেরেনিটি' বা শান্তি সাগরের প্রান্তভাগে এর অবস্থান। দুপাশে ২১০০ মিটার উঁচু দুটি পর্বতমালা, এবং সমগ্র এলাকাটি জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র জ্বালামুখ এবং ছোট-বড় নানা চেহারার পাথরের খণ্ড। অভিযাত্রী ভূবিদ্ স্মিটের অনুসন্ধান থেকে বোঝা গেল, উপত্যকাটি প্রায় একশো কোটি বছর আগে সক্রিয় আগ্নেয়গিরির ক্রীড়াভূমিতে পরিণত হয়ে বসেছিল।

অভিযাত্রীরা লুনার রোভার বা চান্দ্র জীপগাড়িতে চন্দ্র-পরিক্রমার সময় একটি গভীর, নারঙ্গী রঙের জ্বালামুখের সন্ধান পান, চাঁদের আগ্নেয় প্রক্রিয়ার সর্বশেষ পর্যায়ে যেটির সৃষ্টি হয়ে থাকবে। অভিযাত্রী স্মিট তিনটি চমৎকার সুন্দর কাঁচের মত বস্তুখণ্ডও কুড়িয়ে পান—উল্কার সংঘাতজনিত প্রচণ্ড তাপে যেগুলো তৈরি হয়েছিল বলে মনে হয়। এছাড়া নানা রঙের এবং গঠনের অজস্র শিলা সংগ্রহ করেন অভিযাত্রীরা, যার ফলে টাউরাস লিট্রো উপত্যকা-ভূমিটিকে স্মিট ভূবিদদের এক স্বর্গরাজ্য বলে অভিহিত করেছিলেন।

চন্দ্রযানে চাঁদ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় অভিযাত্রীরা শান্তি সাগর অঞ্চলে আরো বেশ কয়েকটি লাল এবং মরচে রঙের জ্বালামুখ দেখতে পান। বিজ্ঞানীরা এটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বলে অভিহিত করছেন। জনৈক বিশেষজ্ঞের মতে চাঁদের জমির ওপর শিলাস্তর ও মৃত্তিকার মধ্যে যে লোহা রয়েছে, তা জমির ফাটলের মধ্য দিয়ে অপসৃয়মান জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে এসে মরচে ধরে গিয়ে জ্বালামুখের মধ্যকার নারঙ্গী রঙকে তৈরি করেছে। এ থেকে হয়ত এটাই অনুমান করতে হবে যে প্রায় ৩০০ কোটি বছর আগে চাঁদের সমুদ্রগুলো যখন আগ্নেয়গিরির লাভার দ্বারা প্লাবিত হয়ে বসে, ভূতাত্ত্বিক বিচারে চাঁদের মৃত্যু কিন্তু তখনই ঘটে নি। আনুমানিক একশো কোটি বছর আগে পর্যন্তও চাঁদের হৃৎস্পন্দন ছিল সক্রিয়। চাঁদের আগ্নেয়গিরিগুলোর জন্ম হয়েছিল হয়ত চান্দ্রপৃষ্ঠের অনেক গভীরে এবং অভিযাত্রীরা যে মৃত্তিকার নমুনা এবারে সংগ্রহ করলেন তা চাঁদের দৃশ্যমান পৃষ্ঠভাগের অভ্যন্তরের ছবিটাই আমাদের সামনে তুলে ধরবে। চাঁদের গভীর উপত্যকাগুলো এক সময়ে আগ্নেয় ছাইয়ের নিচে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, এই ধারণাটি বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সার্বিক স্বীকৃতি লাভ করতে চলেছে।

১৯

চাঁদ সম্বন্ধে যা জানা গেল

প্রখ্যাত চান্দ্রবিজ্ঞানী হ্যারল্ড সি. ইউরে একবার বলেছিলেন, চাঁদের এক টুকরো বস্তু হাতে পেলে তিনি সৌরজগতের গোটা ইতিহাসটাই বলে দিতে পারবেন। এই ধারণার সঙ্গে সবাই যে একমত ছিলেন তা নয়, তবে অনেকেই আশা করেছিলেন যে চাঁদে পৃথিবী এবং আমাদের প্রতিবেশী গ্রহদের জন্ম এবং বিবর্তনের যে ইতিকথা লুকিয়ে রয়েছে, চাঁদে মানুষের পদার্পণের মধ্য দিয়ে তার অনেকটাই হয়ত জানা যাবে।

এ পর্যন্ত চাঁদে ছ-টি অভিযানের মধ্য দিয়ে বার জন অভিযাত্রী বিভিন্ন আকারের এবং রঙের প্রায় ২০০ কিলোগ্রাম শিলা ছ-টি পূর্বনির্ধারিত জায়গা থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন। এদের বিস্তৃত রাসায়নিক বিশ্লেষণ সত্ত্বেও চাঁদ সম্বন্ধে সেই আদি প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব আমরা কিন্তু আজও লাভ করতে পারি নি, যেমন—(১) চাঁদ এল কোথা থেকে, (২) চাঁদ কিভাবে গড়ে উঠল, (৩) চাঁদ কি কি উপাদান দিয়ে তৈরি এবং (৪) চাঁদের বয়সই বা কত?

আদি শিলার সন্ধানে

চাঁদ সম্বন্ধে এই মৌলিক প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব আজও না পাবার প্রথম এবং প্রধান কারণ হল এই, যে ২০০ কিলোগ্রাম শিলা বিভিন্ন অ্যাপোলো অভিযানের অভিযাত্রীরা সংগ্রহ করেছেন, তার কোনটিই চাঁদের আদি উপাদান নয়। বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় সমস্ত শিলাই ওদের আদি চেহারা থেকে রূপান্তরিত হয়ে বসে আছে। অ্যাপোলো-১৬ অভিযানে সংগৃহীত যে শিলাটিকে বিজ্ঞানীরা চাঁদের 'আদি শিলা' বলে অনুমান করেছিলেন সেটি খুবই প্রাচীন শিলা সন্দেহ নেই কিন্তু আসলে বস্তুটি হল একটি ব্রেকিয়া (breccia) বা এমন সব টুকরো বস্তুর সমবায়ে তৈরি, যেগুলো বর্তমান অবস্থায় গড়ে ওঠবার আগে অন্য রূপে ছিল। হ্যারল্ড ইউরে প্রমুখ বেশির ভাগ চান্দ্রবিজ্ঞানীই এ ব্যাপারটায় বিস্মিত হয়েছেন, কেননা তাঁরা আশা করেছিলেন যে চাঁদে যেহেতু জল বা বাতাসরূপী ক্ষয়কাজের কোন উপাদান নেই, তাই সেখানে এমন আদি

শিলার সন্ধান পাওয়া যাবে যারা চাঁদের জীবনের প্রাচীন সমগ্র ইতিহাসটাকে আমাদের সামনে একটি ছবির মতই তুলে ধরবে।

এ সত্ত্বেও বহু বিজ্ঞানীই বিশ্বাস করেন যে আমাদের বৃদ্ধ প্রতিবেশিটিকে অন্তরঙ্গভাবে জানার একমাত্র মাধ্যম হল ওর শিলা। একদিন হয়ত আরো সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে চান্দ্র শিলাই সৌরজগত সম্বন্ধে বহু নতুন তথ্য আমাদের সামনে তুলে ধরবে।

চাঁদে মূলত দু-ধরণের শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে। চাঁদের মেরিয়া বা সমুদ্র অঞ্চলে রয়েছে এক ধরনের শিলা—যার বর্ণ হল কালো, যাতে লোহার আধিক্য বেশি, অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণ খুবই কম এবং বয়সের বিচারে যাকে নবীন বলা যায়।

আর এক ধরণের শিলা পাওয়া গেছে চাঁদের পার্বত্য অঞ্চলে—যার রং হল হালকা, যাতে অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণ বেশি এবং লোহার পরিমাণ খুবই কম, যার গঠনপ্রকৃতি তুলনায় অনেক বেশি জটিল এবং বয়সের বিচারে মেরিয়া অঞ্চলের শিলার তুলনায় যা অনেক বেশি প্রাচীন।

চাঁদে প্রাণ

চাঁদে যে কোন প্রাণ নেই এবং কোনদিন ছিলও না, বিভিন্ন চন্দ্র অভিযানে আগেকার এই পুরনো ধারণাটিই সুপ্রমাণিত হয়েছে। চাঁদে কোন বীজাণু নেই, তাই কোন রোগ সৃষ্টির সম্ভাবনাও নেই। বিশেষজ্ঞেরা এই বিষয়ে এতটাই নিশ্চিত হতে পেরেছিলেন যে চাঁদ থেকে ফিরে আসার পর অ্যাপোলো-১২-র পরবর্তী অভিযানগুলোর অভিযাত্রীদের চাঁদের বীজাণুমুক্ত হবার জন্যে আর একুশ দিনের আন্তরীণ অবস্থা যাপন করতে হয় নি। এটাই অনুমিত হচ্ছে যে চাঁদে প্রাণসৃষ্টির জন্যে প্রয়োজনীয় মৌল রাসায়নিক পদার্থগুলো গড়ে ওঠবার আগেই ওখানে প্রাণের বিবর্তনের অনুকূল পরিবেশটার হঠাৎ মৃত্যু ঘটেছিল। আজকের চাঁদ সেই প্রাণহীন পরিবেশের মৃতদেহটাকেই যে ধারণ করে রয়েছে।

সৌরজগতের ইতিহাস

বিজ্ঞানীদের বর্তমান ধারণা, মহাকাশে সঞ্চরমান একটি ধুলো ও গ্যাসের মেঘ থেকে বস্তুপুঞ্জ এক জায়গায় জড়ো হয়ে আজ থেকে প্রায় ৪৬০ কোটি বছর আগে চাঁদের জন্ম হয়েছিল। চাঁদে সবচেয়ে প্রাচীন যে শিলার সন্ধান বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন, তার বয়স হল তাই। পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রাচীন যে শিলার সন্ধান এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে, তার বয়স হল ৩৬০ কোটি বছরের মত। অর্থাৎ,

পৃথিবীতে হারিয়ে যাওয়া সৌরজগতের প্রায় ৩০০ কোটি বছরের ইতিহাস চাঁদের শিলার মধ্যে লুকিয়ে আছে।

চাঁদে যেহেতু কোন বাতাস নেই, তাই সূর্যের বিভিন্ন বিকিরণ এবং সৌর-কণিকাস্রোত চাঁদের দেহের ওপর যে স্বাক্ষর লিপিবদ্ধ করে চলেছে, তা থেকে বিজ্ঞানীরা সূর্যদেহের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার বহু কোটি বছরের পুরনো ইতিহাস রচনা করতে পারবেন। চাঁদের জমি হল মহাকাশে মানুষের আয়ত্তের মধ্যে একমাত্র জায়গা, যেখানে সূর্যের অতীত জীবনের বহু অজানা তথ্য লাভ করা সম্ভবপর হবে।

বিভিন্ন তথ্যের বিচার থেকে যা অনুমিত হচ্ছে তা হল এই, চাঁদের ভূতাত্ত্বিক বিবর্তন আজ থেকে প্রায় ৩০০ কোটি বছর আগেই নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে। পৃথিবীতে কিন্তু এখনো ভূকম্প এবং আগ্নেয় প্রক্রিয়া চলছে এবং ভূতাত্ত্বিক বিচারে পৃথিবী চাঁদের তুলনায় বহুগুণ বেশি সক্রিয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। চাঁদে এখনো কিছু-কিছু ভূ-কম্প ঘটছে বটে, কিন্তু ওরা নিতান্তই দুর্বল প্রকৃতির।

চাঁদ সম্বন্ধে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হল এই যে চাঁদের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা প্রতি এক মিটার গভীরতার সঙ্গে ৩৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট—এই হারে বেড়ে চলে। অ্যাপোলো-১৫-র অভিযাত্রীরা চাঁদের এক মিটার গভীরে একটি তাপমাত্রা-নির্ধারক যন্ত্রকে প্রবেশ করিয়ে সরাসরি এই পরিমাপটি সংগ্রহ করে-ছিলেন। এই যে তাপের প্রবাহ, তা পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপ-প্রবাহের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ এবং পৃথিবীর সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে চাঁদের অভ্যন্তরে এক বিপুল-পরিমাণ তেজস্ক্রিয় বস্তুর অবস্থিতিকেই নির্দেশ করছে।

ম্যাসকন প্রসঙ্গে

ইতিপূর্বে অ্যাপোলো-৮ মহাকাশযানের চন্দ্র-পরিক্রমাপথের পরিমাপ থেকে বিজ্ঞানীরা দেখেছিলেন, চাঁদের অভিকর্ষের জোর তার পৃষ্ঠভাগের সর্বত্র সমান নয়। তাঁরা অনুমান করেছিলেন, চাঁদের ত্বকের নিচে লোহা ও নিকেল দ্বারা গঠিত উল্কাপিণ্ডজাতীয় অত্যন্ত ঘন বস্তুদের অবস্থানের জন্যেই ব্যাপারটা ঘটছে। এদের নাম দেয়া হয়েছিল ম্যাসকন।

ম্যাসকনদের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সব তত্ত্ব উপস্থাপিত করা হয়েছে, ওদের মধ্যে হ্যারল্ড ইউরের ধারণাটিই বেশি যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয়। তাঁর মতে ম্যাস-কনদের উৎস চাঁদ নয়, বাইরের কোন বিশাল বস্তু, সম্ভবত উল্কা বা ধূমকেতু, যাদের সংঘাতে চাঁদের মেরিয়াগুলো তৈরি হয়েছিল। ইউরের মতে এইসব

সংঘাতের ধ্বংসাবশেষ চাঁদের পৃষ্ঠভাগের প্রায় ৫০ কিলোমিটার নিচে ঘন বস্তু-পিণ্ডের আকারে জমা হয়েছিল।

চাঁদের গঠনপ্রকৃতি সম্বন্ধে এখনো কোন নির্দিষ্ট ধারণা পোষণ করা সম্ভবপর হচ্ছে না। পূর্ববর্তী অ্যাপোলো অভিযানগুলোয় চন্দ্রপৃষ্ঠে কৃত্রিম ভূকম্প তৈরি করে অনুমান করা হচ্ছিল যে চাঁদের ত্বক প্রায় ৬০ কিলোমিটার পুরু। অ্যাপোলো-১৭-র দুটি পরীক্ষায় এই ধারণা বাতিল হতে চলেছে। চাঁদের ত্বক এখন দেখা যাচ্ছে ২৫ কিলোমিটারের মত পুরু; এই তথ্যটিই যদি সঠিক বলে প্রমাণিত হয় তাহলে পূর্ববর্তী তথ্যের ওপর ভিত্তি করে চাঁদের গঠন-প্রকৃতি সম্বন্ধে এপর্যন্ত যতগুলো তাত্ত্বিক মডেল দাঁড় করানো হয়েছিল, ওদের সবগুলোকেই হয়তো বাতিল করতে হবে।

চাঁদে জলের সন্ধানে

চাঁদের জমিতে প্রথম তিনটি অ্যাপোলো অভিযানের পর সেখানে জলের কোন সন্ধান পাবার আশা বিজ্ঞানীরা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। কিন্তু কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু বিজ্ঞানী দাবি করলেন যে চাঁদের শিলার একটি নমুনার মধ্যে লোহার এমন একটি কেলাসের সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন, জলের সান্নিধ্য ছাড়া যার পক্ষে অমন কঠিন অবস্থা লাভ করা আদৌ সম্ভবপর নয়। চাঁদের শিলার সামগ্রিক রাসায়নিক বিচারে সেখানে অবশ্য জলের অস্তিত্বের বিরুদ্ধেই সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে।

ইতিপূর্বে অ্যাপোলো-১১-র অভিযানে সংগৃহীত শিলার নমুনার বিস্তৃত পরীক্ষামূলক অনুসন্ধানে বিজ্ঞানীরা ওর মধ্যে অতি স্বল্প পরিমাণে হাইড্রোজেনের সন্ধান পান,—অবশ্য এর অনুপাত ছিল দশ লক্ষ ভাগ উপাদানের মধ্যে কুড়ি ভাগ মাত্র। তা থেকে আশা করা গিয়েছিল যে চাঁদের জমির নিচে শিলাস্তরের মধ্যে সামান্য কিছু জল থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু পরে বিজ্ঞানীরা বুঝলেন, এই হাইড্রোজেনের উৎস হচ্ছে সৌর বায়ু—সূর্যের বাতাসের হাইড্রোজেন কণিকারা চাঁদের জমি বরাবর পৌঁছে ওর গায়ে যেন লেপটে যাচ্ছে। তাহলেও চাঁদের অনেক গভীরে শিলাস্তরের মধ্যে হাইড্রোজেনের অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে বিজ্ঞানীরা একেবারে নাকচ করছেন না।

চাঁদ থেকে সংগৃহীত সব শিলাই হল আগ্নেয় শিলা, কিন্তু এই শিলার কিছু নমুনার মধ্যে অভ্র, অ্যামফিবোল এবং আরেগোনাইট নামে এমন তিনটি খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে, যাদের সাধারণত পাললিক (সেডিমেণ্টারি) শিলার মধ্যেই দেখা যায়। চাঁদ থেকে এপর্যন্ত পাললিক

শিলার কোন নমুনাই কিন্তু সংগৃহীত হয় নি। পৃথিবীতে ঐ তিনটি খনিজ পদার্থের মধ্যে সামান্য পরিমাণ জল রয়েছে, যার অনুপাত হল প্রতি একশো ভাগ উপাদানের মধ্যে একভাগ বা দু-ভাগের মত। চাঁদে বিভিন্ন খনিজের মধ্যে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন ছিল, তা অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে মিলিত হয়ে গড়ে তুলেছে ক্লোরিনকে।

চাঁদের জমির ওপর বাস করা এবং চলা বা কাজ করার ব্যাপারে যে সব অসুবিধের কথা বিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরেই বলে আসছিলেন, দেখা গেল তার বেশির ভাগটাই ছিল অমূলক। অভিযাত্রীরা চাঁদে বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই চলাফেরা এবং অন্যান্য কাজ করতে পেরেছেন।

অ্যাপোলো, না লুনাখোদ?

বিভিন্ন অ্যাপোলো অভিযানের মাধ্যমে চাঁদ সম্বন্ধে যেমন বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে যার মূল্যায়ন চলবে দীর্ঘকাল ধরে, তেমনি এই সমগ্র পরিকল্পনাই বিজ্ঞানের অন্য বহু বিভাগকে সমৃদ্ধ করেছে। বিশেষ করে শিল্পবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, বনজবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা এবং চিকিৎসা ও জীববিদ্যা যে বিপুল পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু জ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার এই সমৃদ্ধির পেছনে যে বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় হয়েছে এবং চাঁদে মানুষকে পাঠাতে গিয়ে যে বিপদের ঝুঁকির মধ্যে অভিযাত্রীদের বারবার ঠেলে দেয়া হয়েছে—তার যাথার্থ্য সম্বন্ধে যুক্তিগ্রাহ্য সমালোচনা উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকেই।

অনেক বিজ্ঞানীই বলছেন, চাঁদের জমিতে অনুসন্ধান এবং গবেষণাকাজের জন্যে আরোহীবিহীন স্বয়ংক্রিয় যান পাঠিয়ে অনেক সুষ্ঠুভাবে এবং কম খরচে একই পরিমাণ তথ্য সংগৃহীত হতে পারত। এই বিষয়টির ওপর সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা সব সময়েই গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং লুনা-১৬, লুনাখোদ এবং লুনা-২০ প্রভৃতি চন্দ্র অভিযানের মাধ্যমে হাতে-নাতে তার পরিচয়ও দিয়েছেন। তাঁদের মতে, এ-জাতীয় একটি পরিকল্পনার ব্যয়—চাঁদে মানুষকে পাঠানোর একটি প্রচেষ্টার রূপায়ণে যে ব্যয়, তার ১/২০ থেকে ১/৫০ ভাগ মাত্র। এক-একটি অ্যাপোলো অভিযানে খরচ হয়েছে ৩০০ কোটি টাকার মত।

সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা আরো বলেছেন, সমস্ত গ্রহজগতের অনুসন্ধানের কাজেও আরোহীবিহীন স্বয়ংক্রিয় যানই হবে আদর্শ মাধ্যম। একমাত্র মঙ্গল গ্রহ ছাড়া অন্য কোন গ্রহে মানুষকে নামানোর কোন চিন্তাই বর্তমানে করা সম্ভবপর নয়।

২০

চাঁদ মানুষের কোন উপকারে আসবে কি ?

চাঁদে মানুষকে নামানোর মধ্য দিয়ে মহাকাশ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি বড় সাফল্য অর্জিত হয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে গিয়ে এক বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় করতে হয়েছে। অনেকেই তখন প্রশ্ন তুলেছিলেন, পৃথিবীতে সামগ্রিকভাবে মানুষের জীবনের বহু প্রয়োজনীয় সমস্যার সমাধান যখন করা সম্ভব হয়নি, সেক্ষেত্রে এ-জাতীয় বিলাসবহুল ব্যয়ের যৌক্তিকতা আছে কি ? পৃথিবীতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু গবেষণা-কাজ রয়েছে যার দ্বারা মানুষ সরাসরি উপকৃত হতে পারে ; সেরকম কোন খাতে এই অর্থের বিনিয়োগ হয়ত অনেক বেশি ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারত।

বিভিন্ন মহল থেকে এ প্রসঙ্গে যে বক্তব্য হাজির করা হয়েছিল তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, এ কথা বলা যায় না। তবে বিজ্ঞানজগতে কোন একটি ঘটনা মানুষের জীবনে আদৌ কল্যাণপ্রসূ হয়ে উঠতে অতীতেও সময় নিয়েছে। চন্দ্র অভিযানের যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত সম্ভাবনাগুলো আজ আমরা বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠতে দেখছি না, আগামী ভবিষ্যতে তার রেখাচিত্র আরো অনেক বেশি পরিমাণে স্পষ্ট হয়ে উঠবে, সন্দেহ নেই।

আজ থেকে একশ বছর বাদে একটি দিনের কথা আমরা ভাবছি যখন পৃথিবী থেকে চাঁদে যাবার ব্যাপারটা দাঁড়াবে আজকে কলকাতা থেকে বিমানে পৃথিবীর যে-কোন জায়গায় পৌঁছনোর মত একটি সাধারণ ঘটনা। তখন চাঁদে গবেষণা-কাজ এবং বসবাসের জন্যে মানুষ যে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তার একটি মোটামুটি পরিচয় আমরা নেবার চেষ্টা করতে পারি।

একটি নিখুঁত বায়ুশূন্য এলাকা

চাঁদে বায়ুমণ্ডলের অভাব মানুষের জীবনের পক্ষে এক প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে বসে আছে। কিন্তু গোটা চাঁদের ২৪০ লক্ষ বর্গ-কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এই নিখুঁত বায়ুশূন্য প্রদেশটি বিজ্ঞানীদের কাছে আগামী ভবিষ্যতে এক

হাতে-পাওয়া স্বর্গের মত হয়ে উঠবে। পৃথিবীতে এ-জাতীয় একটি পরিবেশ তৈরীর জন্যে বিজ্ঞানীদের বিপুল পরিমাণে অর্থব্যয় করতে হয়। ইলেকট্রনিক টিউব, কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ, হিয়ারিং এড প্রভৃতি যেসব বস্তুকে বায়ুশূন্য পরিবেশ ছাড়া তৈরি করা যায় না, ওরা ভবিষ্যতে চাঁদের কারখানাগুলোতে অনেক কম খরচে তৈরি হতে পারবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করেন।

চাঁদে বাতাস না থাকার ফলে ওর পৃষ্ঠভাগের ধুলোর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। ফলে সবচেয়ে বেশি ঘনত্বযুক্ত অতি বিশুদ্ধ যে সব ধাতু তৈরির জন্যে পৃথিবীতে অতি ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থার সৃষ্টি করতে হয় চাঁদের স্বাভাবিক পরিচ্ছন্ন পরিবেশে তার কোন প্রয়োজনই হবে না। ঐ-সব ধাতু সেখানে তৈরি করা যাবে সহজেই।

পরমাণু-বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে চাঁদ হবে এক আদর্শ এলাকা। সাই-ক্লোট্রন, বিভাট্রন প্রভৃতি যন্ত্রে বস্তুকণাদের গতিবৃদ্ধির জন্যে নিখুঁত বায়ুশূন্য পরিবেশ দরকার। চাঁদে সে পরিবেশের অভাব নেই। পৃথিবীর তুলনায় বস্তুকণাদের অনেক বড় গতিবর্ধক-যন্ত্র চাঁদে তৈরি করতে বিজ্ঞানীদের কোন বেগ পেতে হবে না। ফলে পরমাণু-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনাময় দিগন্ত উন্মুক্ত হয়ে চলবে দ্রুতগতিতে।

ইলেকট্রন রশ্মির দ্বারা ঢালাই বা ওয়েলডিংয়ের কাজের জন্যে নিখুঁত বায়ুশূন্য জায়গা দরকার। চাঁদ সে প্রয়োজন মেটাবে। কোল্ড বা ঠাণ্ডা অবস্থায় ওয়েলডিংয়ের কাজ চাঁদের শিল্পব্যবস্থায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে বসবে। চাঁদে দুটি সম্পুর্ণ পরিচ্ছন্ন এবং মসৃণ ধাতুখণ্ডের মধ্যে কোন তাপ ছাড়াই এবং অতি সামান্য চাপে ওয়েলডিং ঘটানো যাবে।

চাঁদে শিল্পের উপাদান

চাঁদের বায়ুশূণ্য এলাকা বিজ্ঞানীদের কাছে এক লোভনীয় বস্তু। তেমনি এক বিপুল পরিমাণ ধাতুর সঞ্চয়ও চাঁদে রয়েছে বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস। চাঁদের জন্ম যদি পৃথিবীরই মত ৪৫০ কোটি বছর আগে হয়ে থাকে, তাহলে বিজ্ঞানীদের হিসেব মত চাঁদের জমিতে এ-পর্যন্ত প্রায় ১০ ট্রিলিয়ন ($১০^{১৮}$) টনের মত উল্কাপিণ্ড এসে আছড়ে পড়েছে।

পৃথিবীতে যে সামান্য পরিমাণ উল্কাপিণ্ড এসে পৌঁছয় (এদের বেশির ভাগই বায়ুর সঙ্গে সংঘাতে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়), ওদের গঠনপদ্ধতির বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন, উল্কাপিণ্ডের দল এপর্যন্ত চাঁদে প্রায় ৪৫০০০ কোটি টনের মত লোহা, ৩০০০ কোটি টন নিকেল, ১০০০ কোটি টন তামা,

৩০০ কোটি টন কোবাল্ট এবং আরো অন্যান্য উপাদানকে নাকি জড়ো করেছে। যদি আদৌ তা হয়ে থাকে, তাহলে এই সমস্ত উপাদানের সাহায্যে চাঁদে ভবিষ্যতে একটি স্ব-নির্ভর শিল্পব্যবস্থা গড়ে তোলা শক্ত হবে না।

চাঁদে মানুষ বাস করবে

বায়ুহীন চাঁদে যে বিপুল পরিমাণ সূর্যের আলো এসে পৌঁছচ্ছে, তা বিশাল আকারের সৌরচুল্লিকে কার্যকরী করে তুলবে। এইসব সৌরচুল্লির ভেতরে বসানো দর্পণের সাহায্যে সূর্যের আলোকে কেন্দ্রীভূত করে চাঁদের শিলা ও মৃত্তিকাকে গালিয়ে ফেলা যাবে। সেই গলিত বস্তু দিয়ে ইঁট তৈরি করে মানুষের বসবাসের ঘরবাড়ি গড়ে উঠবে।

চাঁদে যে-সব শিলার মধ্যে ক্যালসিয়াম কার্বনেট রয়েছে, ওদের ওপর যদি সৌরচুল্লির রশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করে ফেলা যায়, তাহলে তা থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস মুক্তি পাবে। সেই কার্বন ডাই-অক্সাইডকে চতুর্দিকে আবদ্ধ একটি বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে সবুজ শেওলা-জাতীয় উদ্ভিদের চাষ করা যেতে পারবে।

উদ্ভিদের জন্যে আবার জলের প্রয়োজন। চন্দ্রগামী অভিযাত্রীরা এ পর্যন্ত চাঁদ থেকে যে সব শিলার নমুনা এনেছেন, তাদের বিশ্লেষণে সেখানে জলের অস্তিত্বের আদৌ কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। কিন্তু চাঁদের শিলার মধ্যে মিশ্রিত অবস্থায় অক্সিজেন রয়েছে এবং হাইড্রোজেনেরও থাকবার কথা। ঐ দুটিকে বার করে নিয়ে পরিমাণমত মিশিয়ে জল তৈরি করে ফেলা যাবে। সেই জলে গাছ এবং মানুষ—উভয়েরই প্রয়োজন মিটবে।

শেওলা-জাতীয় উদ্ভিদ সালোক সংশ্লেষ (ফটোসিনথেসিস) পদ্ধতির অন্যতম বাড়তি উপাদানরূপে তৈরী করবে অক্সিজেন, এবং তা মানুষের প্রশ্বাস-কাজের চাহিদা মেটাবে।

ভবিষ্যতে চাঁদে মানুষের বসবাসের জন্যে বিজ্ঞানীরা বিস্তৃত পরিকল্পনার ছক তৈরি করেছেন। সেখানে মানুষের প্রয়োজনে খাবার-দাবার থেকে শুরু করে যা কিছু লাগবে, সবই সেখানকার উপাদান থেকেই তৈরির কথা তাঁরা ভাবছেন। অর্থাৎ, চাঁদে বসবাসকারী মানুষ একদিন কোন কিছুর জন্যেই আর পৃথিবীর কাছে হাত পাতবে না।

জ্যোতির্বিদ্যার নবদিগন্ত

চাঁদ হবে জ্যোতির্বিদদের কাছে এক হাতে-পাওয়া স্বর্গ। আকাশের রং

সেখানে চব্বিশ ঘণ্টাই নিকষ কালো। দৃষ্টির স্বচ্ছতাকে আবিল করার জন্য সেখানে কোন বাতাস নেই, ধুলো নেই, মেঘ নেই। আমেরিকার মাউন্ট পালোমারে এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের আলমা আটাতে পৃথিবীর সবচেয়ে জোরালো যে আলোক-দূরবীন যন্ত্র বসানো আছে, তার আয়নাতে সবচেয়ে ক্ষীণ যে নক্ষত্রলোকের প্রতিবিম্ব ধরা পড়েছে, বায়ুহীন চাঁদে ঐ একই দূরবীনের চোখে ধরা পড়বে তার চেয়েও ১৩,০০০ গুণ ক্ষীণ নক্ষত্রের আলোক-তরঙ্গ।

চাঁদ যেহেতু আপন অক্ষের ওপরে পৃথিবীর মাত্র ১/৩০ ভাগ বেগে ঘুরে চলেছে, তাই চাঁদের আকাশে নক্ষত্রের স্থান পরিবর্তন ঘটবে অনেক ধীর গতিতে। ফলে নক্ষত্রের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা এবং ছবি তোলার কাজ হবে অনেক সহজ। চাঁদের স্বল্প-অভিকর্ষের জন্যে ওজন কমে যাওয়ার ফলে পৃথিবীর তুলনায় অনেক বিশাল আকারের দূরবীন তৈরি করা যাবে সহজেই। ওজনের ভারে দূরবীনের আয়না এবং তার কাঠামোর গঠনের মধ্যে বিকৃতি ঘটার সম্ভাবনাও সেখানে তাই যৎসামান্য।

চাঁদের ধুলোর মধ্যে কাঁচের সন্ধান পাওয়া গেছে। কাঁচের মধ্যে রয়েছে সিলিকা। সেই সিলিকা থেকে কোয়ার্টজ্ তৈরি করে তা দিয়ে বিরাট আয়না গড়ে ফেলা যাবে। সেই আয়নাকে চাঁদের বায়ুশূন্য প্রদেশে আয়ন রশ্মির দ্বারা পালিশ করে নিয়ে চমৎকার আলোক-দূরবীন যন্ত্র গড়ে তোলার আশা রাখেন বিজ্ঞানীরা।

রেডিও-জ্যোতির্বিদ্যার অগ্রগতি আমাদের কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আরো সুদূর অঞ্চলের নক্ষত্রলোকের সন্ধান এনে দিয়েছে। কোয়াসার, পালসার-জাতীয় মহাবিশ্বের বহু বিচিত্র বস্তুর আবিষ্কার ঘটেছে এই জ্যোতির্বিদ্যার দৌলতেই। কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাধাকে পেরিয়ে পৌঁছতে পারে না মহাকাশের গামা রশ্মি, রঞ্জন রশ্মি, মহাজাগতিক রশ্মি প্রভৃতি। মহাবিশ্বের কত নক্ষত্রজগত থেকে আসে এরা কত বিচিত্র খবরকে নিয়ে। কিন্তু বায়ুহীন চাঁদে রেডিও-দূরবীন যন্ত্রে ধরা পড়বে ঐ সব তরঙ্গের সমগ্র বর্ণালি।

কিছু কিছু জ্যোতির্বিদ প্রভাব করেছেন, চাঁদের চক্রাকার জ্বালামুখগুলোর দু-পাশের দেয়াল জুড়ে লম্বা তারের জাল ছড়িয়ে দিয়ে এবং জ্বালামুখগুলোকে প্রতিফলক হিসেবে ব্যবহার করে চমৎকার রেডিও দূরবীনের কাজ চলতে পারে। চাঁদের উল্টো পিঠে জ্যোতির্বিদরা যদি রেডিও দূরবীন বসাতে পারেন, তাহলে পৃথিবীতে যে সব বেতার-তরঙ্গ তৈরি হচ্ছে তারা পৃথিবী থেকে চাঁদে পৌঁছে ওর ঘাড়ে চেপে ওর কাজের ব্যাপারে কোন বাধাই (রেডিও নয়েজ) সৃষ্টি করতে পারবে না। বেতার-তরঙ্গ সোজা পথে ছোটে বলে ওর পক্ষে চাঁদের জমিকে ডিঙিয়ে উল্টো দিকে পৌঁছনো সম্ভবপর নয়।

চাঁদের উল্টোপিঠে গোলমেলে বেতার-তরঙ্গের কোন ঝামেলা নেই, তাই বেতার-জ্যোতির্বিদরা সেখানে বসে তাঁদের রেডিও-দূরবীনে মহাকাশের আরো অনেক ক্ষীণ বেতার-তরঙ্গের উৎসের সন্ধান পাবেন। হয়ত এই বিশাল মহাবিশ্বের কোন গ্রহজগত থেকে মানুষেরই মত কোন বুদ্ধিমান প্রাণী কোন সংকেত পাঠিয়েছেন। বিরাট দূরত্বের ব্যবধান পেরিয়ে সেই দুর্বল সংকেতও হয়ত ঐ রেডিও-দূরবীন যন্ত্রের নাগালের মধ্যে ধরা পড়তে পারে।

এই মহাবিশ্ব ক্রমাগত প্রসারিত হয়ে চলবে কি না, কোনদিন এই প্রসারণের পালা বন্ধ হয়ে আবার সঙ্কোচনের পর্যায় শুরু হবে কি না, চাঁদে বসে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা এই রহস্যঘন প্রশ্নগুলোরও জবাব পাবার আশা রাখেন। এই মহাবিশ্বের বিবর্তনের পদ্ধতি সম্বন্ধে যে সব প্রশ্নের জবাব আজও পাওয়া যায় নি, তার মীমাংসা হয়ত সেদিন সম্ভব হতে পারবে।

২১

মহাকাশ গবেষণার সামাজিক অবদান

পৃথিবীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে, নানাদি গঠনমূলক কাজে বিশেষজ্ঞেরা দীর্ঘদিন যে সব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছিলেন তাদের সমাধানের পথে মহাকাশ গবেষণার বিভিন্ন পর্যায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তারই একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই অধ্যায়ে আমরা গ্রহণ করব।

যেমন ধরা যাক একটি বড় মাপের জলাধারের কথা। ভূমিকম্প বা পৃথিবীর আভ্যন্তরীন ক্রিয়াশীল বিভিন্ন বলের সংঘাতে ওর স্থিতিশীলতার ওপর কি ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে তা জানার প্রয়োজন রয়েছে জলাধারটির নিরাপত্তার খাতিরেই। রকেটের এঞ্জিনের থ্রাষ্ট বা ধাক্কাকে পরিমাপের জন্য বিশেষজ্ঞেরা যে যান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেছিলেন তাকেই এই কাজে লাগানো হল।

রকেট মোটরের আভ্যন্তরীন গঠনগত ত্রুটিকে নির্ধারণের জন্যে উদ্ভাবিত আলট্রাসনিক টেস্টিং যন্ত্রকে বিদ্যালয় এবং হাসপাতালের জন্যে তৈরী বাড়ীর গঠনগত ত্রুটিকে নির্ধারণ করার কাজে লাগানো হচ্ছে।

ধাতুর পাতের ওপর রংয়ের এবং রকেটের জ্বালানীর ট্যাংকের ওপর অন্তরকরূপী (ইনসুলেশন) ফোমজাতীয় বস্তুর প্রলেপের গভীরতা মাপার জন্যে গেজরূপী যে যন্ত্র তৈরি করা হয়েছিল, সেই একই ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো হল রাস্তার ওপর সদ্য ঢালা কংক্রিটের গভীরতা মাপার জন্যে। বর্তমানে বিমান ছিনতাইর যুগে ঐ একই যন্ত্রকে বিমান সংস্থার কর্মীরা ব্যবহার করতে পারেন বিমানবন্দরের যাত্রীদের কাছে কোন গোপন অস্ত্র রয়েছে কিনা তা ধরার জন্যে।

আবহাওয়া নির্ণয়কারী কৃত্রিম উপগ্রহে ব্যবহৃত রেডিওমিটার যন্ত্রকে বিশেষজ্ঞেরা পৃথিবীর জমির ওপর ব্যবহার করেছেন তুষারস্তূপের গভীরতাকে পরিমাপের জন্যে। এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য যদি জানা যায়, তাহলে আগে থেকেই বলে দেয়া সম্ভবপর হবে, বসন্তকালে কতটা বরফ গলা জল পাওয়া যাবে এবং জলবিদ্যুতের উৎপাদনই বা কতটা পরিমাণে সম্ভবপর হবে। উত্তর গোলার্ধের

শীতপ্রধান দেশগুলোতে এজাতীয় তথ্যের অর্থনৈতিক গুরুত্ব যে অপরিসীম তা আমরা সহজেই বুঝতে পারছি।

শিল্পক্ষেত্রে

আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ন্যাসার উদ্ভাবিত একটি যন্ত্রকে কাজে লাগানো হয়েছিল একটি বিমানের খাড়াভাবে ওপরে ওঠা এবং নেমে আসার বেগকে পরিমাপের জন্যে। খনিগর্ভে নিরাপত্তার ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করার জন্যে বিশেষজ্ঞেরা এই যন্ত্রটিকেই কাজে লাগিয়েছেন ওখানে স্বল্প গতিসম্পন্ন বায়ুস্রোতের বেগ পরিমাপের জন্যে। এই তথ্যটির মাধ্যমে তারা বুঝতে পারবেন খনিগর্ভে কয়লার স্তরের ওপর থেকে দাহ্যশীল গ্যাস এবং ধুলোকণাকে অপসারণের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ বাতাস যোগান দেয়া যাচ্ছে কিনা। যন্ত্রটির সঙ্গে লেসার আলোর একটি উৎসকে সংযুক্ত করতে পারলে তার সাহায্যে খনিগর্ভে মিথেন এবং কার্বন মনোক্সাইড জাতীয় বিষাক্ত গ্যাসেদের অস্তিত্বও নির্ণয় করা সম্ভবপর হবে।

মার্কারি মহাকাশযানে ব্যবহারের জন্যে 'ইনফ্রা রেড আর্থ হোরাইজন সিকার' নামে একটি যন্ত্রকে উদ্ভাবন করা হয়েছিল। মহাকাশ অঞ্চলে দিগন্তের কাছে যে কোন বস্তুকে তার দেহ থেকে নির্গত তাপ তরঙ্গের মাধ্যমে খুঁজে বার করার জন্যে এই যন্ত্রটির উদ্ভাবনা। এই যন্ত্রটিকে কাজে লাগানো হল ইস্পাতের কারখানায় ক্রমাগত তৈরি হতে থাকা লোহিততপ্ত ইস্পাতের দণ্ডের প্রস্থকে পরিমাপের জন্যে। গঠনপর্বের সময় দণ্ডটি যদি ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার বেগেও ছুটতে থাকে এবং ওর ব্যাসের নির্দিষ্ট পরিমাপের মধ্যে যদি এক সেন্টিমিটারের কয়েক হাজার ভাগের এক ভাগের মতও ব্যতিক্রম ঘটে, তাহলেও যন্ত্রটির নজর তা এড়াতে পারবে না। যে কোন উৎপাদন ব্যবস্থার গুণগত মান বিচারের জন্যে এ হবে একটি আদর্শ উপায়।

মহাকাশ প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ ঘটেছে আরো নানাদি ক্ষেত্রে। অ্যাপোলো মহাকাশযানে অভিযাত্রীদের বসার আসনের সঙ্গে সংলগ্ন ধাক্কা সামলাবার ব্যবস্থাকে (শক্ অ্যাবজরবার) মোটরগাড়ী জাতীয় যানবাহনের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে অনেক জায়গায়। দেখা যাচ্ছে এর ফলে জাতীয় সড়কগুলোতে ঘণ্টায় প্রায় ১০০ কিলোমিটার বেগের একটি মুখোমুখি সংঘাত মাত্র আট কিলোমিটারে এসে দাঁড়াচ্ছে। দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুহারের সংখ্যা এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই যে অনেক কমবে তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারছি।

মহাকাশযান পৃথিবী পরিক্রমার পর সাগরে এসে নামার সময় যদি

সোজাভাবে না নেমে উল্টোভাবে নামে, তাহলে ওকে সঠিক অবস্থানে ফিরিয়ে আনার জন্যে যে বড় আকারের থলেগুলো ব্যবহার করা হয় ওদেরই ছোট নমুনাকে মোটরগাড়ীর যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্যে ব্যবহার করলেন বিশেষজ্ঞেরা ; দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ঐ থলেগুলো বায়ুপূর্ণ অবস্থায় যাত্রী এবং গাড়ীর ড্যাসবোর্ড ও উইণ্ডশিল্ডের মধ্যে এসে পড়বে এবং সংঘাতের বেগকে কমিয়ে যাত্রীদের আহত হবার হাত থেকে রক্ষা করবে।

কীটাণুনাশক ডিডিটি প্রসঙ্গ

মহাকাশ বিজ্ঞান সংক্রান্ত রাসায়নিক পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে এক ধরণের ডিডিটির (একটি কীটাণুনাশক পদার্থ) উদ্ভাবন সম্ভবপর হয়েছে, নিজেকে ধ্বংস করার কলকাঠি নিহিত রয়েছে যার মধ্যে। ডিডিটির মধ্যে বিশেষভাবে তৈরি একটি রাসায়নিক অনুঘটককে (ক্যাটালিষ্ট) প্রয়োগ করে দেখা গেল ও ধীরে ধীরে ভেঙ্গে যাচ্ছে। ডিডিটির ব্যবহার সম্বন্ধে যে ভীতির কারণটি রয়েছে তা হল এই, বন্যপ্রাণী এবং মানুষ উভয়ের পক্ষেই এ বিপদজনক কারণ একে ভেঙ্গে ফেলা যায় না এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার কাজকেও এ ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে। বাজারে ডিডিটির দাম কম বলে এবং এর কার্যকারিতার জন্যেও তৃতীয় দুনিয়ার কৃষকদের কাছে এর চাহিদা বেশি। নতুন নিরাপদ ব্যবস্থাটি ব্যবসায়িকভাবে চালু করা গেলে ডিডিটির ব্যবহারে নৈতিক বাধা হয়তো দূর করা সম্ভবপর হবে।

চিকিৎসাবিস্তা

মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের শারীরবিদ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বিশেষজ্ঞদের নির্ণয় করতে হয়েছিল। এর ফলে চিকিৎসাবিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্র নানাভাবে উপকৃত হয়েছে, যেমন মানবদেহে অক্সিজেনের বিপাক (মেটাবলিজম) প্রক্রিয়া, সাগরপৃষ্ঠের ওপর বায়ুর চাপের তুলনায় অতিরিক্ত চাপের পরিবেশে (হাইপারবারিক) অক্সিজেনের ব্যবহার, কানের অভ্যন্তরে ভেসটিবিউলার সংস্থানের ক্রিয়াপ্রক্রিয়া, ত্বরণের প্রভাবে দৃষ্টিশক্তির বিভ্রম এবং মানুষের জীবকোষের ওপর আয়নিত বিকিরণের প্রভাব সম্পর্কিত অনুসন্ধানকাজ।

বিশেষজ্ঞেরা ইতিপূর্বে দেখেছিলেন যে জীবকোষেদের পৃষ্ঠভাগের ওপর বৈদ্যুতিক বিভবের (চার্জ) পরিমাণ যখন বেশিমাত্রায় থাকে, তখন কোষ বিভাজনের প্রক্রিয়া মন্থর এবং সুনির্দিষ্ট হারে ঘটতে থাকে। কিন্তু বৈদ্যুতিক

বিভবের পরিমাণ যখন কম থাকে, তখন এই বিভাজনের প্রক্রিয়াটি ঘটতে থাকে দ্রুতগতিতে। ক্যানসার রোগের গবেষণা এ জাতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছে।

১৯৫০-এর দশকের শেষের দিকে অতি শীতল তাপমাত্রায় শল্যচিকিৎসার (ক্রায়োসার্জারি) পদ্ধতি বিকাশ লাভ করে। মাংসপেশী কাটার সাধারণ ছুরির বদলে শল্যবিদেরা আবিষ্কার করলেন ক্রায়োপ্রোব—এ হল একটি লম্বা ছুঁচ যার মধ্য দিয়ে তরল নাইট্রোজেন প্রবাহিত হয়ে —৩১৯ ডিগ্রি ফারেনহাইটের মত নিম্ন তাপমাত্রা তৈরি করে বসে। রুগ্ন পেশী ক্রায়োপ্রোবের সংযোগে আসার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত এবং যন্ত্রণাহীনভাবে মারা পড়ে। তারপর ওকে হয় ছুরির সাহায্যে বার করে নিয়ে আসা যেতে পারে অথবা ওকে ওর জায়গাতেই রেখে দেয়ার ব্যবস্থা করা যাতে শারীরব্যবস্থার মধ্যে ধীরে ধীরে ও মিশে যায়। মস্তিষ্কের শল্যচিকিৎসা ক্রায়োসার্জারির দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছে।

ক্রায়োপ্রোবের উন্নতিবিধানের জন্যে ক্রায়োসার্জারির অন্যতম আবিষ্কর্তা ডঃ আরভিং কুপার অতি নিখুঁতভাবে জানতে চাইছিলেন যন্ত্রটির মুখের দিকে তাপমাত্রার পরিমাণ কত। মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিযুক্ত পূর্তবিদদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে সাহায্য পাওয়া গেল। তাঁরা ইতিপূর্বেই একটি অতি ক্ষুদ্র থার্মোকাপ্‌ল্ (ইলেকট্রনিক থার্মোমিটার) উদ্ভাবন করেছিলেন যাকে খুব সহজেই ক্রায়োপ্রোবের ভেতরে বসিয়ে দেয়া যায়। এ ধরণের ব্যবস্থায় যন্ত্রটির তাপমাত্রা সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হল। নিম্নতম তাপমাত্রার কিছুটা ওপরে রেখে যন্ত্রটির ছুঁচলো মুখটিকে ধীরে ধীরে মগজের ভেতরে ঢুকিয়ে যেই নির্দিষ্ট স্থানটিতে পৌঁছনো গেল, তখনই তাপমাত্রাকে তার নির্দিষ্ট নিম্নতম মাত্রায় নামিয়ে আনা হল।

পার্কিনসন ব্যাধির ফলে শরীরের কোন অংশের অনিয়ন্ত্রিত কাঁপুনিকে প্রশমনের জন্যে ক্রায়োসার্জারিকে বিশেষভাবে কাজে লাগানো হয়। এছাড়া শরীরের প্রোস্টেট গ্ল্যাণ্ড, সার্ভিক্স (গ্রীবাদেশ), ইউটিরাস (জরায়ু), রেকটাম (মলনালী) প্রভৃতির শল্যচিকিৎসায় এবং টনসিল কাটার কাজেও ক্রায়োসার্জারিকে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। মহাকাশবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি ফলপ্রসূ প্রয়োগ আমরা এভাবে দেখতে পেলাম।

টেলিমেট্রি

মহাকাশে অভিযাত্রীরূপে মানুষকে পাঠাবার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার জন্যে প্রথম প্রয়োজন ছিল, দূরবর্তী অঞ্চল থেকে মহাকাশযাত্রীদের শারীরব্যবস্থার

বিভিন্ন পরিমাপকে সঠিকভাবে সংগ্রহ করা। পৃথিবী থেকে ৩০০ কিলোমিটার দূরের কোন কক্ষপথে পরিক্রমাকালীন অবস্থাতেই হোক অথবা প্রায় চার লক্ষ কিলোমিটার দূরে চাঁদের পৃষ্ঠভাগের ওপর হাঁটাচলাকালীন পরিস্থিতিতেই হোক, একজন মহাকাশযাত্রীর শরীরের তাপমাত্রা, নাড়ীর চাপ বা অন্যান্য জৈবিক তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে করতেই হবে। এই ব্যবস্থার নাম হল টেলিমেট্রি—দূরবর্তী কোন জায়গা থেকে কোন বিষয়ের পরিমাপ সংগ্রহ করে সেই তথ্যকে তার অথবা বেতারের মাধ্যমে সংগ্রাহক কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়া। মহাকাশে অভিযাত্রীদের প্রয়োজনে বায়ো-টেলিমেট্রির উদ্ভাবন হল, যার প্রয়োগ যেমন মানুষের ক্ষেত্রে হয়েছে তেমনি হয়েছে মহাকাশ অভিযাত্রী বিভিন্ন প্রাণীদের ক্ষেত্রেও।

হাসপাতালে কোন রোগী সংক্রামক ব্যাধিতে ভুগছে অথবা তাকে স্বাভাবিক বায়ুর চাপের তুলনায় অতিরিক্ত চাপযুক্ত কোন কক্ষে রাখা হয়েছে, বা এমন রোগী যার প্রতি সেকেণ্ডে নাড়ীর চাপ, শ্বাসপ্রশ্বাসের বেগ, হৃৎস্পন্দন, মস্তিষ্কের তড়িৎলেখসংক্রান্ত তথ্যের প্রয়োজন— বায়োটেলিমেট্রির ব্যবহার হচ্ছে এজাতীয় ক্ষেত্রে। নাগালের বাইরে রয়েছে রোগী, অথচ তার সব তথ্যই পাওয়া যাচ্ছে।

প্রত্যঙ্গের সংযোজন

অ্যাপোলো মহাকাশযান পৃথিবী পরিক্রমার পর যখন এসে সাগরে নামল তখন নামার ধাক্কার বেগ পরিমাপের জন্যে একটি বিশেষ সচেতক (সেনসর) যন্ত্রকে কাজে লাগানো হয়েছিল ; একই ব্যবস্থাকে বর্তমানে মানুষের শরীরে কৃত্রিম প্রত্যঙ্গ সংযোজনের ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হচ্ছে। একটি চার আনা চাক্তির চেয়েও ছোট এই যন্ত্রটিকে কৃত্রিম প্রত্যঙ্গের মধ্যে রেখে গ্রহীতার শরীরের যেখানে প্রত্যঙ্গটিকে বসানো হবে সেখানে বসিয়ে চাপের পরিমাপ সংক্রান্ত খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ফলে মানবদেহের ক্ষেত্রে প্রত্যঙ্গটির সংযোজন হয় নিখুঁত। অস্বাভাবিক গঠনযুক্ত পায়ের জন্যে জুতো তৈরির ব্যাপারেও একই পদ্ধতিকে কাজে লাগানো হচ্ছে।

রকেটে ব্যবহৃত কঠিন জ্বালানীর দহনকাজের সময় যে যান্ত্রিক পীড়ন বা চাপ সৃষ্টি হয় তাকে পরিমাপের জন্যে উদ্ভাবিত ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো হচ্ছে জীবিত মানুষের হাড়ের স্থিতিস্থাপকতাকে (ইলাসটিসিটি) পরিমাপের জন্যে। এ জাতীয় অনুসন্ধান কাজের মাধ্যমে জানা যাবে বয়স বাড়ার

সঙ্গে সঙ্গে দেহের হাড় কেন ভঙ্গুর হয়ে ওঠে এবং এই ক্ষয়কাজের প্রতিবিধানের ব্যবস্থাকেও নির্ণয় করতে তা সাহায্য করবে।

শারীরবিজ্ঞানের প্রয়োজনে

প্রতিটি বস্তু থেকেই এক নির্দিষ্ট মাপের তাপ তরঙ্গ নির্গত হয়ে থাকে। একটি মহাকাশযান দিগন্তের কাছে দেখা দিলেই ওর সঠিক অবস্থানকে নির্ণয়ের জন্যে তাপ-তরঙ্গ নির্ধারক যন্ত্রকে কাজে লাগানো হয়; এই একই পদ্ধতিকে কাজে লাগানো হচ্ছে মানুষের শরীরে তপ্ত কেন্দ্রগুলোকে (হট স্পট্স) খুঁজে বার করতে। এই তপ্ত কেন্দ্রগুলো মানুষের দেহের অভ্যন্তরে কোন ব্যাধি বা অস্বাভাবিকতাকেই প্রকাশ করে থাকে।

রকেটে ব্যবহৃত কঠিন জ্বালানীর গলিত অবস্থার সান্দ্রতা (ভিসকাসিটি—এ হল তরল পদার্থের এমন একটি ধর্ম যা ওর অভ্যন্তরে বিভিন্ন বেগসম্পন্ন স্রোতের সৃষ্টির কাজে বাধা প্রদান করে) নির্ণয়ের জন্যে তৈরি সচেতক যন্ত্রব্যবস্থাকে মানুষের দেহের অভ্যন্তরে রক্তের সান্দ্রতাকে পরিমাপের কাজে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

মহাকাশযানের কম্পনকে পরিমাপের জন্যে উদ্ভাবিত একটি সচেতক যন্ত্রকে কার্যকরীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে রক্তের ক্ষুদ্র জালকের (ক্যাপিলারি) মধ্য দিয়ে রক্তের প্রবাহকে পরিমাপের জন্যে।

মহাকাশযাত্রীদের জন্যে মহাকাশ পোষাক ও প্রাণধারণের অন্যান্য উপযোগী পরিবেশ তৈরির অভিজ্ঞতাকে বিশেষজ্ঞেরা কাজে লাগিয়েছেন একটি বিশেষ হৃদযন্ত্র সহায়ক ব্যবস্থাকে উদ্ভাবনের কাজে। গুরুতরভাবে হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত রোগীদের এই পোষাকটি পরিয়ে দিলে তা সাময়িকভাবে রোগীকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করবে। হাসপাতালে রোগীকে নিয়ে যাবার আগে প্রাথমিকভাবে সাহায্যকারীরূপে এই পোষাকটির কার্যকারিতা পরীক্ষিত হয়েছে। এই পোষাকটির মাধ্যমে দুটি কাজ করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হৃদযন্ত্রটির ওপর কাজের চাপ কমানোর জন্যে বাম নিলয়ের (এর কাজ হল হৃদযন্ত্র থেকে পাম্প করে রক্ত বার করে দেয়া) ওপর রক্তের বোঝার পরিমাণকেই কমিয়ে আনা এবং করোনারী ধমনীগুলোকে রক্তে পূর্ণ করে মহাধমনীর (অ্যাওর্টা) ওপর চাপকে বাড়িয়ে তোলা।

অনুসন্ধানের শেষ নেই

মহাকাশ থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন ছবিকে পরিচ্ছন্ন করে তোলার জন্যে উদ্ভাবিত পদ্ধতিকে বিশেষজ্ঞেরা কাজে লাগিয়েছেন মানবদেহের

আভ্যন্তরীন আরো উন্নত মানের এক্স-রে ছবি তৈরির জন্যে। এ কাজটি করা হচ্ছে এক্স-রে তরঙ্গের কম্পনসংখ্যাকে বাড়িয়ে এবং একটি বিশেষ প্যাটার্ন বা ছককে তুলে নেয়ার মাধ্যমে। কম্পনসংখ্যা বাড়ানোর কাজটা হল একটি মূল স্বরের সংরক্ষণযুক্ত (হাই-ফাইডেলিটি,) বেতার গ্রাহক যন্ত্রে উঁচু এবং নিচু কম্পন-সংখ্যার তরঙ্গের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে মূল স্বরের সংরক্ষণ বজায় রাখার মত একটি ব্যাপার এবং ছক নির্ধারণের ব্যাপারটা হল কোন বিষয়ের এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যা হয়তো স্বাভাবিকভাবে নজরেই পড়ত না।

দুটি ক্ষেত্রেই কম্পিউটারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মহাকাশ থেকে ক্যামেরায় তোলা ছবিতে হয়তো আলো বা তাপ তরঙ্গের ক্ষেত্রে কম্পনসংখ্যাজনিত বিচ্যুতি ঘটল ; তখন কম্পিউটার ছবির অস্পষ্টতার পরিমাণকে লাঘব করে ওর গুণগত মানকে বাড়িয়ে তুলবে। মহাকাশযানের মধ্যে বসানো বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি থেকে উদ্ভূত নানা গোলমেলে সংকেত চিত্রসংক্রান্ত মূল সংকেতের ঘাড়ে চেপে তার পরিচ্ছন্নতাকে হয়তো বিপন্ন করছে, তখন কম্পিউটারের কাজ হবে ঐ অবাঞ্ছিতদের কম্পনসংখ্যারূপী ছকগুলোকে পৃথক করে নিয়ে আকাঙ্ক্ষিত মূল ছবির কম্পনসংখ্যা বা প্যাটার্ন বা ছকের হৃতস্বাস্থ্যকে পুনরুদ্ধার করা।

হাসপাতালের চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের মতে বুকের এক্স-রে ছবিতে যা সাধারণত ধরা পড়ে তা প্রকৃত অবস্থা বা পরিস্থিতির এক-দশমাংশ মাত্র। ছবি তোলার উন্নত পদ্ধতির সাহায্যে যদি এক্স-রে চিত্রের ছায়ারূপী কিছু অংশকে বাতিল করে বাকি অংশের গুণগত পরিবর্ধন ঘটানো যায় তাহলে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়ের কাজে তা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে সন্দেহ নেই।

ব্যালিষ্টোকার্ডিওগ্রাফ

মহাকাশ বিজ্ঞানে গবেষণার আর একটি সুফল আমরা লাভ করেছি ব্যালিষ্টোকার্ডিওগ্রাফ যন্ত্রের উন্নতি বিধানের মধ্য দিয়ে। এই যন্ত্রটির কাজ হল হৃদয়যন্ত্রের রক্ত পাম্প করার ক্ষমতাকে পরিমাপ করা। যন্ত্রের পাটাতনের ওপর রোগীকে শুইয়ে দেয়া হয় এবং রোগীর হৃৎস্পন্দনের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাটাতনটিও আন্দোলিত হতে থাকে। স্প্রিংয়ের পরিবর্তে নতুন যন্ত্রটি বায়ুরূপী বেয়ারিং ব্যবস্থার ওপর বসানো। গাইরসকোপ (কোন উড্ডয়নশীল বস্তুর গতিপথ নির্ধারক যন্ত্র) এবং অন্য যন্ত্রে ব্যবহৃত যান্ত্রিক বেয়ারিং ব্যবস্থার

ঘর্ষণজনিত যে সমস্যা, তার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ এবং মহাকাশযানের গতিপথ নির্ধারক ব্যবস্থায় বাতাসকে বেয়ারিংরূপে ব্যবহার করে থাকেন বিশেষজ্ঞেরা। এজাতীয় বেয়ারিং ব্যবস্থায় বাতাসের ভূমিকাটা হল লুব্রিকান্টের মত, তেল বা গ্রাফাইটের মত কঠিন পদার্থের জায়গায় যাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই উন্নত বেয়ারিং ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো হয়েছিল ব্যালিস্টোকার্ডিওগ্রাফ যন্ত্রে।

ব্যালিস্টোকার্ডিওগ্রাফ যন্ত্রটি যেহেতু একটি পাতলা বায়ুস্তরের ওপর বসানো তাই মেঝে বা বাড়ীর গঠনগত কোন অংশের কোন কম্পনের দ্বারাই এ প্রভাবিত হয় না। রাস্তার যানবাহন, হাসপাতালে ব্যবহৃত অন্য কোন যন্ত্রের কম্পন বা ঘরে কোন ব্যক্তির হাঁটাচলাজনিত মেঝের কম্পনের প্রভাব থেকেও এ মুক্ত থাকে। স্বভাবতই এ ব্যবস্থায় হৃদযন্ত্রের যে রেখাচিত্র পাওয়া যাবে, তা প্রচলিত অন্য যন্ত্র থেকে পাওয়া রেখাচিত্রের তুলনায় হবে বহুগুণ উন্নত। এ জাতীয় একটি যন্ত্র মাতৃগর্ভে অবস্থিত ভ্রূণের মধ্যে রক্ত সঞ্চালনের ফলে যে সব বলের (ফোর্স) সৃষ্টি হয়ে থাকে তা নির্ণয় এবং পরিমাপ করতে সক্ষম। বায়ুরূপী বেয়ারিং ব্যবস্থা গর্ভস্থ ভ্রূণের ওপর মায়ের শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রভাবকে অবদমিত করবে এবং ভ্রূণের ব্যালিস্টোকার্ডিওগ্রাম-সংক্রান্ত তথ্যের সাহায্যে একটি কম্পিউটার যন্ত্র মায়ের হৃদযন্ত্রের স্পন্দনের প্রভাব থেকে ভ্রূণের হৃদস্পন্দনকে আলাদা করে নেবে, ফলে ঐ স্পন্দনের আসল চেহারাটি আমরা লাভ করতে পারব।

মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হবার আগেই ভ্রূণের ব্যালিস্টোকার্ডিওগ্রাম রেকর্ড করার এই সামর্থ্য আর একটি নতুন সম্ভাবনার দিগন্তকে উন্মুক্ত করছে। পৃথিবীতে বর্তমানে এক-তৃতীয়াংশের ওপর শিশু জন্মাবার পরেই মারা যায় কারণ পার্থিব পরিবেশের অস্বাভাবিক চাপ ধারণ করার মত দৈহিক সামর্থ্য ওদের থাকে না। ভ্রূণ অবস্থাতেই শারীরবিদ্যা সংক্রান্ত কোন ত্রুটির হাত থেকে মুক্ত করে ওদের জীবনরক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা চিকিৎসাবিদরা এবারে করতে পারবেন।

রোগ বীজাণু ধ্বংসের ক্ষেত্রে

অ্যামেরিকার মহাকাশ বিজ্ঞান সংস্থা ন্যাসার বিশেষজ্ঞেরা একটি যন্ত্রকে উদ্ভাবন করেছিলেন অন্যান্য গ্রহে সম্ভাব্য প্রাণের অস্তিত্বকে নির্ধারণের জন্যে। ভাইকিং মহাকাশযানের মাধ্যমে ১৯৭৬ সালে এজাতীয় একটি যন্ত্রব্যবস্থাকে মঙ্গল গ্রহের জমিতে নামানোও হয়েছিল। মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা চিকিৎসাবিদদের সঙ্গে যুক্তভাবে এই যন্ত্রটিকেই কিছুটা রদবদল করে মানুষের পেচ্ছাপের নমুনার মধ্যে রোগের বীজাণুর পরিমাণ নির্ধারণের কাজকে

মাত্র পনের মিনিটের মধ্যেই সম্পন্ন করতে সক্ষম হলেন, প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির মাধ্যমে যে কাজটি সম্পূর্ণ করতে কয়েকদিন সময় লেগে যেত।

পরীক্ষার পদ্ধতিটি হল এরকম : পেচ্ছাপের যেসব নমুনার মধ্যে রোগের বীজাণু আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, ওদের যন্ত্রটির মধ্যে বসিয়ে একটি নিশ্ছিদ্র আধারে রাখা হয়। এবারে ঐ নমুনাগুলোর মধ্যে কিছু রাসায়নিক পদার্থের অনুপ্রবেশ ঘটানো হল। পেচ্ছাপের নমুনার মধ্যে রোগের বীজাণু থাকলে তা থেকে আলো নির্গত হবে এবং একটি আলোনির্দেশক যন্ত্রে তা ধরা পড়বে। আলোর জোর বেশি হলে বুঝতে হবে রোগের বীজাণুও রয়েছে বেশি পরিমাণে। সব জীবিত পদার্থের মধ্যেই অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট (ATP) নামে একটি রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে যা লিউসিফিরেস নামে আর একটি রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে সংযুক্ত হলেই দীপ্তিমান হয়ে ওঠে। কিছু নির্দিষ্ট রাসায়নিক পদার্থ এবারে পেচ্ছাপের নমুনাগুলোর সঙ্গে যুক্ত করলেই শ্বেত ও লোহিত রক্তকোষ বা কলার (টিসু) মধ্যে উপস্থিত ATP-র ধ্বংস অনিবার্য।

দাঁতের প্রতিরক্ষা

দাঁতের চিকিৎসাও উপকৃত হয়েছে মহাকাশ বিজ্ঞানের পরীক্ষানিরীক্ষায়। অ্যাপোলো পরিকল্পনার অভিযাত্রীরা চাঁদের পৃষ্ঠভাগ থেকে যে মৃত্তিকার নমুনা সংগ্রহ করে এনেছিলেন তাকে বিশ্লেষণের জন্যে ন্যাসার বিশেষজ্ঞেরা একটি যন্ত্রকে উদ্ভাবন করেছিলেন। এই যন্ত্রটিই দন্তচিকিৎসকদের হাতে এক নতুন রূপ পেল। দাঁতের ক্ষয়কাজ শুরু হবার অনেক আগেই এই যন্ত্রটির সন্ধানী দৃষ্টিতে তার পূর্বাভাস ধরা পড়ে যাচ্ছে, চোখে দেখে বা প্রচলিত পদ্ধতির সাহায্যে যা ধরা পড়ত আরো অনেক দিন বাদে।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কাজে নিযুক্ত কৃত্রিম উপগ্রহদের আভ্যন্তরীন যন্ত্রপাতির প্রয়োজনে যে খুব ছোট এবং নিখুঁত বল বেয়ারিং ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা হয়েছিল, তারই সাহায্যে অতি দ্রুতগতিসম্পন্ন দাঁতের ড্রিল (ছেদক) যন্ত্র তৈরি করা সম্ভবপর হয়েছে।

শারীরবিত্তার নানাদি ক্ষেত্রে

চাঁদের অভিকর্ষ পৃথিবীর অভিকর্ষের ⅙ ভাগ। এই স্বল্প অভিকর্ষযুক্ত ক্ষেত্রে মহাকাশ অভিযাত্রীদের হাঁটা বা দৌড়োনোর প্রশিক্ষণের জন্যে যেসব যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছিল ওদেরই কাজে লাগানো হল শারীরিকভাবে যারা পঙ্গু তাদের হাঁটাচলার প্রশিক্ষণের ব্যাপারে।

ইকো এবং এক্সপ্লোরার পর্যায়ের বেলুনরূপী কৃত্রিম উপগ্রহদের জন্যে যে বিশেষ জাতের অ্যালুমিনিয়ামযুক্ত প্লাস্টিক উদ্ভাবিত হয়েছিল তার প্রয়োগ ঘটল একটি মানবিক কাজে। শীতপ্রধান দেশে এই প্লাস্টিককে ব্যবহার করা হয় সদ্যোজাত শিশুদের জড়িয়ে রাখার জন্যে ; এজাতীয় ব্যবস্থায় দেখা গেল শিশুদের শরীরের শতকরা আশি ভাগ তাপ সংরক্ষিত হচ্ছে। প্রসবঘরের তাপমাত্রাকে সদ্যোজাত শিশুদের পক্ষে স্বাচ্ছন্দ্যকর পর্যায়ে রাখার চেয়েও দেখা গেল এই নতুন ব্যবস্থাটি অনেক বেশি কার্যকর হচ্ছে। অবশ্য এ জাতীয় ব্যবস্থাকে একমাত্র হাসপাতালের বাইরে বাড়িতে অথবা অন্য কোথাও আকস্মিক সন্তানপ্রসবের ঘটনার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা উচিত। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে স্বভাবতই এ জাতীয় ব্যবস্থা অপ্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে।

এছাড়াও চিকিৎসাব্যবস্থার আরো নানাদি ক্ষেত্রে মহাকাশবিজ্ঞানের সুফল প্রয়োগ আমরা প্রত্যক্ষ করছি। কৃত্রিম উপগ্রহে ব্যবহারের জন্যে বিশেষভাবে তৈরি সঙ্কর (অ্যালয়) ধাতু ভাইটেলিয়ামের ঘর্ষণ এবং ক্ষয়কাজকে প্রতিরোধের সামর্থ্য রয়েছে এবং এর লুব্রিকেশনেরও কোন প্রয়োজন নেই ; এই বস্তুটিকেই কৃত্রিম হাড়ের সংযোজকরূপে ব্যবহার করতে শুরু করেছেন বিশেষজ্ঞেরা।

মহাকাশে বিচরণশীল কৃত্রিম উপগ্রহ এবং মহাকাশযানেদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত উপাদানেদের বীজাণুমুক্ত করার পদ্ধতিকে প্রয়োগ করা হয়েছে ওষুধ এবং ভ্যাকসিনজাতীয় বস্তুদের ক্ষেত্রে, রোগের চিকিৎসায় মানুষের শারীরব্যবস্থায় যাদের প্রয়োগ করতে হয়।

বর্তমানে ব্যবহৃত হিয়ারিং এড কম শ্রবণশক্তিসম্পন্ন মানুষদের জীবনে এক নতুন অধ্যায়কে যোজনা করেছে। মহাকাশবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রের প্রয়োজনে উদ্ভাবিত অতি ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশের কল্যাণেই এটা সম্ভবপর হতে পেরেছে এবং এত ক্ষুদ্র মাপের হিয়ারিং এড তৈরি হয়েছে স্বচ্ছন্দেই যাকে কানের ভেতরের ফাঁকের মধ্যে বসিয়ে নেয়া যায়।

আমরা দেখতে পেলাম চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র মহাকাশবিজ্ঞানের গবেষণার দ্বারা উপকৃত হয়ে কিভাবে সাধারণ মানুষের জীবনে এক কল্যাণকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পেরেছে।

২২

মহাকাশের বুক থেকে পৃথিবী

মহাকাশে পরিক্রমারত কৃত্রিম উপগ্রহেরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাকৃতিক সংস্থান, জমি, সমুদ্র এবং বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে যেমন পর্যবেক্ষণলব্ধ বহু প্রয়োজনীয় তথ্য আমাদের কাছে পাঠাতে পারে তেমনি এই অঞ্চলগুলোয় মানুষের নানাদি কাজের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধেও আমাদের সচেতন করে তুলতে পারে। পৃথিবীর বহু দুর্গম এলাকার ওপর দিয়ে পাড়ি জমাচ্ছে কৃত্রিম উপগ্রহেরা, যেমন দুই মেরু অঞ্চলের তুষারাবৃত এলাকা, সাহারা মরুভূমি, দক্ষিণ অ্যামেরিকা এবং আফ্রিকার ঘন গভীর অরণ্য। আজ পৃথিবীর কোন এলাকাই আর আমাদের কাছে অনাবিষ্কৃত নয়।

পৃথিবীর এক নতুন রূপ আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছে, যে রূপে তাকে দেখবার সুযোগ মহাকাশ যুগ শুরু হবার আগে আমরা পাই নি। একই সঙ্গে যে চেতনায় আমরা উদ্বুদ্ধ হয়েছি, তা হল এই—আমাদের পৃথিবী মহাকাশের বুকে একটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র, তার প্রাকৃতিক এবং খনিজ সম্পদও হল সীমাবদ্ধ। পৃথিবীর প্রাকৃতিক সংস্থানের বিভিন্ন উপাদানকে যদি আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার না করি, তাহলে ওদের স্বাস্থ্য হবে বিপন্ন, দূষিত হবে ওদের পরিবেশ, বিপন্ন হয়ে পড়ব আমরাও। প্রকৃতির হাত থেকে অকৃপণ দাক্ষিণ্যে যেটুকু সম্পদ আমরা পেয়েছি, তাকে ব্যবহার করা শুধু নয়, সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের দায়িত্বও হল আমাদের। মহাজাগতিক চেতনার এও হল এক নতুন দৃষ্টিকোণ। দুর্ভাগ্যবশত এই চেতনায় আমরা পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষই আজও কিন্তু উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে পারি নি। দুশ্চিন্তা এবং দুর্ভাবনার কারণটি হল সেখানেই।

পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ ও কৃত্রিম উপগ্রহ

পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ যেহেতু অফুরন্ত নয়, তাই তাকে আমরা যেভাবে ব্যবহার করছি, তার একটি পরিচয়পত্র আমাদের হাতে সবসময়েই থাকা উচিত। একদল কৃত্রিম উপগ্রহ ঠিক এই কাজটিই করে চলেছে। এদের নাম দেয়া হয়েছে 'আর্থ রিসোর্সেস স্যাটেলাইটস'। এমন কিছু অনুসন্ধানী যন্ত্রপাতিতে এরা সজ্জিত যাতে পৃথিবীর কৃষিজ ও বনজ সম্পদ, জলবিদ্যা ও জলজ সম্পদ, ভূ-বিদ্যা

ও খনিজ সম্পদ, মানচিত্রবিদ্যা, ভূগোলবিদ্যা ও মানুষের নিজের হাতে গড়া সম্পদ, সমুদ্রবিদ্যা ও সামুদ্রিক প্রাণীজ ও খনিজ সম্পদ এবং আরো বহুবিধ ক্ষেত্র সম্বন্ধে এরা পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান কাজ চালাতে পারে এবং পরিমাপের যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বহু প্রয়োজনীয় তথ্যও সংগ্রহ করতে পারে। ('কৃত্রিম উপগ্রহদের বৈজ্ঞানিক অবদান' অধ্যায়ে আমরা ইতিপূর্বে এ প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করেছি।) স্বভাবতই এজাতীয় তথ্যের অর্থনৈতিক উপযোগিতা রয়েছে নানাভাবে। শিল্পে অনগ্রসর কৃষিনির্ভর দেশগুলির ক্ষেত্রে এ প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি পরিমাণে অনুভূত হবে।

অ্যামেরিকাতেই ওখানকার কৃষি দপ্তরের কাছ থেকে পাওয়া ১৯৭০-এর দশকের একটি হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে যে কৃত্রিম উপগ্রহদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য ও ছবির ভিত্তিতে ওখানকার কৃষিজ ও বনজ সম্পদের ক্ষেত্রে এক বছরে সাশ্রয় হয়েছে প্রায় ৩৫০০ কোটি টাকা। আবহাওয়া সম্বন্ধে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ফসলের ক্ষতি হয়েছে কম। কোথাও শস্যের ক্ষেতে রোগ বা মড়ক দেখা দিলে বা অরণ্যে আগুন ধরে গেলে সে ঘটনা কৃত্রিম উপগ্রহদের মাধ্যমে সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়ে গেছে এবং প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাও গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়েছে। বছরের কোন্ সময়ে চাষের কাজ শুরু করলে সবচেয়ে ভাল ফসল পাওয়া যাবে, ফসলের মাপ এবং গুণগত মানই বা কতটা অর্জন করা সম্ভবপর হবে—এজাতীয় পূর্বাভাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব যে কতটা তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি।

তড়িৎচৌম্বকীয় পরিচয়পত্র

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকেই চিনে নেবার একটি বিশেষ পরিচয়পত্র আছে, যার মধ্যে পড়ে তার আঙ্গুলের ছাপ এবং গলার স্বর। ঠিক একইরকমভাবে পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগের প্রতিটি বস্তুকে চিনে নেবার একটি বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে, সে হল তড়িৎ-চৌম্বকীয় বর্ণালীতে হাতের ছাপরূপী তার স্বাক্ষর। পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু, ছোট বড় যে কোন মাপেরই হোক না কেন—পাহাড়ের শিলাস্তর, মরুভূমি, গভীর অরণ্য, অ্যান্টার্কটিকার তুষারক্ষেত্র, ছোট আপেলের বাগান থেকে শুরু করে বিশাল গমের ক্ষেত, নদী বা সাগরের জলরাশি—এরা সবাই অতিবেগুনী থেকে মাইক্রোওয়েভ পর্যন্ত তড়িৎচৌম্বকীয় বর্ণালীর একটি বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্যে বাইরে থেকে বিকিরণকে শোষণ করে, প্রতিফলিত করে আবার নিজেরা বিকিরণকে নির্গতও করে থাকে।

পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুই ছড়াচ্ছে অবলোহিত বা তাপ তরঙ্গকে, তাপ

তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্যে বস্তুবিশেষে কিছুটা হেরফের হচ্ছে মাত্র। হাতের স্বাক্ষররূপী এই তাপ তরঙ্গের মাধ্যমে একটি বস্তুর অবস্থা এবং প্রকৃতি দুয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়। একটি কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে বসানো সচেতক যন্ত্রপাতি (রিমোট সেনসর) জমি এবং সাগরের মধ্যে পার্থক্যকে বুঝতে পারে, সাগরের বিক্ষুব্ধ এবং শান্ত জলরাশি এবং ঠাণ্ডা ও উষ্ণ জলের মধ্যে পার্থক্যকে সঠিকভাবে নিরূপণও করতে পারে। কারণ যে কোন বস্তু থেকে বিকিরণের পরিমাণ নির্ভর করে প্রধানত বস্তুটির পৃষ্ঠভাগের গঠন এবং তাপমাত্রার ওপরে।

কৃষিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি প্রত্যেকটি গাছের জন্যে বর্ণালীর মধ্যে যেন একটি নির্দিষ্ট খোপ রয়েছে। গাছেরা যখন রোগাক্রান্ত হয়, ওরা তখন গাছের পাতার সবুজ ক্লোরোফিলকে খুইয়ে বসে এবং এই পরিবর্তন ধরা পড়ে রুগ্ন গাছটির তরঙ্গদৈর্ঘ্যরূপী স্বাক্ষরের মধ্যে। অবলোহিত তরঙ্গের মাধ্যমে তোলা অরণ্যের ছবিতে রুগ্ন গাছগুলোকে সুস্থ গাছেদের তুলনায় একটু বেশি কালচে দেখাবে।

একইরকমভাবে অবলোহিতের কাছাকাছি তরঙ্গদৈর্ঘ্যে একটি গমচাষের ক্ষেতের ছবি তোলার মাধ্যমে বোঝা যাবে গাছে পোকা ধরেছে কিনা, এবং সার ও সেচকাজের পরিমাণও যথাযথ পরিমাণে চলছে কিনা।

সম্পদ অনুসন্ধানকারী কৃত্রিম উপগ্রহ

তড়িৎচৌম্বকীয় স্বাক্ষরের পাঠোদ্ধারের মধ্য দিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী এই বিশেষ কৃত্রিম উপগ্রহেরা অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই এক বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। ফলে সাগরে একটি যাত্রীবাহী জাহাজের গতিপথ নির্ধারণ করা থেকে শুরু করে রুগ্ন গাছেদের কেটে ফেলা পর্যন্ত যে কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা যায় অকল্পনীয় দ্রুততা এবং নির্ভুলতার সঙ্গে। অর্থাৎ সোজা কথায় বলা যায় পৃথিবীর যে কোন জায়গায় যে কোন প্রাকৃতিক সমস্যা আয়ত্তের বাইরে যাবার আগেই ওদের যথাযথভাবে বিবেচনার মধ্য দিয়ে সমাধানের প্রয়োজনীয় কাজটা শুরু করা যেতে পারে।

পৃথিবীর সম্পদ অনুসন্ধানকারী কৃত্রিম উপগ্রহদের মধ্যে রয়েছে একাধিক সচেতক (সেনসিং) ব্যবস্থাযুক্ত নানাদি উপাদান যেমন ছবি তোলার ক্যামেরা, রেডার এবং রেডিওমিটার। রেডিওমিটার যন্ত্রে সমগ্র বিকিরণের পরিমাণ যেমন মাপা যায়, তেমনি বর্ণালীর একটি বিশেষ ক্ষেত্র যেমন অবলোহিত অঞ্চলে আলাদাভাবে বিকিরণের পরিমাপও গ্রহণ করা যায়।

সচেতক ব্যবস্থায় সম্পদের অনুসন্ধান

তাপ-তরঙ্গের মাধ্যমে পরিমাপক প্রক্রিয়ার মূলে রয়েছে যে তথ্যটি, তা হল এই, পরম শূন্য তাপমাত্রার ওপরে অবস্থিত প্রতিটি বস্তুই তাপ-তরঙ্গের বিকিরণ ঘটিয়ে থাকে। তড়িৎচৌম্বকীয় বর্ণালীতে তাপ তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিস্তৃতি হল ০·৭ থেকে ১০০০ মাইক্রন। ১ মাইক্রন হল ১/১০০০ মিলিমিটার। এই তাপ তরঙ্গের পরিমাপ সংগ্রহের যে যান্ত্রিক ব্যবস্থা তা হল নিষ্ক্রিয় (প্যাসিভ) প্রকৃতির অর্থাৎ এ থেকে রেডার যন্ত্রের মত উদ্দিষ্ট বস্তুটির দিকে কোন স্পন্দনকে (পাল্‌স্) ছুঁড়ে মারা হয় না। তাপ তরঙ্গ সংগ্রাহক যন্ত্রটি নিচের জমির প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ (স্ক্যান) করে চলে, একটি ক্যাথোড-রে-টিউবের পর্দার ওপর সংগৃহীত তথ্য বা ছবিটি ফুটে ওঠে, একটি রেকর্ডি ক্যামেরা আবার তার ছবি তুলে নিয়ে তাকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে।

তাপ তরঙ্গ আলোক তরঙ্গের মত কোন প্রাকৃতিক বাধার দ্বারাই প্রতিহত হয় না। মেঘ, ঝড়, জল, বৃষ্টি, কুয়াসা, এমনকি রাতের অন্ধকারকে পেড়িয়েও পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রতিটি বস্তু থেকে এই তরঙ্গের বিকিরণ ঘটতে থাকে।

ভারতের গবেষণা

আমাদের ভারতের মত দেশে পৃথিবীর সম্পদ অনুসন্ধানকারী কৃত্রিম উপগ্রহদের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। হায়দ্রাবাদে ভারতের 'ন্যাশনাল রিমোট সেনসিং এজেন্সী'র দপ্তর প্রতিষ্ঠিত ; এখানকার বিশেষজ্ঞদের মতে এজাতীয় প্রক্রিয়ায় সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে একটি বড় মাপের গঠনমূলক কাজের পরিকল্পনা ও রূপায়ন অনেক কম ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

ধরা যাক একটি বড় মাপের সেচ প্রকল্পের কথা। একাজের জন্যে প্রাথমিক অনুসন্ধান, নকসা রচনা এবং কাজটি বাস্তবে রূপায়ন—সব কিছুর জন্যে তিন থেকে চার বছরের মত সময় লেগে যেতে পারে। রিমোট সেন্সিং পদ্ধতির মাধ্যমে কৃত্রিম উপগ্রহদের যন্ত্রব্যবস্থায় সংগৃহীত ছবির (ইমেজারি) সাহায্যে গোটা কার্জটির সময় এবং খরচা দুইই বেঁচে যেতে পারে দুই-তৃতীয়াংশের মত অর্থাৎ এক বছরেই কাজটি সম্পূর্ণ হতে পারে। ফলে সাধারণ মানুষও প্রকল্পটির দ্বারা উপকৃত হতে থাকবে নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই।

১৯৮৮ সালের এপ্রিল মাসে ভারত মহাকাশে তার প্রথম রিমোট সেন্সিং কৃত্রিম উপগ্রহকে পাঠাবে। ইতিমধ্যে এজাতীয় বিদেশী কৃত্রিম উপগ্রহদের সাহায্য ভারত গ্রহণ করে চলেছে। হায়দ্রাবাদ থেকে ৫৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত শাদনগরে একটি গ্রাহক ষ্টেশন বসানোও হয়েছে।

একটি রিমোট সেনসিং কৃত্রিম উপগ্রহ ভারতের এলাকার ওপর থাকে পনের মিনিটের মত এবং এই সময়ে ভারতের ওপর দিয়ে দুবার পরিক্রমার কাজ ও সম্পূর্ণ করে। শাদনগরে গ্রাহক স্টেশনে দৃশ্যগোচর হবার সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম উপগ্রহটির তথ্যপ্রেরক ব্যবস্থা স্টেশনের অ্যান্টেনার সঙ্গে এক সুদৃঢ় সংযোগ স্থাপন করে বসে। টেকনিকাল ভাষায় ব্যাপারটাকে বলা হচ্ছে লকিং, যেন তালায় চাবি লাগানোর মত মহাকাশ এবং মাটির দুই কেন্দ্র পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ল।

ভারতের ওপর দিয়ে প্রতিবার চক্কর লাগাবার সময় কুড়িটির মত দৃশ্য কৃত্রিম উপগ্রহটি শাদনগর গ্রাহক স্টেশনের হাতে তুলে দেয়। প্রতিটি দৃশ্যের মাধ্যমে প্রায় ১৮৫ কিলোমিটারের মত এলাকার ছবি সংগৃহীত হচ্ছে এবং কম্পিউটারের ভাষা ডিজিটাল বিটের আকারে ২৪ সেকেণ্ডের মধ্যে ঐ দৃশ্যরূপী তথ্য পৌঁছে যাচ্ছে গ্রাহক স্টেশনের হাতে।

গ্রাহক স্টেশনের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ঐ ডিজিটাল বিটরূপী তথ্যকে অবিশ্বাস্য দ্রুততার (মাইক্রোসেকেণ্ড, এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়) সঙ্গে দৃশ্যগোচর ছবিতে রূপান্তরিত করে তুলছে। বিজ্ঞানীরা ছবিগুলো দেখতে দেখতে স্থির করেন ওদের মধ্যে কোনগুলোর ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং স্থায়ীভাবে রক্ষা করার উপযুক্ত।

সামুদ্রিক অনুসন্ধান

পৃথিবীর শতকরা ৭১ ভাগ জায়গা জুড়ে হল ওর সাগর ও মহাসাগরের এলাকা। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা পৃথিবীর চাঁদ সম্বন্ধে যতটা জানি, সাগরের রহস্যময় গভীর অঞ্চল এবং তার তলদেশ সম্বন্ধে জানি তার চেয়েও কম। সমুদ্রস্রোতেরা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। সমুদ্র হল পৃথিবীর শ্বাসযন্ত্রের মত। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে পরিচ্ছন্ন ও দূষণের হাত থেকে মুক্ত রাখার ব্যাপারেও সাগরের ভূমিকাটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

মহাকাশ বিজ্ঞানের পৃথিবী অনুসন্ধান পর্বে মহাসাগরের এলাকা এক বড় ঘটনাচক্রের নায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে পৃথিবী পরিক্রমারত একদল কৃত্রিম উপগ্রহ সাগরের পৃষ্ঠভাগের এবং তার নিচের জলস্তরের ঘটনাবলীর ওপর যেমন খবরদারী বজায় রাখছে তেমনি সামুদ্রিক স্রোতেদের গতিবিধি ও সাগরের পৃষ্ঠভাগের ওপর দিয়ে বায়ুবাহিত মেঘস্তরের ছবি তোলার মধ্য দিয়ে আবহাওয়ার পূর্বাভাসের কাজেও বিশেষজ্ঞদের সাহায্য করছে।

সামুদ্রিক তথ্য যাদের উপকারে লাগবে

সমুদ্রবৈজ্ঞানিক কৃত্রিম উপগ্রহদের সংগৃহীত তথ্যের দ্বারা প্রধানত তিনটি শিল্পব্যবস্থা বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে। প্রথমটি হল মৎস্য শিল্প, দ্বিতীয়টি জাহাজী শিল্প এবং তৃতীয়টি হল সাগরের উপকূলবর্তী অন্যান্য শিল্পব্যবস্থা।

সামুদ্রিক মাছেদের সংগ্রহের ব্যাপারটা বর্তমানে পৃথিবীর একটি বড়মাপের শিল্পব্যবস্থা রূপেই গণ্য হয়ে থাকে। পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পুষ্টির চাহিদা মেটাবার ক্ষেত্রেও সামুদ্রিক মাছেদের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। বর্তমানে সাগর থেকে সংগৃহীত মাছের বাৎসরিক পরিমাণ হল প্রায় ৮০ মিলিয়ন টনের কাছাকাছি। শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ মাছ সংগৃহীত হয় সাগরের একশ থেকে দেড়শ মিটার গভীরে শীতল এবং নাতিশীতোষ্ণ জলের এলাকা থেকে।

সাগর থেকে মাছ সংগ্রহের কাজে যারা নিযুক্ত তাদের সবচেয়ে বড় সমস্যাটা হল মাছেদের ঝাঁকের সন্ধান কোথায় মিলবে সেই অবস্থানক্ষেত্রটা সঠিকভাবে জানা, একটি নির্দিষ্ট জায়গাতে মাছের সংগৃহীত পরিমাণই বা কি দাঁড়াবে এবং সাগরের প্রকৃতি সেখানে কি হবে অর্থাৎ শান্ত না ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ, এ সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য পূর্বাভাস। সমুদ্রবৈজ্ঞানিক কৃত্রিম উপগ্রহেরা এব্যাপারে কিছুটা সাহায্যকারীর ভূমিকা গ্রহণ করতে চলেছে।

সাগরের কোন অঞ্চলে মাছেদের পরিমাণ কি দাঁড়াবে তা নির্ভর করছে ঐ অঞ্চলে সাগরের তলদেশ থেকে কি পরিমাণে পুষ্টি উপাদান সাগরের পৃষ্ঠভাগে এসে হাজির হচ্ছে। নাইট্রেট এবং ফসফেটরূপী এই পুষ্টি উপাদানেরা যেখানে বেশি পরিমাণে হাজির হবে সেখানে মাছেদের খাদ্য ফাইটোপ্ল্যাংকটনদের বংশবৃদ্ধিও হবে দ্রুতগতিতে। ফাইটোপ্ল্যাংকটনেরা হল শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদ।

মাছেদের ঝাঁক জলে থাকলেই জলের ওপর যে তেল ভেসে উঠবে বা জলের পৃষ্ঠভাগের ওপর যে হাল্কা বাষ্পের স্তর তৈরি হবে, মহাকাশে পরিক্রমারত কৃত্রিম উপগ্রহদের তথ্যসংগ্রাহক যন্ত্রে তা ধরা পড়বেই। কিছু যন্ত্র সব সময়েই সাগরের পৃষ্ঠভাগের এবং তার নিচেকার স্তরের তাপমাত্রা পরিমাপ করে চলেছে, যে তাপমাত্রার সঙ্গে মাছেদের খাদ্য ফাইটোপ্ল্যাংকটনদের বংশবৃদ্ধির নিবিড় সম্পর্ক। তাপমাত্রার দৈনিক পরিমাপ সংগ্রহ করা তাই বিশেষভাবে প্রয়োজন যেহেতু ফাইটোপ্ল্যাংকটনদের পরিমাণের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে দিনগত এবং ঋতুগতভাবেও। সাগরের পৃষ্ঠভাগের ওপর বিভিন্ন জলস্রোতের মধ্যে মিশ্রণ ঘটলে প্ল্যাংকটনদের সমাবেশ সাগরপৃষ্ঠের একশ মিটার নিচে গিয়ে হাজির হতে

পারে ; ঐ গভীরতায় সূর্যের আলোর পরিমাণ হবে এত কম যে প্ল্যাঙ্কটনদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে প্রয়োজনীয় সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াকে আর তা কার্যকরী করে তুলতে পারবে না।

সাগরে মাছ ধরার কাজে নিযুক্ত জাহাজ মাছেদের অবস্থানক্ষেত্রের সন্ধান সরাসরি কৃত্রিম উপগ্রহদের কাছ থেকেই পেতে পারে অথবা মহাদেশের জমির ওপর কোন তথ্যসংগ্রহক যন্ত্র তা সংগ্রহ করে নিয়ে মূল সংগ্রাহক কেন্দ্রে তা পৌঁছে দিতে পারে।

বিশেষজ্ঞেরা অবশ্য বলছেন শুধু জলের তাপমাত্রা এবং আঞ্চলিক প্ল্যাঙ্কটনদের পরিমাণ নির্ধারণই নয়, প্রতিটি মাছের ডিম পাড়া, ডিম ফুটে বাচ্চা বেড়োনো এবং এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পরিক্রমা, সামুদ্রিক পরিবেশের সঙ্গে মাছেদের ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার সম্পর্ক এবং সর্বোপরি যে প্রাকৃতিক পরিবেশের ওরা অংশ, মাছেদের প্রজনন ব্যবস্থার সঙ্গে এই সমগ্র ব্যাপারটাই গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

সাগরের কোন একটি অঞ্চল থেকে মাছ সংগ্রহের পরিমাণ সেই অঞ্চলে মাছেদের প্রজনন ব্যবস্থার ক্ষমতাকে যেন অতিক্রম করে না বসে এটাও লক্ষণীয় বিষয়। এব্যাপারেও কৃত্রিম উপগ্রহেরা সাহায্যকারীর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

সামুদ্রিক বরফ ও হিমবাহ

সাগরে বরফ এবং হিমবাহের অবস্থিতি সংক্রান্ত সঠিক তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা ব্যবসায়িক ও বৈজ্ঞানিক দু দিক থেকেই রয়েছে। জাহাজ চলাচলের পথে এরা কোথায় কি পরিমাণে রয়েছে এবং এদের আকৃতিগত পরিবর্তনই বা কতটা ঘটছে নিরাপত্তার জন্যেও তা জানা প্রয়োজন।

সমুদ্রবৈজ্ঞানিক কৃত্রিম উপগ্রহদের মধ্যে বসানো সব ধরনের আবহাওয়ায় কার্যক্ষম সচেতক যন্ত্রপাতিদের অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে হিমবাহদের অস্তিত্ব যেমন ধরা পড়ছে, তেমনি ওদের গতিপথের ওপর নজর রাখা হচ্ছে। হিমবাহদের জন্ম কিভাবে হচ্ছে এবং ওদের মোট সংখ্যাই বা কত, ওদের আকৃতি এবং বিস্তৃতি এবং বায়ু ও সমুদ্রস্রোতেরা ওদের গতিপথকে কিভাবে পরিবর্তিত করছে, এ সম্বন্ধেও বিশেষজ্ঞেরা অবহিত হতে চাইছেন।

আমেরিকার টাইরস ও নিম্বাস পর্যায়ের এবং ওদের সমধর্মী সোভিয়েট ইউনিয়নের কৃত্রিম উপগ্রহেরা সমুদ্র এবং বড় বড় হ্রদের ভেতরে বরফের খণ্ড ও হিমবাহদের গতিবিধির ওপর নজর রাখছে। এই খবরদারীর মধ্য দিয়ে

যে সমুদ্রস্রোতদের ঘাড়ে চড়ে হিমবাহেরা পাড়ি জমায়, ওদের বেগ ও গতিপথ নির্ণয়ের কাজটাও সহজে করা যাচ্ছে।

সাগরের ঝড়ঝঞ্ঝা

সাগরের উপকূলবর্তী জনপদ, বন্দর, বিভিন্ন কর্মকেন্দ্র সবাই সাগরের ঝড় এবং সুৎনামির (ভূমিকম্পজনিত সংক্ষুব্ধ সাগরের তরঙ্গস্ফীতি) শিকার হয়ে থাকে মাঝে মাঝেই। সাগরের এজাতীয় বিপদসংকেতজ্ঞাপক পরিস্থিতি বর্তমানে আবহাওয়া নির্ণয়কারী এবং সমুদ্রবৈজ্ঞানিক কৃত্রিম উপগ্রহদের সাহায্যে সংগৃহীত সংবাদ এবং ছবির মাধ্যমে অনেক আগেই পাওয়া যাচ্ছে। একইসঙ্গে উপকূলের কাছাকাছি জনপদবাসীদের নিরাপত্তামূলক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সময় এবং সুযোগ দুইই পাওয়া যাচ্ছে যথেষ্ট পরিমাণে।

কৃত্রিম উপগ্রহদের আভ্যন্তরীন রেডার ও লেসার যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সমুদ্র-পৃষ্ঠের অস্বাভাবিক কোন পরিবর্তন সাগরের বহু দূরবর্তী প্রদেশেই ধরা পড়ে যাচ্ছে। এ হল অশনিসংকেতের মত—সাগরে ঝড় দানা বাধছে, ঝড়ের তাণ্ডবে সাগরের তরঙ্গ উঠবে ফুলেফেঁপে। এবারে পরিমাপ গ্রহণ করতে হবে এই সংক্ষুব্ধ তরঙ্গের মানুষ ও সম্পত্তির ক্ষতিসাধনের ক্ষমতা কতটা, কতটা দূরের পথ পাড়ি জমাবার সামর্থ্য এদের রয়েছে, সামুদ্রিক ঝড়ের চেহারা কতটা বড় এবং ওকে ঘাড়ে নিয়ে ছুটছে যে বাতাস ওর বেগই বা কত। একই সঙ্গে জানা দরকার সাগরের যে অঞ্চলের ওপর দিয়ে এই ঝড় ছুটছে, তার তলাবর্ত্মের (টপোগ্রাফি) গঠনপ্রকৃতিটাই বা কি।

সাগরগর্ভে কোন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গারের ফলে জলের তাপীয় অবস্থার মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটবে, অবলোহিত আলোতে প্রতিচ্ছবির মাধ্যমে (ইনফ্রারেড লাইন-স্ক্যান ইমেজিং সিস্টেম) তার পরিমাপ ও বিশোষণ বর্ণালীবীক্ষণ বিদ্যার (অ্যাবজর্‌ব্‌সন স্পেকট্রস্কোপি) সাহায্যে সাগরপৃষ্ঠের ওপর নিষ্ক্রান্ত গ্যাসীয় পদার্থদের পরিমাণ সংগ্রহ করে এবং সাগরের তলদেশ থেকে পৃষ্ঠভাগে উৎক্ষিপ্ত বস্তুপুঞ্জের প্রভাবে জলের রঙের পরিবর্তনের ছবি তুলে নিয়ে মহাকাশে পরি-ক্রমারত কোন কৃত্রিম উপগ্রহ ঘটনাটির সংবাদ অনতিবিলম্বেই আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে। এজাতীয় সাফল্য ইতিমধ্যেই অর্জিত হয়েছে।

সাগরগর্ভে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গারের সঙ্গে ঐ অঞ্চলে ভূমিকম্প ঘটতে পারে এবং একইসঙ্গে সৃষ্টি হতে পারে মারাত্মক সুৎনামির। এ যেন অনেকটা নাটকের পট পরিবর্তনের মত ঘটনা। আগেভাগে জেনে নিয়ে ব্যবহারিক লাভটা হচ্ছে আমাদেরই। সাহায্য পেলাম কৃত্রিম উপগ্রহদের কাছ থেকে।

সাগরের দূষণ

সমুদ্র হল আমাদের পৃথিবীর শ্বাসযন্ত্রের মত। গোটা পৃথিবীর আবহাওয়াকে যেমন এ নিয়ন্ত্রণ করছে, তেমনি আমাদের বায়ুমণ্ডলকে নানা দূষিত উপাদানের হাত থেকে পরিচ্ছন্ন রাখার কাজেও এর ভূমিকাটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাতাসের সঙ্গে সাগরের প্রতিনিয়ত চলেছে এক খেলা—পরস্পরের মধ্যে নানান আদানপ্রদান।

পৃথিবীর অসংখ্য নদীবাহিত নানাবিধ উচ্ছিষ্ট এবং আবর্জনা ক্রমাগত, সাগরে জমা পড়ছে—এরমধ্যে রয়েছে শিল্পজাত উচ্ছিষ্ট, কীটনাশক পদার্থ, জনপদবাসীদের পায়খানার অপরিশোধিত মল, তেলবাহী জাহাজ এবং তেল-শোধনাগার থেকে সাগরে নিঃসৃত খনিজ তেল। সাগরের জলজ প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই সব উপাদান এক মারাত্মক প্রতিক্রিয়া নিয়ে দেখা দেয়। মাছেদের চারণভূমিগুলোতে বিপুল সংখ্যায় মাছ মারা পড়ে বিষক্রিয়ার প্রকোপে, সেই মাছের বিষক্রিয়ায় সংক্রামিত হতে পারে মানুষও। জাপানের মিনামাটা দ্বীপপুঞ্জের বহু অধিবাসী মাছেদের মাধ্যমে পারদের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা পড়েছিল, বহু শিশু ও বয়স্ক মানুষ সারা জীবনের মত পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল।

সাগরের ওপর দিয়ে পরিক্রমারত একদল সমুদ্রবৈজ্ঞানিক ও পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্যনির্ণয়কারী কৃত্রিম উপগ্রহ সাগরের পরিবেশ দূষণের ঘটনার ওপর বর্তমানে খবরদারী বজায় রাখছে। এদের অনুসন্ধানী যন্ত্রপাতির দৃষ্টিতে সাগরের জলের সামান্য পরিমাণ গুণগত পরিবর্তন ধরা পড়ে যাবে, যা ঘটতে পারে দূষিত পদার্থের প্রভাবে—নদীপ্রবাহের মাধ্যমে বয়ে এসে যা সাগরের মোহনায় বা খাড়ির মুখে জমা পড়ছে। সাগরের জলে অতিরিক্ত পরিমাণে তাপ সঞ্চারিত হয়েও বা তাপীয় দূষণের প্রভাবে এজাতীয় ঘটনা ঘটতে পারে।

রাসায়নিক দূষিত পদার্থ নদীর মাধ্যমে সাগরে জমা পড়ে জলে যে রঙের পরিবর্তনকে ঘনিয়ে তুলবে এবং শ্যাওলা ও সামুদ্রিক আগাছার অতিরিক্ত বংশ-বিস্তারের ফলে জলে ক্লোরোফিলের বাড়তি পরিমাণজনিত যে দূষণ—এসব ঘটনাও কৃত্রিম উপগ্রহের সন্ধানী সচেতক যন্ত্রদের নজর এড়িয়ে যাবে না।

সমুদ্র যেহেতু পৃথিবীর শতকরা প্রায় ৭১ ভাগ জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে তাই এই বিশাল অঞ্চলে দূষণের সামগ্রিক ঘটনার ওপর খবরদারী বজায় রাখার, সামর্থ্য রয়েছে একমাত্র কৃত্রিম উপগ্রহদেরই। প্রতি দেড় ঘণ্টায় ওরা পৃথিবীকে একবার পরিক্রমা সম্পূর্ণ করছে এবং ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা বাদে আবার পৃথিবীর একই অঞ্চলের ওপর দিয়ে ওরা পাড়ি জমাবে। তাই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলে সাগরের জলরাশির যে কোন দূষণের ঘটনাকে ওরা প্রত্যক্ষ করবে

এবং পৃথিবীর সংগ্রাহক কেন্দ্রে বিশেষজ্ঞদের হাতে সে তথ্যকে পৌঁছেও দেবে। সে তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পৃথিবীর এক ক্রমবর্ধমান বিপদ হল এই সাগর দূষণ, সাগর একবার স্থায়ীভাবে দূষিত হয়ে বসলে আমাদের আর করণীয় কিছুই থাকবে না। এ সচেতনতায় আমরা পৃথিবীর সব অঞ্চলের মানুষ এখনো কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে পারি নি, এটাই হল সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার ব্যাপার।

পৃথিবীর জমি

পৃথিবীর শতকরা ২৯ ভাগ জায়গা হল তার জমি। এরমধ্যেও শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ জায়গা মানুষের বসবাসের ও ব্যবহারের অযোগ্য। এজাতীয় অঞ্চলের মধ্যে পড়ে পাহাড়ের দুর্গম এলাকা, গভীর অরণ্য, জলাভূমি, মেরুপ্রদেশের তুষারাবৃত অঞ্চল। যেটুকু জমি আমাদের হাতে রয়েছে, তার সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণের ব্যাপারটা তাই বিশেষভাবেই প্রয়োজনীয়।

পৃথিবীর জমির ওপর প্রতিটি উপাদান—পাহাড়-পর্বত, অরণ্য, মরুভূমি, নদীনালা, মালভূমি, চাষের ক্ষেত, পতিত জমি, গ্রাম-শহর জনপদ এলাকা, মেরুঅঞ্চল—সবই হল সম্পদের মত। এদের সঠিক জরীপকাজের ব্যাপারটাও গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর সম্পদ অনুসন্ধানকারী একদল কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীকে পরিক্রমা করে চলেছে, এক বিচিত্র ব্যাপক কাজের দায়িত্ব যাদের হাতে আমরা অর্পণ করে বসে আছি। এ কৃত্রিম উপগ্রহেরা শুধু তথ্যসংগ্রহক যন্ত্রপাতিসমন্বিত হতে পারে অথবা যন্ত্রপাতির সঙ্গে আরোহীরূপে মানুষও থাকতে পারে ওদের মধ্যে।

যে সব বিষয়ে এরা তথ্যসংগ্রহ করে চলেছে তার মধ্যে রয়েছে মহাকাশের দূরবর্তী অঞ্চল থেকে পৃথিবীর প্রাকৃতিক এবং খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান, পৃথিবীর বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক গঠনের এক বিস্তৃত পরিমণ্ডলব্যাপী জরীপকাজ, সেচের প্রয়োজনে জলের সঞ্চয়ের পর্যবেক্ষণ এবং তার পরিমাপ গ্রহণ, হ্রদ, নদী, খালবিলের এক বিস্তৃত তালিকা তৈরি; নদীনালা হ্রদ এবং খাড়িতে জল দূষণের পরিমাপ গ্রহণ, ভূগর্ভস্থ জল কি পরিমাণে বাইরে বেরিয়ে আসছে তার পরিমাপ এবং পাহাড়ের ওপরে বরফের সঞ্চয় ও তার গলনের পরিমাণ নির্ধারণ, অরণ্যের দাবাগ্নির ওপর খবরদারী এবং শস্যের বৃদ্ধির হার ও তার স্বাস্থ্য এবং কৃষিকাজের উপরোক্ত সময়কে নির্ধারণ।

পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে আগ্নেয় প্রক্রিয়ার ওপর নজর রাখা যাবে, ভূমিকম্পের পূর্বাভাসও সম্ভবপর হবে—পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগের ওপর বসানো অগণিত তথ্যসংগ্রাহক ষ্টেশনের মাধ্যমে জমির আভ্যন্তরীন কোন বিচ্যুতি,

চাপজনিত কোন বিক্রিয়া, আঞ্চলিক চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে সামান্যতম পরিবর্তন পৌঁছে যাবে পরিক্রমারত কৃত্রিম উপগ্রহের সন্ধানী যন্ত্রের কাছে এবং সেখান থেকে পৃথিবীর মূল তথ্যসংগ্রাহক কেন্দ্রে।

পার্বত্য এলাকায় নদীর পরিবাহ অঞ্চলে (ক্যাচমেন্ট এরিয়া) মনে করা যাক প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে, জল নাবছে ঢল দিয়ে নদীর খাত বেয়ে, বন্যার পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে খবরটি পাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভবপর হবে। নদীর জলপ্রবাহের স্ফীতির পরিমাণ থেকে ভবিষ্যতে নদীর সম্ভাব্য গতিপথকেও ছকে ফেলা যাবে এবং আগামী ভবিষ্যতে নদীতে বন্যার প্রকোপ কতটা দেখা দিতে পারে তারও একটা পরিমাপ গ্রহণ করতে পারবেন বিশেষজ্ঞেরা।

ভূতাত্ত্বিক প্রয়োজনে

গবেষণাগারে কোন শিলা বা খনিজকে নিয়ে পরীক্ষামূলক কাজ যেভাবে করা যায়, পৃথিবীর কক্ষপথে পরিক্রমারত কৃত্রিম উপগ্রহের পক্ষে তা সম্ভবপর নয়। ভূপদার্থতাত্ত্বিক সমীক্ষা কাজের জন্যে অভিকর্ষ সম্পর্কীয় (গ্র্যাভিমেট্রিক), চৌম্বকতত্ত্বসম্পর্কীয় (ম্যাগনিটোমেট্রিক), ভূকম্পসম্পর্কীয় (সাইসমিক) এবং বিদ্যুতসম্পর্কীয় প্রচলিত পদ্ধতিগুলোর ব্যবহার জমি থেকে বা উড়ন্ত বিমানের মাধ্যমে চলতেই থাকবে। একটি সীমাবদ্ধ অঞ্চলের মধ্যে এ জাতীয় অনুসন্ধান কাজের কার্যকারিতা আমরা উপলব্ধি করে থাকি। কিন্তু অনেক সময়েই এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ভূতাত্ত্বিক এবং ভূপদার্থতাত্ত্বিক সমীক্ষাকাজের প্রয়োজন দেখা দেয়। ধরা যাক, হিমালয় বা আল্পসের মত একটি সমগ্র পর্বতমালার শিলা-স্তরের নতি, ভাঁজ (ফোল্ড), ফাটল (ফ্র্যাকচার্স্), চ্যুতি, ফল্ট (চাপের প্রভাবে ভূগর্ভে শিলাস্তর যে রেখা বরাবর ভাঙ্গে তাকে বলে ফল্ট) এবং শিলাস্তরের সংযোগক্ষেত্র সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের অনুসন্ধান কাজ আমরা করতে চাইছি, তখন আদর্শ পদ্ধতি হল কৃত্রিম উপগ্রহের আভ্যন্তরীন রিমোট সেনসিং যন্ত্রব্যবস্থাকে কাজে লাগানো।

ভূবিদরা ভূতাত্ত্বিক কৃত্রিম উপগ্রহদের কাছ থেকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তোলা যে ছবিগুলো পান, ওদের সাহায্যে তাঁরা আঞ্চলিক বা এমনকি সম্পূর্ণ মহাদেশ-ভিত্তিক ভূতত্ত্ব সংক্রান্ত নানা ধরণের মানচিত্র রচনা করতে পারেন। মানচিত্রগুলোর সুষ্ঠু ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণের কাজ সম্পূর্ণ হবার পর ভূবিদরা এবারে নির্বাচন করতে পারবেন বিশেষত কোন এলাকাগুলোতে অনুসন্ধানকারী সমীক্ষকদলকে পাঠানো যেতে পারে। এজাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সময় এবং অর্থ দুয়েরই

সাশ্রয় হবে বিপুল পরিমাণে। যে অনুসন্ধানকাজে আগে কয়েক বছর সময় লেগে যেত, তা হয়তো করে ওঠা যাবে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই।

ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্র রচনার কাজে পরিক্রমারত কৃত্রিম উপগ্রহেরা রঙ্গীন আলোকচিত্র গ্রহণ, তাপ-তরঙ্গের এবং রেডার তরঙ্গের মাধ্যমে জরীপকাজ পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে থাকে। জমির তলায় কোথায় রয়েছে খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, বিভিন্ন ধাতুজ এবং খনিজ সম্পদ, ওদের সম্ভাব্য এলাকা-গুলো এজাতীয় মানচিত্রে ধরা পড়ে যায়।

এছাড়াও বড় মাপের জলাধার এবং সেতু তৈরির কাজে ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ জাতীয় গঠনগুলোর স্থায়িত্ব বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক ঘটনার (যেমন ভূমিকম্প) দ্বারা বিশেষভাবেই প্রভাবিত হয়ে থাকে। পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে কৃত্রিম উপগ্রহের সন্ধানী দৃষ্টিতে উদঘাটিত হবে স্থিতিশীলতার অভাবযুক্ত জলনিষিক্ত মৃত্তিকার স্তর, ফস্টযুক্ত অঞ্চল এবং ধ্বংসের প্রবণতাযুক্ত এলাকা। বিশেষজ্ঞদের মতে কোন বড় মাপের গঠনমূলক কাজ এ জাতীয় এলাকায় আদৌ শুরু করাই উচিত নয়।

ভূমিজ সম্পদ সম্পর্কীয় তথ্য সংগ্রাহক কৃত্রিম উপগ্রহেরা ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলের তাপীয় প্রক্রিয়া সম্বন্ধেও তথ্য সংগ্রহ করে চলেছে। এ ব্যাপারে কোন অস্বাভাবিক তথ্য পাওয়ার অর্থ হল পৃথিবীর ত্বকের (ভূপৃষ্ঠের প্রথম স্তর) মধ্যে কোন আলোড়ন ঘটছে—আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগার, ভূমিকম্প বা পর্বতের শিলাদেহে বা ভূপৃষ্ঠে ধ্বসজাতীয় ঘটনার পূর্বাভাস হতে পারে যা। ভূগর্ভে তাপীয় শক্তির উৎসের আবিষ্কারও এ জাতীয় তথ্যের মাধ্যমে ঘটতে পারে।

পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে পাহাড়ের তুষারস্তূপের ক্রমিক গলনপ্রক্রিয়ার ওপর নজর রেখে চললে অনাবিষ্কৃত খনিজ সম্পদের সঞ্চয় উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। পর্বতের শিলা-স্তরের মধ্যে এ জাতীয় খনিজ সঞ্চয় থাকলে জারণের (অক্সিডাইজেসন) ফলে এমন তাপ সাধারণত তৈরি হতে পারে যা কিনা তুষারের গলনপ্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করবে। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন জায়গাতে মনুষ্যবিহীন তাপীয় তথ্য সংগ্রাহক কেন্দ্র বসানো আছে, মাথার ওপর কৃত্রিম উপগ্রহদের সঙ্গে যোগাযোগ সাধিত হলেই যাদের আভ্যন্তরীন যন্ত্রপাতি ওদের হাতে সংগৃহীত তথ্যের বোঝাকে তুলে দিচ্ছে। কৃত্রিম উপগ্রহ মারফত যে তথ্য আবার পৌঁছে যাচ্ছে মূল সংগ্রাহক কেন্দ্রে, যেখানে বিশেষজ্ঞেরা টেপের ওপর ক্রমাগত লিপিবদ্ধ হতে থাকা ঐ তথ্যের বিশ্লেষণ করে চলেছেন। একইভাবে বিশ্লেষিত হয়ে চলেছে পৃথিবী বিজ্ঞান সংক্রান্ত আরো অগণিত তথ্য। উপকৃত হচ্ছে পৃথিবীরই মানুষ।

জলবিদ্যাসংক্রান্ত অনুসন্ধান

পৃথিবীর বোধহয় সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হল মানুষের পানীয় জলের সঞ্চয়। পৃথিবী জুড়ে এত বিপুল পরিমাণ জল রয়েছে অথচ খরার প্রকোপে প্রতি বছর পৃথিবীর শিল্পে অনগ্রসর দেশগুলোর মত আমাদের ভারতেও বিপুল পরিমাণ শস্যহানি ঘটে, অগণিত মানুষের জীবনে নেমে আসে ক্ষুধা এবং বিড়ম্বনা। ১৯৮৭ সালেই আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে খরার প্রকোপের পাশাপাশি দেশের আর এক প্রান্ত জুড়ে চলেছে বন্যার তাণ্ডব। প্রতি বছর খরা এবং বন্যার প্রভাবে এক বিপুল পরিমাণ জাতীয় সম্পদ আমাদের ধ্বংস হচ্ছে, জাতীয় অর্থনীতি হচ্ছে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

খরা, বন্যাজাতীয় পরিস্থিতি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, আঞ্চলিকভাবে জলের বিতরণ ব্যবস্থা ও সেচ ব্যবস্থার সুষ্ঠুভাবে তদারকি, জলসম্পদের সুষ্ঠুভাবে বণ্টন ও ব্যবহার আজও আমরা আয়ত্ত করে উঠতে পারি নি বলেই সমস্যাগুলো দেখা দিচ্ছে। জলবিদ্যাসম্পর্কিত (হাইড্রলজিক) কৃত্রিম উপগ্রহেরা একাজে আমাদের এক উপকারী বন্ধুর ভূমিকা গ্রহণ করতে চলেছে। কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীর জলসম্পদসংক্রান্ত এক বিস্তৃত এবং পূর্ণাঙ্গ তথ্য আমরা সংগ্রহ করতে চলেছি। নদী, হ্রদ এবং জলাধারগুলোতে, তুষার ও বরফের আকারে, এবং ভূগর্ভস্থ জলসঞ্চয়ের এলাকাগুলোতে জলের পরিমাণ এবং গুণগত মান সম্পর্কেও অনেক বেশি পরিমাণে তথ্য এজাতীয় অনুসন্ধান কাজের মাধ্যমে সংগৃহীত হচ্ছে। একটি এলাকায় বছরের বিভিন্ন সময়ে কি পরিমাণ জল পাওয়া যাবে এবং খরা ও বন্যাজাতীয় বিপদের সম্ভাবনাগুলোকেও কিভাবে ঠেকানো যেতে পারে তার অগ্রিম প্রস্তুতি পর্বও গ্রহণ করা যাবে অশনিসংকেতের অনেক আগেই।

খরা ও বন্যা

আমাদের ভারতবর্ষে খরা এবং বন্যা এ দুয়েরই মূলে রয়েছে নির্বিচারে অরণ্যের উৎপাদন। সম্প্রতি কৃত্রিম উপগ্রহদের 'রিমোট সেনসিং' পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা যে ভয়াবহ তথ্যটি লাভ করেছি তা হল—গোটা ভারতবর্ষে অরণ্যের গড়পড়তা আচ্ছাদনের পরিমাণ হল শতকরা মাত্র এগার ভাগ জায়গা জুড়ে যেখানে থাকার কথা শতকরা প্রায় ৩৩ ভাগ অঞ্চল জুড়ে। পার্বত্য অঞ্চলে নির্বিচারে গাছপালা কাটার ফলে মৃত্তিকাবিহীন ন্যাড়া পাহাড়ের শিলাদেহ থেকে চূর্ণীকৃত পলি জমা পড়ছে পাহাড়ে এলাকায় প্রবহমান নদীগর্ভে। সমতল এলাকাতেও একইভাবে বুজে আসছে নদীগর্ভ।

সারা ভারতবর্ষ জুড়ে নদীগর্ভগুলো এভাবে পলি জমে জমে বুজে আসার ফলে বেশি বৃষ্টি হলেই নদীখাত উপচে জল দু-পাশে ছড়িয়ে গিয়ে বন্যার পরিস্থিতিকে ঘনিয়ে তুলছে।

বন্যা পরিস্থিতি ঠেকাতে হলে নদীগুলোর স্বাস্থ্য যেমন রক্ষা করা দরকার, একই সঙ্গে বিভিন্ন শিল্পজাত উচ্ছিষ্টকে নদীগর্ভে নির্বিচারে নিক্ষেপ করে নদীর জল দূষণের ঘটনাকেও ঠেকানো দরকার। কৃত্রিম-উপগ্রহেরা যেমন নদীর জল দূষণের উৎসগুলোকে চিহ্নিত করছে, তেমনি নদীপ্রবাহের মাধ্যমে দূষিত পদার্থের গতিপথগুলোকেও ছকে ফেলছে। নদীর শিল্পজাত উচ্ছিষ্টের মাধ্যমে সাগর দূষণের প্রসঙ্গ নিয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

জলের ওপর খবরদারী

পৃথিবীর সমগ্র জলসম্পদকে বিশেষজ্ঞেরা দেখছেন একটি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ব্যবস্থা হিসেবে। একদল কৃত্রিম উপগ্রহদের সাহায্যে সারা পৃথিবীর আবহাওয়ার ওপর খবরদারী বজায় রাখার ব্যবস্থা যেমন তারা করেছেন, তেমনি ওদেরই আর একদলের মাধ্যমে পৃথিবীর জলসম্পদের ওপর প্রতিনিয়ত নজর রাখা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগও তাঁরা নিয়েছেন।

পৃথিবীর জলসম্পদ সংক্রান্ত তথ্যসংগ্রহকারী কৃত্রিম উপগ্রহদের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞেরা আরো যে সব তথ্য সংগ্রহ করছেন ওদের মধ্যে রয়েছে, পৃথিবী জুড়ে একটি গোটা প্রদেশ বা আঞ্চলিক ভিত্তিতে জলের প্রয়োজনকে নির্ধারণ করা, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, শিল্পায়ন এবং নগরপত্তনের ফলে জলের ব্যবহার আগামী ভবিষ্যতে কিভাবে বাড়তে পারে তার অগ্রিম পরিকল্পনা রচনা, পৃথিবীর নদীনালা, হ্রদ তুষার ও বরফের প্রান্তরে জলের পরিমাণ ও তার মাত্রা এবং জলের জৈব রাসায়নিক চরিত্রের ওপর নজর রাখা, মিঠে জলের এলাকাগুলোয় নোনাজলের অনুপ্রবেশের ঘটনার ওপর খবরদারী বজায় রাখা, নদী ও হ্রদের তীরভূমি এবং সাগরের উপকূলের ভাঙনকে নিয়ন্ত্রণের উপায় নির্ধারণ করা।

বনজ সম্পদ ও কৃষিক্ষেত্রে

পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলোর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা আজ এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দেশগুলোতে শতকরা ৭০ ভাগ মানুষের জীবনে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অপুষ্টি হল নিত্যসঙ্গী। মাঝে মাঝেই কোন একটি অঞ্চলে

দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি ঘনিয়ে ওঠে। সমৃদ্ধ এলাকাগুলো থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে কোনরকমভাবে সে পরিস্থিতিকে ঠেকিয়ে রাখা হয়।

পৃথিবীর বেশির ভাগ খাদ্য এবং তন্তুজ (ফাইবার) উপাদান উৎপন্ন হয় মোট জমির শতকরা মাত্র সাত ভাগ অঞ্চল থেকে, শতকরা তেইশ ভাগ অঞ্চল ব্যবহৃত হয় গরু মোষ জাতীয় প্রাণীদের চারণভূমি ও বনজ সম্পদের জন্যে, বাদবাকি শতকরা সত্তর ভাগ জমি হল পুরোপুরিভাবেই অনাবাদী এবং ব্যবহারের অনুপযোগী। তাই কৃষিকাজের উপযোগী সবটুকু জমি যাতে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহৃত হয় এবং অপরিকল্পিতভাবে ব্যবহারের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তা দেখা দরকার।

কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে ইনফ্রা-রেড বা তাপ তরঙ্গের মাধ্যমে ছবি তোলার যে ব্যবস্থা রয়েছে তার সাহায্যে একটি শস্যক্ষেত বা অরণ্যের মধ্যে সুস্থ এবং অসুস্থ গাছেদের সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে ফেলা যাচ্ছে, গাছে মড়ক লাগার সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় প্রতিকারের ব্যবস্থাও গ্রহণ করা সম্ভবপর হচ্ছে। এমনকি শস্যক্ষেতে বিভিন্ন জাতের সার ও কীটাণুনাশক পদার্থ ব্যবহারের ফলে যে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, অর্থাৎ জমির স্বাস্থ্য উন্নত হচ্ছে না বিপর্যস্ত হচ্ছে, মৃত্তিকার নাইট্রোজেন সংরক্ষণের ক্ষমতা বজায় থাকছে কি থাকছে না তার মূল্যায়নও একই যান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে করা যাচ্ছে। এ জাতীয় সাহায্যের অর্থনৈতিক উপযোগিতা যে কতখানি তা ভারতের মত উন্নতশীল দেশের মানুষ হিসেবে আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি।

একটি প্রশ্ন অবশ্য থেকেই যায়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নত দেশগুলো ওখানকার মানুষের সামাজিক জীবনে কৃত্রিম উপগ্রহদের ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রকে যতটা সম্প্রসারিত করতে পেরেছে, শিল্পে অনগ্রসর অনুন্নত দেশগুলোর অনেকের পক্ষেই তা দীর্ঘকাল আয়ত্তের বাইরেই থেকে যাবে। এ ব্যাপারে উন্নত দেশগুলো থেকে অর্থের বিনিময়ে সংগৃহীত তথ্যের ওপরেই নির্ভর করে তাদের চলতে হবে আরো বেশ কিছুদিন।

২৩

ভারতে মহাকাশ গবেষণা

গত কয়েক বছর ধরে মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের একটি ভূমিকা তৈরি হয়ে চলেছে। চাঁদে মানুষের অবতরণের ঘটনার পাশে এই ভূমিকাকে তত উজ্জ্বল মনে না হলেও এর বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণেই। বর্তমান অধ্যায়ে মহাকাশ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের এই ভূমিকার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা গ্রহণ করবার চেষ্টা করবো।

১৯৬২ সালে সংযুক্ত রাষ্ট্রীয় পরিষদের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরীবিদ্যা-সংক্রান্ত উপসমিতি মহাকাশের শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবহারের জন্যে নিরক্ষীয় এলাকার কোন অঞ্চলে একটি আন্তর্জাতিক সন্ধানী রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করেন। ভারত সরকার অগ্রণী হয়ে ভারতের জমিতে এই জাতীয় একটি পরীক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার আগ্রহ প্রকাশ করেন। ভারতের প্রস্তাব গৃহীত হবার পর ভারতের পারমাণবিক সংস্থার তৎকালীন ডিরেক্টর ডক্টর হোমি ভাবা এবং মহাকাশ গবেষণা কমিটির প্রধান ডক্টর বিক্রম সারাভাইয়ের ওপর এই রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র সংগঠনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তিন মাসের মধ্যে ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে থুম্বা নামে একটি জায়গাকে এই কাজের স্থান হিসেবে নির্বাচনও করা হলো।

থুম্বা থেকে ১৯৬৩ সালের ২১শে নভেম্বর ভারতের প্রথম সন্ধানী রকেট উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল।

থুম্বা

থুম্বা ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে কেরালা রাজ্যের রাজধানী ত্রিভান্দ্রাম শহর থেকে ১৬ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। থুম্বার সবচেয়ে বড় ভৌগোলিক বিশেষত্ব হলো, জায়গাটি রয়েছে পৃথিবীর চৌম্বক বিষুবরেখার ওপর। পৃথিবীর চৌম্বক বিষুবরেখার কাছাকাছি মহাদেশের জমির ওপর থুম্বার মত রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

পৃথিবীর চৌম্বক বিষুবরেখার ওপর কোন জায়গা থেকে বৈজ্ঞানিক

অনুসন্ধানকাজের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কারণ এখানে বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্ব অঞ্চলে, ভূপৃষ্ঠের ওপর ৯০ থেকে ১৩০ কিলোমিটারের মধ্যে একটি ইলেকট্রোজেট বা বিদ্যুৎস্রোতের প্রকৃতি এবং ধর্ম সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানীরা আজও সঠিকভাবে জেনে উঠতে পারেন নি। কিন্তু গোটা পৃথিবীর আবহাওয়া তৈরির পেছনে ঐ বিদ্যুৎস্রোতের যে একটি সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে, তা সহজেই বোঝা যাচ্ছিল।

চৌম্বক বিষুবরেখার কাছে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র পুরোপুরিভাবে অনুভূমিক অবস্থায় রয়েছে। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব আবার ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সবচেয়ে জোরালো এবং দক্ষিণ আমেরিকার ওপর সবচেয়ে দুর্বল। পৃথিবীর চৌম্বক বিষুবরেখার কাছাকাছি নিম্ন অক্ষাংশের অঞ্চলে মহাজাগতিক রশ্মির অত্যন্ত শক্তিশালী কণাসমূহ এসে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে।

এসব কারণের জন্যে, থুম্বার ওপরে কয়েক-শ' কিলোমিটার বিস্তৃত একটি অঞ্চল রয়েছে (এর অবস্থিতি হলো আয়নমণ্ডলের F স্তরের ওপরে), যার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চৌম্বক বিষুবরেখার ওপর কোন জায়গা থেকে আয়নমণ্ডল-সংক্রান্ত গবেষণারও বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

বায়ুমণ্ডলের যে অঞ্চল পৃথিবীপৃষ্ঠের ওপরে ৩০ কিলোমিটার থেকে ২০০ কিলোমিটারের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত, সন্ধানী রকেট হলো তার গবেষণার একমাত্র মাধ্যম। কারণ এই অঞ্চলটি যেমন গবেষণার যন্ত্রপাতিসজ্জিত বেলুনের পরিক্রমা অঞ্চলের ঊর্ধ্বে, তেমনি আবার কৃত্রিম উপগ্রহগুলির পরিক্রমা-পথেরও অনেক নীচে অবস্থিত। এই অঞ্চলের অনুসন্ধানের কাজে থুম্বা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সন্ধানী রকেটের পরিকল্পনা যথেষ্ট ব্যয়বহুল না হবার ফলে ভারতবর্ষের পক্ষে তাকে কাজে রূপ দেওয়াও সম্ভবপর ছিল।

সন্ধানী রকেট

১৯৬৩ সালের ২১শে নভেম্বর থুম্বা কেন্দ্র থেকে ঊর্ধ্বাকাশে প্রথম যে রকেটটি ছোঁড়া হয়, সেটি পাওয়া গিয়েছিল আমেরিকার ন্যাশনাল এয়ারোনটিক্স্ অ্যাণ্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেসন বা ন্যাসা নামে বৈজ্ঞানিক সংস্থার কাছ থেকে। রকেটটি ছিল এক স্তরবিশিষ্ট। ঘণ্টায় এটি প্রায় ৩৫০০ কিলোমিটার বেগ অর্জন করেছিল এবং পৃথিবী থেকে এর সর্বোচ্চ দূরত্ব দাঁড়িয়েছিল প্রায় ১৮০ কিলোমিটার। পৃথিবী থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরত্বে রকেটটির মাথায় বসানো পেলোড-রূপী আধার থেকে ৩০ কিলোগ্রামের মত সোডিয়াম বাষ্প নির্গত করে একটি কৃত্রিম মেঘের সৃষ্টি করা হয়।

সূর্যালোকিত সেই মেঘের চেহারা যে রকম সর্পিল গতি লাভ করেছিল, দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি জায়গা থেকে তার অলোকচিত্র গ্রহণ করে উর্ধ্বাকাশে বায়ুমণ্ডলের গতিবিধি ও তাপমাত্রা সম্বন্ধে বেশ কিছু নতুন তথ্য সংগৃহীত হয়।

থুম্বাতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র ক্রমেই বিস্তৃত হতে থাকে। ফ্রান্স, সোভিয়েট ইউনিয়ন, পশ্চিম জার্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশের বিজ্ঞানীরা এখানে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকাজে অংশগ্রহণ করতে থাকেন।

১৯৬৭ সালের ৩১শে অগাষ্ট থুম্বা থেকে রোহিনী নামে দুটি রকেট ছোঁড়া হয়। এই রকেট দুটির সমগ্র অংশ তৈরি করেছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা—এটিই ছিল ঘটনাটির সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব।

থুম্বা থেকে গত কয়েক বছর ধরে ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৫০ কিলোমিটার উচ্চতায় বায়ুমণ্ডল-সংক্রান্ত গবেষণার জন্যে মেনকা নামে বেশ কিছু আবহাওয়া রকেট পাঠানো হয়েছে। ভারতের মৌসুমী বায়ুর গতিপ্রকৃতি বোঝবার জন্যে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ব্যাপক আবহাওয়া-সংক্রান্ত অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা বিজ্ঞানীরা অনেকদিন ধরেই উপলব্ধি করছিলেন। টাইরস ও নিম্বাস শ্রেণীর আবহাওয়া উপগ্রহগুলির কাছ থেকে স্বয়ংক্রিয় আলোকচিত্র প্রেরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মত ভারত মহাসাগরীয় এলাকারও বহু ছবি (প্রতিটি প্রায় ১০ লক্ষ কিলোমিটারব্যাপী অঞ্চল জুড়ে) বোম্বাইয়ের কোলাবাতে আবহাওয়া কেন্দ্রের হাতে এসে পৌঁছত। এই সব ছবির মাধ্যমে ভারত মহাসাগরে নিরক্ষীয় অঞ্চলের ওপরে জুলাই মাসেও সবচেয়ে ঘন দুটি মেঘের স্তরের অস্তিত্ব ধরা পড়ে, যে দুটি স্তরের মাঝে আবার স্বল্প ঘন একটি মেঘের স্তরও ছিল। ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর অনুসন্ধানের কাজে একে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যরূপে গণ্য করা হচ্ছে।

থুম্বা বর্তমানে একটি আন্তর্জাতিক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছে। থুম্বার বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যে শান্তিপূর্ণ কাজে মহাকাশ গবেষণার সহযোগিতার উদ্দেশ্যে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৬৮ সালের গোড়ার দিকে থুম্বা কেন্দ্রটিকে রাষ্ট্রসংঘের হাতে অর্পণ করেন।

১৯৬৯ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী থুম্বাতে সেণ্টর নামে একটি রকেটের পরীক্ষার কাজ সাফল্যমণ্ডিত হয়। ফ্রান্সের সঙ্গে সহযোগিতায় ভারতীয় বিজ্ঞানী ও পূর্তবিদেরা দুই স্তরবিশিষ্ট এই রকেটটিকে এদেশেই তৈরি করেন। ফ্রান্সেরই সাহায্যে সেণ্টর রকেটের জন্যে প্রয়োজনীয় কঠিন জ্বালানী তৈরির একটি কারখানাও থুম্বাতে চালু করা হয়েছিল, যেখানে পরবর্তীকালে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় মালমশলার সাহায্যে জ্বালানী তৈরির ব্যবস্থাকে গড়ে তোলা হয়।

থুম্বা মহাকাশ কেন্দ্র থেকে এপর্যন্ত দু'শরও বেশী সন্ধানী রকেট মহাকাশে পাঠানো হয়েছে এবং ভারতে তৈরী ৮০টিরও বেশী রকেটকে সাফল্যের সঙ্গে ছোঁড়া হয়েছে। রকেট প্রকল্পের মাধ্যমে ভারতের মহাকাশ গবেষণার বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যকে প্রধানতঃ চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ, ঊর্ধ্বাকাশের অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে আয়নমণ্ডলের তড়িতাবিষ্ট কণিকা বা আয়ন এবং তড়িত-নিরপেক্ষ কণিকা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা। দ্বিতীয়তঃ, ভূ-চৌম্বক নিরক্ষরেখার ওপর যে বিদ্যুৎস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে, তার সঙ্গে যুক্ত চৌম্বক ও বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র সম্বন্ধে গবেষণার কাজ পরিচালনা এবং সৌরদেহের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেগুলি কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, তা পর্যবেক্ষণ করা। তৃতীয়তঃ, বায়ুমণ্ডলের ওপরের দুটি স্তর—স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার ও মেসোস্ফিয়ার অঞ্চলে আবহবিদ্যা-সংক্রান্ত গবেষণা এবং চতুর্থতঃ, জ্যোতির্বিদ্যার কয়েকটি ক্ষেত্র, বিশেষ করে দূরবর্তী নক্ষত্রলোক থেকে কি পরিমাণে রশ্মি বিকিরিত হচ্ছে, তার পরিমাপ সংগ্রহ করা।

থুম্বা থেকে রকেট ক্ষেপণের মাধ্যমে নিরক্ষীয় অঞ্চলের ওপরে বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরের গঠনপ্রকৃতি ও গতিবিদ্যা-সংক্রান্ত বহু তথ্য লাভ করা সম্ভব হয়েছে। রকেটের মাথায় বসানো বৈজ্ঞানিক আধার থেকে বাষ্পের মেঘ ছড়িয়ে দিয়ে ভূপৃষ্ঠের ওপরে ৩০ থেকে ৬০ কিলোমিটারের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বায়ুর বেগ মাপা হয়েছে। আবার বায়ুমণ্ডলের মেসোস্ফিয়ার অঞ্চলে ঐ আধার থেকে লক্ষ লক্ষ তামার টুকরো ছড়িয়ে দিয়ে রেডারের সাহায্যে ঐ টুক্‌রোগুলির গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রেখে সেখানে বায়ুর গতি এবং দিক নির্ণয় করাও সম্ভবপর হয়েছে।

ভারতীয় বিজ্ঞানীরা আয়নমণ্ডলের বৈদ্যুতিক প্রকৃতি ও গঠনসংক্রান্ত গবেষণার জন্যে রকেটের মাথায় চাপিয়ে ইলেকট্রন প্রোব, প্লাজমা নয়েজ প্রোব, আলট্রা-ভায়োলেট ডিটেকটর এবং আয়ন মাস-স্পেকট্রোমিটার জাতীয় যন্ত্র পাঠিয়েছেন।

ভূ-চৌম্বক নিরক্ষরেখার ওপর বিদ্যুৎস্রোতের গঠন, বিস্তৃতি এবং গতিবিধি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রকেটের মধ্যে প্রোটন প্রিসেশন ম্যাগনিটোমিটার নামক যন্ত্র পাঠানো হয়েছে। জানা গেছে, থুম্বার ১০৫ কিলোমিটার ওপরে এই বিদ্যুৎস্রোতের সর্বোচ্চ তীব্রতা হলো প্রতি বর্গ কিলোমিটার ক্ষেত্রে ৫০০ অ্যাম্পিয়ারের মত।

নৈনিতালে অবস্থিত উত্তর প্রদেশের রাষ্ট্রীয় মানমন্দির, অ্যামেরিকার স্মিথসোনিয়ান জ্যোতির্পদার্থবৈজ্ঞানিক মানমন্দিরের সহযোগিতায় বেশ কয়েকবছর

ধরে আলোকরশ্মির সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহগুলির গতিপথ পর্যবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত রয়েছে। এই জাতীয় কাজ করা হচ্ছে পৃথিবীর আরো এগারটি কেন্দ্র থেকে। নৈনিতাল এবং অন্যান্য কেন্দ্রের সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে পৃথিবীর অভিকর্ষ ক্ষেত্র এবং তার চেহারার সঠিক জ্যামিতিক পরিমাপ (জিওডেসি নামে বিজ্ঞানশাস্ত্রের যা বিষয়বস্তু) নির্ধারণ করা এবং পৃথিবীর কেন্দ্রের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ স্থানগুলির স্থানাঙ্ক (কো-অর্ডিনেট্স্) প্রায় নির্ভুলভাবে ১৫ মিটারেরও কম বিচ্যুতির সঙ্গে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছিল। এভাবে সংগৃহীত আরো কয়েকটি তথ্য থেকে জানা গিয়েছিল যে, ত্রিভান্দ্রামের কাছে সমুদ্রপৃষ্ঠ সিঙ্গাপুরের নিকটবর্তী সমুদ্রপৃষ্ঠের তুলনায় পৃথিবীর কেন্দ্রের ৯০ মিটার কাছে রয়েছে এবং ডোভারের কাছাকাছি ইংলিশ চ্যানেলের সমুদ্রপৃষ্ঠের তুলনায় এই নৈকট্যের পরিমাণ ১৪০ মিটারের মত।

১৯৬২ সালে মহাকাশে রঞ্জন-রশ্মি নির্গমনকারী নক্ষত্রের আবিষ্কার জ্যোতির্বিদ্যার জগতে এক নতুন গবেষণাক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। এই জাতীয় বহু নক্ষত্র থেকেই কোন আলোক বা রেডিও-তরঙ্গ নির্গত হতে দেখা যায় না। ১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাসে আমেদাবাদের ফিজিকাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি এবং টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ স্পেস অ্যাণ্ড এয়ারোনটিকাল সায়েন্স, রঞ্জন-রশ্মি জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে একটি যুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করে। SCO-X-1, সেন্টরাস-X-2 এবং টাউ-X-1 প্রভৃতি নক্ষত্র থেকে নির্গত রঞ্জন-রশ্মির পরিমাণ ও শক্তির মাত্রা নিরূপণের জন্যে ঐ দুই বিজ্ঞান সংস্থা যৌথভাবে রকেট উৎক্ষেপণ করেন। দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশের একটি সাধারণ পর্যবেক্ষণ বা জরীপের কাজ করাও ঐ পরীক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। SCO-X-1 নক্ষত্রটি থেকে নির্গত আলোক ও রঞ্জন-রশ্মির মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক আবিষ্কার করবার জন্যে একই সঙ্গে ভারতের কোদাইকানাল মানমন্দির ও টোকিওর জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক মানমন্দির থেকে নজর রাখা হয়। মাঝে মাঝেই সন্ধানী রকেট উৎক্ষেপণের দ্বারা ঐ নক্ষত্রটি থেকে রঞ্জন-রশ্মির নির্গমনের পরিমাণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গীত রেখে কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, তার ওপরও নজর রাখা হয়।

আগামী দিনের পরিকল্পনা

থুম্বা কেন্দ্রে আট বছরের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পরবর্তী দশকের জন্যে ভারতের মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে এক বিস্তৃত কর্মসূচী গ্রহণ করা

হয়েছিল। এই কর্মসূচীর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল, মহাকাশ গবেষণার জন্যে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তৈরির ব্যাপারে যতদূর সম্ভব স্বাবলম্বিতা অর্জন করা।

থুম্বা একটি জনবহুল এলাকায় অবস্থিত এবং থুম্বা থেকে কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা যাবে একমাত্র পশ্চিম দিকেই। ফলে পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূবে আপন অক্ষের ওপর ঘণ্টায় যে ১৭৬০ কিলোমিটার বেগে ঘুরে চলেছে, সেটি আর কৃত্রিম উপগ্রহের বাহক রকেটের দেহে যুক্ত হবে না। এই অসুবিধাগুলির কথা ভেবে ভারতের পূর্ব উপকূলে অন্ধ্র প্রদেশে শ্রীহরিকোটার কাছে একটি দ্বীপে আর একটি রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। এখান থেকে রকেটগুলিকে ছোঁড়া হবে পূব দিকে, ফলে পৃথিবীর ঘণ্টায় ১৭৬০ কিলোমিটাররূপী বেগ আপনা-আপনি ওদের দেহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে।

পরবর্তী দশকের ভারতীয় মহাকাশ কার্যক্রমের আর একটি কাজ ছিলো—সন্ধানী রকেটের সাহায্যে ভারতের মৌসুমী বায়ুর গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে আরো উন্নত করা এবং মাঝারি ধরণের আবহাওয়ার পূর্বাভাষকে আরো নিখুঁত করা। এর ফলে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিও যথেষ্ট পরিমাণে উপকৃত হবে, যেহেতু বৃষ্টির ওপর আমাদের কৃষিকাজের এক বিরাট অংশকে এখনো নির্ভর করতে হয়।

থুম্বা কেন্দ্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিরক্ষীয় অঞ্চলে, বিশেষ করে ভারত মহাসাগরীয় এলাকায় আবহবিদ্যা বিষয়ে আমাদের পূর্বেকার ধারণা ইতিমধ্যেই অনেক বেশী সম্পূর্ণতা লাভ করেছে।

ত্রিভান্দ্রামে কৃত্রিম উপগ্রহগুলির গতিপথ পর্যবেক্ষণকারী একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। ঐ কেন্দ্রের সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গার স্থানাঙ্ক পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে।

সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে আমেরিকার ন্যাসা-র সঙ্গে ভারতের একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী স্থিরীকৃত হয় আমেরিকা ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি নাগাদ ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ওপর ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩৫৯০০ কিলোমিটার দূরে বৃত্তাকার কক্ষপথে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ প্রতিষ্ঠা করবে এবং দু-বছরের জন্যে ওর ব্যবহারের সম্পূর্ণ সুযোগ ভারতের হাতে তুলে দেবে। সমগ্র ভারতভূমি থেকে কৃত্রিম উপগ্রহটিকে সব সময়েই মাথার ওপরে একই জায়গায় স্থিরভাবে অবস্থান করতে দেখা যাবে।

উপগ্রহটির দৃশ্যগোচর এলাকার যে কোন দুটি অঞ্চল এই সিনক্রোনাস বা ভু-সমলয় কক্ষপথে অবস্থিত কৃত্রিম উপগ্রহটির মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে অতি নিখুঁত

রেডিও ও টেলিভিসন যোগাযোগ ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে পারবে। টেলিভিসন অনুষ্ঠানকে বহু দূরবর্তী কোন স্থানে পৌঁছে দেবার জন্যে যে একাধিক রিলে স্টেশনের প্রয়োজন হয়, এক্ষেত্রে সে ছাড়াই কাজ চলবে। আমেদাবাদে কৃত্রিম উপগ্রহের সঙ্গে পরীক্ষামূলকভাবে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে যে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তা আলোচ্য কৃত্রিম উপগ্রহটির কাছে ভারতের টেলিভিসন অনুষ্ঠানকে পৌঁছে দেবে।

ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ

ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটি ছিল ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের যুক্ত বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার একটি মহৎ দৃষ্টান্ত। মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ের কয়েকটি পদক্ষেপের পর স্বভাবতই ভারতীয় বিজ্ঞানীরা চাইছিলেন কৃত্রিম উপগ্রহ প্রতিষ্ঠায় অগ্রনী হতে। নিজস্ব বাহক রকেট ব্যবস্থা তখনো পর্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নি।

প্রখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাই ছিলেন শান্তিপূর্ণভাবে মহাকাশ গবেষণায় ভারত সোভিয়েট যুক্ত সহযোগিতার পথিকৃৎ। এই সহযোগিতার বাস্তব রূপায়ণ তিনি দেখে যেতে পারেন নি ; ১৯৭১ সালে তাঁর অকালবিয়োগ ঘটে। সারাভাইর মৃত্যুর পর কিছুদিন অধ্যাপক এম. জি কে. মেনন, তারপর ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে অধ্যাপক সতীশ ধাওয়ান ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থার (ইসরো) চেয়ারম্যান রূপে কাজ করে চলেছেন।

১৯৭২ সালের মে মাসে মস্কোতে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞান পরিষদ এবং ইসরোর মধ্যে এক চুক্তি সাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুসারে স্থির হয় ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়ন যুক্তভাবে ভারতে পরিকল্পিত ও তৈরি একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশে পাঠাবে। কৃত্রিম উপগ্রহটি সোভিয়েট ইউনিয়নের একটি এলাকা থেকে একটি সোভিয়েট বাহক রকেটের ঘাড়ে চেপে মহাকাশে পাড়ি জমাবে।

কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পাঠানো তথ্য সংগ্রহের জন্যে ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নে তথ্য সংগ্রাহক কেন্দ্র স্থাপিত হবে। দুই দেশ তাদের ওপর অর্পিত কাজের দায়িত্ব পালনের জন্যে যে ব্যয়, তা নিজেরাই বহন করবেন।

প্রযুক্তিগত পরামর্শ ও সহযোগিতা ছাড়াও সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের জন্যে কয়েকটি প্রয়োজনীয় যন্ত্রব্যবস্থাকে সরবরাহ করে। এদের মধ্যে ছিল বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে সিলিকন ধাতুর তৈরি সৌর প্যানেল, বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চয়ের জন্যে নিকেল-ক্যাডমিয়ামের ব্যাটারী, সংগৃহীত বৈজ্ঞানিক

তথ্যের রেকর্ডি এবং সংরক্ষণের জন্যে বিশেষভাবে তৈরি টেপ রেকর্ডার এবং পৃথিবী পরিক্রমাকালীন অবস্থায় কৃত্রিম উপগ্রহের আপন অক্ষের ওপর আবর্তনকে (স্পিন-আপ সিস্টেম) স্থিতিশীল করার ব্যবস্থা।

আর্যভট্ট

১৯৭৫ সালের ১৯শে এপ্রিল সোভিয়েট ইউনিয়নের একটি মহাকাশবন্দর থেকে একটি সোভিয়েট বাহক রকেটের ঘাড়ে চেপে ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ আর্যভট্ট মহাকাশে পাড়ি জমায়। সপ্তম শতাব্দীর প্রখ্যাত ভারতীয় জ্যোতির্বিদ ও অঙ্কশাস্ত্রবিদ আর্যভট্টের নামানুসারে ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটির নামকরণ করা হয়েছিল। পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগ থেকে ওর সর্বোচ্চ (অ্যাপোগি) ও সর্বনিম্ন (পেরিগি) দূরত্ব ছিল যথাক্রমে ৬২৩ ও ৪৫৬ কিলোমিটার।

আর্যভট্টের ওজন ছিল ৩৬০ কিলোগ্রামের মত। এই কৃত্রিম উপগ্রহটিকে সম্পূর্ণভাবে তৈরি করা এবং এর আভ্যন্তরীন যন্ত্রপাতি কি ধরণের বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম পালন করবে, তার সমগ্র পরিকল্পনার রচয়িতা ছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা। ব্যাঙ্গালোরের পিনিয়াতে ইসরোর গবেষণাকেন্দ্রে ২৬ মাস ধরে কৃত্রিম উপগ্রহটি তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয় এবং এটি তৈরি করতে খরচ পড়ে পাঁচ কোটি টাকার মত।

সোলার প্যানেলের ওপর বসানো ছিল ১৮০০ সিলিকন ধাতুর তৈরি সোলার সেল, যারা সরাসরি সৌরশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে প্রায় ৪৫ ওয়াটের মত শক্তির যোগান দিচ্ছিল। ১২০০০-এর ওপর ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ এবং বহুবিধ যন্ত্রপাতিকে চালু রাখার জন্যে দরকার ছিল এই বিদ্যুৎশক্তির। ৯০ মিনিটে পৃথিবীকে একবার পরিক্রমাকালীন অবস্থায় আর্যভট্ট যখনই পৃথিবীর ছায়া অঞ্চলে প্রবেশ করছিল তখন বিদ্যুৎশক্তি যোগান দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করছিল নিকেল-ক্যাডমিয়ামে তৈরি ব্যাটারীগুলো।

পৃথিবী থেকে আর্যভট্টের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে মাদ্রাজ থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার উত্তরে শ্রীহরিকোটা নামে একটি দ্বীপে অবস্থিত তথ্য সংগ্রাহক কেন্দ্রটি বিশেষ ভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। আর দুটি তথ্য সংগ্রাহক কেন্দ্র ছিল যথাক্রমে ভারতের ব্যাঙ্গালোরে ও সোভিয়েট ইউনিয়নে।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা

আর্যভট্টের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্র ছিল প্রধানত তিনটি ক্ষেত্র জুড়ে। ওরা হল—এক্স রে জ্যোতির্বিদ্যা, সৌর পদার্থবিদ্যা এবং আয়নমণ্ডলীয়

বিজ্ঞান। সূর্যদেহ থেকে এবং মহাকাশের অন্যান্য নক্ষত্র ও তারাজগত থেকে অত্যন্ত জোরালো মাপের এক্স-রে বা রঞ্জন রশ্মি পৃথিবীর কাছাকাছি এসে পৌঁছচ্ছে। তেমনি সূর্য থেকেও পৃথিবীর দিকে নেমে আসে শক্তিশালী গামা রশ্মি ও নিউট্রন কণিকাস্রোত। শান্ত সূর্যের পর্যায়ে সূর্যদেহের ক্রিয়াপ্রক্রিয়া থাকে নিম্নতম মানে, আবার অশান্ত পর্যায়ে তা বেড়ে গিয়ে এক ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। সৌর পদার্থবিদ্যা পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল এই, দুই পর্যায়ে নিউট্রন কণিকাদের নির্গমনের পরিমাণ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা।

পৃথিবীতে এই সব রশ্মি ও কণিকাদের প্রবেশপথে বায়ুমণ্ডল হল এক মস্ত বাধা। তাই বায়ুমণ্ডলের বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত এদের সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের কোন উপায় নেই। কৃত্রিম উপগ্রহেরা হল একাজে আদর্শ মাধ্যম।

আর্যভট্টের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা মহাকাশে পাড়ি জমাবার পর মাত্র এক সপ্তাহের মত চালু ছিল। এছাড়া অন্যান্য আভ্যন্তরীন তথ্যসংগ্রাহক ব্যবস্থা ১৯৮১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ করে এবং তারপর ওদের বন্ধ করে দেয়া হয়।

সাইট

কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে এবং টেলিভিসনের সাহায্যে শিক্ষামূলক পরীক্ষার (স্যাটেলাইট ইন্‌স্ট্রাকসনাল টেলিভিসন এক্‌স্পেরিমেন্ট বা সাইট) একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন ভারতীয় বিশেষজ্ঞেরা। পরীক্ষাটি শুরু হয়েছিল ১৯৭৫ সালের পয়লা অগাষ্ট তারিখে এবং ঠিক এক বছর তা চালু ছিল।

আমেরিকার কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে পাওয়া ATS-৬ 'নামে একটি সিনক্রোনাম বা ভূ-সমলয় কৃত্রিম উপগ্রহের (পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩৫৯০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত) সাহায্যে এই শিক্ষামূলক প্রকল্পটি বাস্তবে রূপ দেয়া হয়। ভারতের ছটি প্রদেশে বিশেষভাবে নির্বাচিত ২৪০০ গ্রামে প্রতিদিন শিক্ষা-মূলক টেলিভিসন অনুষ্ঠান পাঠানো হত। সমগ্র পরিকল্পনাটির মাধ্যমে দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল—প্রথমত, গ্রামাঞ্চলে টেলিভিসন গ্রাহক যন্ত্র ব্যাপকভাবে স্থাপন করা এবং তার প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনা সম্ভবপর এবং দ্বিতীয়ত, অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা, উপস্থাপনা এবং পরবর্তীকালে জনমানসে তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে অবমূল্যায়নগত সমীক্ষা সংগঠিত করা যায়।

সাইট পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রমাণিত হল, মহাকাশে বেতার ও টেলিভিসন যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন রূপায়িত করা সম্ভবপর এবং কৃষি, জনস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা জাতীয়

বিষয় সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষাকেও প্রচার করা যেতে পারে।

সাইট প্রকল্পকে পরবর্তীকালে ইনস্যাট পর্যায়ের টেলিভিসন অনুষ্ঠানের পূর্বসুরীরূপে অভিহিত করা যেতে পারে।

ভাস্কর-১

সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় মহাকাশে ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ আর্যভট্টকে পাঠানোর পরীক্ষায় কৃতকার্য হবার পর ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানীরা এবারে আরো গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্মসূচী গ্রহণের উদ্যোগ নিলেন। দ্বিতীয় একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে এবারে তারা মহাকাশে পাঠাবেন যার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যাবে, যাদের অর্থনৈতিক উপযোগিতা রয়েছে। তথ্য সংগ্রহ করা হবে জলবিদ্যুৎ অরণ্যসম্পদ, সমুদ্রবিদ্যা এবং আবহবিদ্যার ক্ষেত্র জুড়ে "রিমোট সেন্সিং" (এ হল এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে একটি বস্তুর সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত না হয়েও দূর থেকে তার প্রকৃতিকে নিরূপণ করা যায়) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এবারের পরিকল্পনাও সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের সহযোগিতার ভিত্তিতেই রচিত হল।

১৯৭৯ সালের ৭ই জুন সোভিয়েট ইউনিয়নের একটি মহাকাশবন্দর থেকে একটি সোভিয়েট মহাজাগতিক রকেটের সাহায্যে দ্বিতীয় ভারতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ ভাস্কর-১ মহাকাশে পাড়ি জমাল। প্রাচীন ভারতের আর একজন শ্রেষ্ঠ অংকশাস্ত্রবিদ ভাস্করাচার্যের নাম অনুসারে এই নামকরণ। উপগ্রহটির ওজন ছিল ৪৪৪ কিলোগ্রাম এবং পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগ থেকে ওর কক্ষপথের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দূরত্ব ছিল যথাক্রমে ৫৩৭ ও ৫১২ কিলোমিটার ; কক্ষপথের চেহারা ছিল প্রায় বৃত্তাকার।

ভাস্কর—১ হল ভারতের সম্পদ অনুসন্ধানকারী পরীক্ষামূলক প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ। ইনফ্রারেড (অবলোহিত বা তাপ তরঙ্গে স্পর্শকাতর) ক্যামেরায় সজ্জিত ছিল ভাস্কর। দিনে রাতে পৃথিবীর জমি ও সাগরের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে তাপমাত্রার সামান্যতম পার্থক্যও এই ক্যামেরায় ধরা পড়বে। সাগরের উপকূলভাগে কোথাও তপ্ত জলপ্রবাহের সন্ধান পেলে বুঝতে হবে কোন বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদক কেন্দ্র থেকে ছাড়া হচ্ছে। উপকূলভাগে ঠাণ্ডা জলপ্রবাহের সন্ধান পেলে অনুমান করা যেতে পারে ভূগর্ভের কোন অঞ্চল থেকে জলস্রোত বেরিয়ে এসে সাগরে জমা পড়ছে।

অবলোহিত আলোয় সনাক্তকরণ

কৃত্রিম উপগ্রহের ইনফ্রারেড ক্যামেরায় ছবি তোলার জন্যে বিশেষ ধরণের রঙ্গীন ফিল্ম ব্যবহার করা হয়। এ জাতীয় ছবিতে সাধারণ সবুজ রং ধরা পড়ে নীল রং হিসেবে এবং অবলোহিতের কাছাকাছি আলোকে দেখায় লাল রঙের মত ; কৃষির প্রয়োজনে রংয়ের মাধ্যমে এ জাতীয় পরিচিতির ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বিশেষভাবেই। একটি ধানক্ষেতে ধানগাছে ক্লোরোফিলের ঘাটতি ধরা পড়ে যাবে ইনফ্রারেড ছবিতে—জল ও উপযুক্ত পরিমাণ সারের অভাবে অথবা পোকার আক্রমণে যা ঘটতে পারে। এজাতীয় তথ্য অনেক ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে কৃষককে রক্ষা করবে।

ভাস্করের ক্যামেরায় ইনফ্রারেড আলোতে কেরালার নারকেল চাষের ছবি তোলা হয়েছিল। একটি চাষের ক্ষেতে নারকেল গাছেদের মাথা থেকে সুস্থ গাছেদের মাথার তুলনায় অবলোহিত আলোর প্রতিফলনের পরিমাণ দেখা গেল তুলনামূলক-ভাবে অনেক কম। এক ধরণের পোকার আক্রমণ ঘটেছে গাছগুলোতে। আসন্ন ব্যাধির প্রকোপ চোখে দেখে বোঝার আগেই মহাকাশ থেকে ক্যামেরার অবলোহিত ছবিতে ধরা পড়ে গেল। ইলেকট্রন মাইক্রসকোপ যন্ত্রে আক্রান্ত গাছেদের পাতার নমুনা পরীক্ষা করে দেখা গেল রোগের বীজাণুর সংক্রমণ সত্যিই ঘটেছে।

অবলোহিত আলোয় ছবি তোলার মাধ্যমে আরো যে সব ক্ষেত্র উপকৃত হবে, ওরা হল—কৃষি ও অরণ্য, তুষারের স্তরের গভীরতা ও বরফের পরিমাণকে পরিমাপ করা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলসঞ্চয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, ভূগর্ভ থেকে জলপ্রবাহ কোথায় বেরিয়ে আসছে তা নির্ণয় করা, সামুদ্রিক স্রোত ও বায়ুর তীব্রতা নির্ধারণ, সামুদ্রিক ঝড়ের পূর্বাভাস জ্ঞাপন, সাগরে মাছেদের খাদ্য প্ল্যাংকটনদের পরিমাণ নির্ধারণ, জলের দূষণের ওপর নজর রাখা, পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগ যে প্লেটেদের সমবায়ে গড়ে উঠেছে ওদের নড়াচড়ার ওপর নজর রাখা, খনিজ সম্পদের উৎস এবং যে ধরণের শিলাস্তরের মধ্যে ওদের অস্তিত্ব সম্ভবপর তা নির্ণয় করা, ভূগর্ভস্থ তাপীয় উৎসদের মানচিত্র তৈরি করা, পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগের বিভিন্ন অঞ্চল, নদী ও হ্রদেদের মানচিত্র নির্মাণ জাতীয় ক্ষেত্রে।

ভারতীয় বিজ্ঞানীরা চেয়েছিলেন ভারতের দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ ভাস্কর পৃথিবী পর্যবেক্ষণের সময় বিভিন্ন পরীক্ষামূলক কাজের মধ্য দিয়ে দেশের নানা অর্থনৈতিক উপযোগিতার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করুক। আমেদাবাদে অবস্থিত ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থার (ইসরো) 'স্পেস অ্যাপলিকেসন সেণ্টারের বিশেষজ্ঞেরা পরিকল্পনাভিত্তিক কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় সচেতক ব্যবস্থা

ভাস্করের মধ্যে স্থাপন করেছিলেন। এদের মধ্যে ছিল ইনফ্রারেড স্ক্যানার (বিশ্লেষক), মালটিস্পেকট্রাল (একাধিক বর্ণালীবিষয়ক) স্কানার এবং মাইক্রোওয়েভ রেডিওমিটার।

আর্যভট্টের মত ভাস্করের জন্যেও সোভিয়েট বিশেষজ্ঞেরা যে ব্যবস্থাগুলো যুগিয়েছিলেন ওদের মধ্যে ছিল কৃত্রিম উপগ্রহের আপন অক্ষের ওপর আবর্তন-সংক্রান্ত ব্যবস্থা (স্পিন-আপ সিস্টেম), তথ্যরূপী স্মৃতিসংরক্ষক ব্যবস্থা, নিকেল-ক্যাডমিয়াম ব্যাটারী। স্পিন-আপ ব্যবস্থার মধ্যে ছিল ছটি নাইট্রোজেন গ্যাসপূর্ণ বোতল ; ভারতে অবস্থিত নিয়ন্ত্রক কেন্দ্র থেকে প্রেরিত বেতার সংকেতের খোঁচায় বোতল থেকে গ্যাস বেরিয়ে এসে কৃত্রিম উপগ্রহের আপন অক্ষের ওপর আবর্তনের বেগ (মিনিটে ৬ থেকে ১১) নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে বজায় রাখবে এবং আবর্তনের অক্ষকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে যাতে ভাস্করের ক্যামেরাগুলোর মুখ ঠিক পৃথিবীর দিকেই ফেরানো থাকে।

আরব্ধ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য সফল হবার পর ভাস্কর-১এর আভ্যন্তরীণ তথ্য ও চিত্রসংগ্রাহক যন্ত্রপাতি ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে বন্ধ করে দেয়া হয়।

ভাস্কর-২

১৯৮১ সালের ২০শে নভেম্বর ভাস্কর-১-এর তুলনায় কিছুটা উন্নত পর্যায়ের কৃত্রিম উপগ্রহ ভাস্কর-২কে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় সোভিয়েট বাহক রকেটের সাহায্যে মহাকাশে পাঠান। উপগ্রহটির ওজন ছিল ৪৩৬ কিলোগ্রাম এবং পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগ থেকে ৫২৫ কিলোমিটার দূরে এক প্রায় বৃত্তাকার কক্ষপথে একে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

দুটি ভাস্কর কৃত্রিম উপগ্রহের সংগৃহীত তথ্যকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের কাজে বিস্তৃতভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। মাইক্রোওয়েভ রেডিওমিটার যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন বস্তুর তাপমাত্রাজনিত উজ্জ্বলতাকে পরিমাপ করে সাগরের পৃষ্ঠভাগের ওপর বায়ুস্রোত, সামুদ্রিক ঝড় এবং নিম্নচাপ কেন্দ্রের গতিবিধি, মৌসুমী বায়ুর আগমন এবং মৃত্তিকার আর্দ্রতা সংক্রান্ত বহু প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়েছে। ভারতের বনজ সম্পদ, জলজ সম্পদ, বড় মাপের জলাশয় এবং জমির ওপর পাহাড়-পর্বত জাতীয় গঠন এবং সাগরের উপকূলভাগে তরঙ্গের সংঘাতজনিত ক্রিয়াপ্রক্রিয়া বিষয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেছে। হিমালয় পর্বতের ওপর জমাটবাঁধা তুষারের স্তরের পরিবর্তন-শীলতার পরিমাপ থেকে তুষারগলা জলে পুষ্ট নদীখাত বেয়ে কি পরিমাণ জল নামবে সে সম্বন্ধে ধারণা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। ভারতের পশ্চিম উপকূলে

কাম্বে এলাকায় এবং পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলের উপকূল এলাকা থেকে অবলোহিত আলোতে তোলা ছবিগুলোর বিশ্লেষণ থেকে বোঝা গেছে কি পরিমাণ পলি সাগরের ঐ উপকূল এলাকাগুলোতে জমা পড়ছে। এজাতীয় আরো নানাদি সংগৃহীত তথ্যকে আমাদের জাতীয় জীবনে নানাভাবে কাজে লাগানো হয়েছে এবং আগামী ভবিষ্যতেও হতে থাকবে।

ষ্টেপ

১৯৭৭ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত দু বছর ধরে ইসরোর বিশেষজ্ঞেরা ফ্রেঞ্চ-জার্মান ভূ-সমলয় (জিওষ্টেশনারী) কৃত্রিম উপগ্রহ (পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ৩৫,৯০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত) সিম্ফনির সাহায্যে একটি কার্যক্রম শুরু করেন। এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল ঐ উপগ্রহের সাহায্যে ভারতের অভ্যন্তরে টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থাকে চালু করা। ভবিষ্যতে একই কাজের জন্যে ভারতের নিজস্ব উপগ্রহ প্রতিষ্ঠা করার আগে প্রযুক্তিবিদ্যাগত যে সমস্যাগুলো রয়েছে সেগুলোর সমাধান সম্বন্ধে সঠিক ধারণা অর্জন করাও ছিল এব্যাপারে একটি বড় উদ্দেশ্য। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং সাজসরঞ্জামকে তৈরির জন্যে ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের সামর্থ্য এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের একটি ছোটখাট মহড়া এই কর্মসূচীর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হল বলা যায়।

অ্যাপ্‌ল্

বেতার ও টেলিভিসন যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্যে প্রয়োজনীয় একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে প্রতিষ্ঠার জন্যে যে প্রযুক্তিবিদ্যার আশ্রয় নিতে হবে তার প্রশিক্ষণের মহড়ারূপী কর্মসূচী ছিল অ্যাপ্‌ল্ (এরিয়ানে প্যাসেঞ্জার পেলোড এক্স্পেরিমেণ্ট)। অ্যাপ্‌ল্ ছিল ভারতীয় বিজ্ঞানীদের পরিকল্পনায় তৈরি একটি বেতার-টেলিভিসন সংযোজক ভূ-সমলয় কৃত্রিম উপগ্রহ, ১৯৮১ সালের ১৯শে জুন ইয়োরোপীয় মহাকাশ সংস্থা যাকে একটি রকেট ব্যবস্থার মাধ্যমে মহাকাশে পাঠান। ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত অ্যাপ্‌লের মাধ্যমে বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান, তার মাধ্যমে তাঁরা এজাতীয় একটি কৃত্রিম উপগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা অর্জনের সুযোগ পান। অ্যাপ্‌ল্ ছিল পূর্ববর্তী ষ্টেপ কার্যক্রমেরই পরবর্তী অধ্যায়।

অ্যাপ্‌লের ওজন ছিল ৬৭৩ কিলোগ্রাম এবং এর আভ্যন্তরীন যন্ত্রপাতির যে প্রযুক্তিবিদ্যা, তারও উদ্ভাবক ছিলেন ভারতীয় বিশেষজ্ঞেরাই।

এস-এল-ভি তিন

১৯৮০ সালের ১৮ই জুলাই তারিখটি ভারতের মহাকাশবিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ঐদিন কৃত্রিম উপগ্রহের বাহক নিজস্ব রকেট ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেছেন যে স্বল্প কয়েকটি দেশ, ভারত সেই তালিকায় নিজের নামকে সংযোজন করল।

১৮ই জুলাই সকাল আটটা বেজে তিন মিনিটের সময় একটি এস-এল-ভি (স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিক্‌ল্)-তিন রকেট শ্রীহরিকোটার রকেট ক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে রওনা হল রোহিনী নামে একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে ঘাড়ে নিয়ে। বাহক রকেট এবং কৃত্রিম উপগ্রহ দুয়েরই উদ্ভাবক এবং নির্মাতা হলেন ভারতীয় বিশেষজ্ঞেরা। ভারতের প্রথম বাহক রকেট নির্মাণের পেছনে ছিল সাত বছরের নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ইতিহাস।

এস-এল-ভি-তিন হল চার স্তরবিশিষ্ট একটি রকেট, এর দৈর্ঘ্য ২২ মিটার এবং প্রতিটি স্তরেই কঠিন জ্বালানীকে (প্রপেলাণ্ট) ব্যবহার করা হয়েছে। জ্বালানীসমেত এর মোট ওজন দাঁড়ায় ১৭ টনের কাছাকাছি। রকেটটির মধ্যে ৪৪টি প্রধান যান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে এবং ছোটবড় বিভিন্ন মাপের যন্ত্রাংশ রয়েছে এক লক্ষের কাছাকাছি।

কৃত্রিম উপগ্রহ রোহিনীর (আর-এস-এক) ওজন ছিল ৪০ কিলোগ্রাম। পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগ থেকে এর কক্ষপথের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দূরত্ব ছিল যথাক্রমে ৪২৫ ও ১৮১ কিলোমিটার। তবে দুর্ভাগ্যবশত কৃত্রিম উপগ্রহটি মাত্র ন' দিন টিকে ছিল। তারপরেই বায়ুমণ্ডলের ঘনস্তরে প্রবেশ করে ঘর্ষণজনিত তাপে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

১৯৮৬ সালের ৩১শে মে ভারতের নিজস্ব রকেট ব্যবস্থার সাহায্যে ৪০ কিলোগ্রাম ওজনের আর একটি রোহিনী (আর-এস-ডি-১) কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশে পাঠান ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা।

দুটি রোহিনী কৃত্রিম উপগ্রহই ছিল অতি ক্ষুদ্র আয়তনের। স্বভাবতই এই স্বল্প আয়তনের মধ্যে অনুসন্ধানী যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামের স্থান সংকুলানের জন্যে ওদের ক্ষুদ্রাতিকরণের (মিনিয়েচারাইজেসন) প্রযুক্তি-বিদ্যা ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের আয়ত্ত করতে হয়েছিল।

ভারতের জাতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থা (ইনস্যাট)

ইনস্যাট হল ভারতের প্রথম জাতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থা। ভূ-সমলয় কক্ষপথে অবস্থিত একটি কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের

মধ্যে টেলিফোন, বেতার ও টেলিভিসন যোগাযোগ ব্যবস্থাকে চালু রাখা, দেশের আবহ পরিস্থিতির ওপর ২৪ ঘণ্টা ধরে খবরদারী বজায় রাখা—সমগ্র পরিকল্পনার এটাই ছিল মূল উদ্দেশ্য।

বহু দূরবর্তী এলাকায় অবস্থিত মনুষ্যবিহীন অসংখ্য তথ্যসংগ্রাহক কেন্দ্র থেকে সংগৃহীত তথ্য ইনস্যাট পর্যায়ের কৃত্রিম উপগ্রহদের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় মূল তথ্যসংগ্রাহক কেন্দ্রে এসে পৌঁছবে। আবহমণ্ডলের মধ্যে কোন বিপর্যয়ের পূর্বাভাস অগ্রিম জানা গেলে বহু মানুষের জীবন যেমন রক্ষা পাবে, তেমনি ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানো যাবে বহু সম্পদকে। এ পর্যায়ের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ ইনস্যাট-১এ ১৯৮২ সালের ১০ই এপ্রিল মহাকাশে পাড়ি জমায়। আমেরিকার ফোর্ড এয়ারোস্পেস কমিউনিকেশনস করপোরেশন সংস্থা ছিল এই কৃত্রিম উপগ্রহের নির্মাতা এবং আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ন্যাসার থর ডেলটা রকেট ছিল এর বাহক।

ইনস্যাট-১বি মহাকাশে পাড়ি জমাল ১৯৮৩ সালে। এজাতীয় কৃত্রিম উপগ্রহদের আয়ু হল সাত বছরের মত। ইনস্যাট-১বি-র মাধ্যমেই বর্তমানে আমাদের দেশের বেতার, টেলিভিসন যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং আবহাওয়ার পূর্বাভাসের একটা বড় প্রয়োজন মিটছে। ইনস্যাট-১বি-র প্রায় বার্ধক্য দশা উপনীত। ১৯৮৯ সালের শেষ পর্যন্ত এর কর্মক্ষম থাকার কথা।

এ পর্যায়ের আর একটি ভূ-সমলয় কৃত্রিম উপগ্রহ ইনস্যাট-১সি-র ১৯৮৬ সালেই মহাকাশে পাড়ি জমাবার কথা ছিল। বাহকরূপে যাবার কথা আমেরিকার স্পেস সাট্‌ল্ চ্যালেঞ্জারের। কিন্তু ১৯৮৬ সালে চ্যালেঞ্জারের শোকাবহ দুর্ঘটনার পর ইনস্যাট-১সি-র বাহক রকেট নির্বাচন করা সমস্যাবহুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইয়োরোপীয় মহাকাশ সংস্থার বাহক রকেট এরিয়ানে অথবা কোন আমেরিকান বাহককে একাজে লাগানো হবে—সে বিচার চলছে। দুয়ের ক্ষেত্রেই বর্তমানের কার্যকারিতার রেকর্ড আশাব্যঞ্জক নয়। যে দিকেই হোক, আমাদের খরচা পড়বে প্রায় ৫০ কোটি টাকার মত।

ইনস্যাট-পরবর্তী পর্যায়

ভারতের মহাকাশ বিশেষজ্ঞেরা বর্তমানে যে ব্যাপারটিতে বিশেষভাবে সচেষ্ট তা হল ইনস্যাট পর্যায়ের কৃত্রিম উপগ্রহদের সম্পূর্ণভাবে ভারতেই তৈরি করা—এদের নক্সা, পরিকল্পনা হবে পুরোপুরিভাবেই ভারতীয়। এদের কার্যকারিতা হবে অতি উচ্চ মানের এবং কার্যক্ষমও হবে বহু বছর ধরে।

আমাদের বাহক রকেট এস-এল-ভি-তিন মাত্র ৪০ কিলোগ্রাম ওজনের

কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠাবার ক্ষমতাযুক্ত। এক্ষেত্রে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা চলেছে দুটো ধারায়। বর্তমান বাহক রকেট ব্যবস্থার একটি উন্নত সংস্করণ তাঁরা তৈরি করতে চলেছেন। এর নাম দেয়া হয়েছে—অগমেন্টেড স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিক্‌ল্‌ (এ-এস-এল-ভি)। বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদ্যা এবং অর্থনৈতিক উপযোগিতামূলক বিভিন্ন কাজে উপযোগী ১৫০ কিলোগ্রাম ওজনের কৃত্রিম উপগ্রহদের এই নতুন পর্যায়ের রকেটেরা মহাকাশে পৌঁছে দেবে।

আর এক পর্যায়ের বাহক রকেট উদ্ভাবনের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন ভারতীয় বিশেষজ্ঞেরা। এদের নাম দেয়া হয়েছে পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিক্‌ল্‌ (পি-এস-এল-ভি)। এদের সাহায্যে ৬০০ কিলোগ্রাম ওজনের কৃত্রিম উপগ্রহদের সূর্যের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে দুই মেরু অঞ্চলের ওপর দিয়ে একটি কক্ষপথে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এজাতীয় রকেট ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতীয় বিশেষজ্ঞেরা রিমোট সেনসিং এবং আবহবিদ্যা সংক্রান্ত কৃত্রিম উপগ্রহদের মহাকাশে পাঠানোর ব্যাপারে স্ব-নির্ভরতা অর্জন করতে পারবেন।

মহাকাশে ভারতীয় অভিযাত্রী

সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা ১৯৮২ সালের ১৯শে এপ্রিল তারিখে মহাকাশে স্যালিয়ুট-৭ নামে একটি দীর্ঘমেয়াদী মহাকাশ স্টেশনকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পর পর কয়েকটি সোভিয়েট মহাকাশযানে (সইয়ুজ টি-৫ থেকে টি-১০) বেশ কয়েকজন অভিযাত্রী পালা করে এই মহাকাশ স্টেশনের বাসিন্দাও হয়েছিলেন (এ প্রসঙ্গে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে)।

সোভিয়েট ইউনিয়নের তরফ থেকে ভারতের কাছে সরকারীভাবে একটি প্রস্তাব রাখা হল। পৃথিবী পরিক্রমাকারী স্যালিয়ুট-৭ মহাকাশ গবেষণাগারে সাত দিনের বসবাস এবং গবেষণার জন্যে একজন ভারতীয় অভিযাত্রীকে তাঁরা পেতে চান। ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো এবং সোভিয়েট সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তরের মধ্যে এ প্রসঙ্গে একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হল। ভারতীয় বিমানবাহিনীর দুই বৈমানিক, উইং কমাণ্ডার রভিশ মালহোত্র এবং স্কোয়াড্রন লিডার রাকেশ শর্মা মহাকাশ অভিযাত্রীর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের জন্যে নির্বাচিত হলেন।

ভারতীয় দুই বৈমানিকের মহাকাশ অভিযানের প্রশিক্ষণ সোভিয়েট ইউনিয়নে শুরু হল ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে এবং একটানা আঠার মাস তা চালু ছিল। প্রশিক্ষণের প্রথম পর্বে অভিযাত্রীরা পাঠ গ্রহণ করলেন তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, আবহবিদ্যা এবং উড্ডয়নশীল বস্তুর গতিবিদ্যা

সম্পর্কে। মহাকাশ গবেষণাগারে অর্পিত কাজের দায়িত্ব কিভাবে তারা পালন করবেন তারও বিশেষ মহড়া চলল একই সঙ্গে। অনেক উঁচুতে বিমান চালনা, প্যারাশুট নিয়ে ঝাঁপানো এবং নানাদি উপকরণের সাহায্যে ব্যায়ামের মধ্য দিয়ে অভিযাত্রীরা শারীরিক এবং মানসিকভাবে তৈরি হচ্ছিলেন, পৃথিবী থেকে রকেটে রওনা হওয়া এবং ফিরে আসার সময় অতিরিক্তমাত্রায় অভিকর্ষের টান (হাই জি-লোড) এবং মহাকাশে ওজনবিহীন পরিস্থিতি তারা কিভাবে সামলাবেন তাই নিয়ে।

ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞানের ইতিহাসে ১৯৮৪ সালের ৩রা এপ্রিল তারিখটি একটি স্মরনীয় দিন। ঐদিন দু কোটি অশ্বশক্তিসম্পন্ন তিনশ টন ওজনবিশিষ্ট, তিন স্তরের একটি সইয়ুজ রকেট সোভিয়েট ইউনিয়নের বাইকোনুর মহাকাশবন্দর থেকে রওনা হল ভারতীয় মহাকাশযাত্রী রাকেশ শর্মা এবং তাঁর দুই সোভিয়েট সহযাত্রীকে নিয়ে। অভিযানের সব পর্যায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হল এবং মহাকাশযান সইয়ুজ-১১ মহাকাশ স্টেশন স্যালিয়ুট-৭-এর কক্ষপথে এসে পৌঁছল। আঠের বার পৃথিবী পরিক্রমার পর সইয়ুজ-১১ ও স্যালিয়ুট-৭-এর মধ্যে সংযোগ ঘটল। সইয়ুজের অভিযাত্রী তিনজন প্রবেশ করলেন স্যালিয়ুট-৭-এ, যেখানে তিন সোভিয়েট অভিযাত্রী পৌঁছেছেন ইতিপূর্বেই ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে।

সইয়ুজ ও স্যালিয়ুটের অভিযাত্রীরা এবারে যুক্তভাবে কিছু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। সাত দিন বাদে সইয়ুজ-১১কে নিয়ে রাকেশ শর্মা তাঁর দুই সোভিয়েট সহযাত্রীর সঙ্গে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে এলেন।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা

ভারতীয় অভিযাত্রী রাকেশ শর্মা স্যালিয়ুট-৭ মহাকাশ স্টেশনে নানাদি পরীক্ষা কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এর মধ্যে ছিল বিভিন্ন উপাদানভিত্তিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, মহাকাশ থেকে রিমোট সেন্সিং পদ্ধতিতে পৃথিবীর কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলের ছবি তোলা, ওজনবিহীন পরিস্থিতির অস্বাভাবিক প্রভাবকে সামলাবার জন্যে যোগাসনের কার্যকারিতাকে যাচাই করা।

রূপো ও জারমেনিয়ামের মিশ্রধাতুঘটিত পরীক্ষাটির উদ্দেশ্য ছিল অতি শীতল তাপমাত্রার পরিবেশে উপাদান দুটির আভ্যন্তরীন গঠন কতটা প্রভাবিত হয় তা যাচাই করা। শারীরবিদ্যাসংক্রান্ত পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল হৃদযন্ত্রঘটিত রক্তসঞ্চালন ব্যবস্থা ও স্নায়ুঘটিত মোটরব্যবস্থার ওপর মহাকাশ জীবনের প্রভাবকে বিচার করা। কাইনেটো-কার্ডিওগ্রাফি' পরীক্ষাটির উদ্দেশ্য ছিল

হৃদ-চক্রের (কার্ডিয়াক সাইক্‌ল্) বিভিন্ন পর্যায় এবং হৃদযন্ত্রের যান্ত্রিক কার্যকারিতাকে ওজনবিহীন পরিবেশে পরীক্ষা করা। ব্যালিস্টো-কার্ডিওগ্রাফি পরীক্ষাটির লক্ষ্য ছিল হৃদযন্ত্রের রক্তপ্রবাহজনিত গতিবিদ্যার ধর্মকে বিচার করা।

আমাদের কানের দু-পাশে রয়েছে ভেস্টিবিউলার ব্যবস্থা, চলাফেরা দৌড়োনোর সময় শরীরের ভারসাম্য রক্ষায় যা সাহায্য করে থাকে। মহাকাশে ওজনবিহীন পরিবেশে এই ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থাটি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং শরীরের কোষ ও মাংসপেশীর কর্মক্ষমতাও কমে আসে। যোগাসনঘটিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল মহাকাশযানের এই অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াগুলো সামলাবার জন্যে যোগাসনের কার্যকারিতাকে বিচার করে দেখা।

ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো রিমোট সেনসিং পদ্ধতিতে 'টেপ' নামে একটি পরীক্ষার কর্মসূচী রূপ দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। ভারতীয় অভিযাত্রী রাকেশ শর্মা মালটিস্পেকট্রাল এবং কারটোগ্রাফিক ক্যামেরার সাহায্যে ভারত ভূখণ্ডের এক বিস্তৃত অঞ্চলের ছবি তুলেছিলেন এই কর্মসূচীর অংশ হিসেবে। পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগ থেকে ২৪০ কিলোমিটার উচ্চতায় ক্যামেরার ফ্রেমে প্রতিটি ছবিতে ধরা পড়ছিল ৩৩৫ বর্গ কিলোমিটার ব্যাপী এক বিস্তৃত অঞ্চল। এই বিস্তৃত অঞ্চলের এক একটি ছবির মধ্যে ৩০ মিটার দৈর্ঘ্যের যে কোন গঠনকে চিনে নিতে অসুবিধে হচ্ছিল না।

ভারত উপমহাদেশের ওপর দিয়ে পরিক্রমার সময় স্যালিয়ুট-৭ নবার ভারতের জমির ওপর দিয়ে এবং দুবার ভারতসংলগ্ন সমুদ্রের ওপর দিয়ে পাড়ি জমায়। মালটিস্পেকট্রাল ক্যামেরার ছটি ব্যাণ্ডের মধ্যে চারটি ছিল দৃশ্য আলোকের জন্যে ও দুটি ছিল অবলোহিত আলোর জন্যে এবং রাকেশ শর্মা প্রতিটি পরিক্রমার সময় ভারত ভূখণ্ডের কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ছবি তুলেছিলেন 'টেরা' কর্মসূচীর পরিকল্পনা অনুযায়ী।

মহাকাশ থেকে কাম্বে উপসাগরের এলাকায় যে ছবি তোলা হয়েছিল ওদের বিশ্লেষণের মাধ্যমে মেগালিনিয়ামেণ্ট এবং বৃত্তাকার কিছু কিছু ভূতাত্ত্বিক গঠন উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, খনিজ তেলের সঞ্চয়ের অনুসন্ধানকাজে বিশেষজ্ঞেরা যাদের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলরূপে চিহ্নিত করে থাকেন। একই ধরণের ভূতাত্ত্বিক গঠনসমৃদ্ধ এলাকা ভারতের পশ্চিম এবং উত্তরের অঞ্চলগুলোতেও পাওয়া গেছে। এই এলাকাগুলোতে ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান এবং সমীক্ষাকাজে বিশেষজ্ঞেরা নেমে পড়েছেন এবং খনিজ তেলের প্রাপ্তি সম্বন্ধে কয়েকটি অঞ্চলের রিপোর্ট যথেষ্টই আশাব্যঞ্জক।

মহাকাশ থেকে আলোকচিত্র তোলার মাধ্যমে গুজরাট, কর্ণাটক এবং পশ্চিমঘাট পার্বত্য এলাকার অরণ্য অঞ্চলের এক বিস্তৃত পর্যবেক্ষণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভারতের মরুভূমি এলাকায় বালুর পাহাড়, লবণসমৃদ্ধ এলাকা, ম্যাংগ্রোভ শ্রেনীর পৃথিবীর অতি প্রাচীন অরণ্য সম্পদ, নদীপ্রবাহের মধ্যে কাদামাটির পরিমাণ নির্ণয়, নদীতে এবং সাগরের উপকূলে পলি জমা পড়ার গঠনগত বৈচিত্র্য এবং সাগরের উপকূলভাগের মানচিত্র নির্মাণ—ভারত ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চল সম্বন্ধে এজাতীয় আরো বহু প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হয়েছে ভারতীয় অভিযাত্রী রাকেশ শর্মার মহাকাশ কর্মসূচীর মাধ্যমে।

২৪

সত্তর ও আশির দশকের মহাকাশ প্রকল্প

সত্তরের দশকে মহাকাশ বিজ্ঞানের বিকাশ একটি নতুন দিকে মোড় নিয়েছিল। এই দশকটা ছিল প্রধানত বড় মাপের মহাকাশ গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার কাজে নামা এবং মানুষের দীর্ঘকালব্যাপী মহাকাশে যাপনের পর্যায়। দুটি দেশ প্রধানত এই অভিযানে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে—সোভিয়েট ইউনিয়ন ও আমেরিকা। রকেট উৎক্ষেপণ, কক্ষপথে পরিক্রমাকালীন মহাকাশযানের গতিবিধিসংক্রান্ত নানাদি পরীক্ষানিরীক্ষা, মহাকাশে দুটি যানের সংযোগসাধন এবং কোন মহাজাগতিক বস্তুর পৃষ্ঠভাগের ওপর আলতোভাবে নেমে আসা জাতীয় সফল ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে মহাকাশ বিজ্ঞান যেন তার সাবালকত্বকে অর্জন করছিল বলা যায়।

মহাকাশের সম্পূর্ণ ওজনবিহীন পরিবেশে সুদীর্ঘকাল যাপনের মধ্য দিয়ে নানাদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষামূলক কাজ করা যেতে পারে ঠিকই, তবে বিশেষজ্ঞেরা নিশ্চিত হতে চাইছিলেন যে বিষয়ে তা হল, এজাতীয় পরিবেশে মানুষের জৈব ব্যবস্থার মধ্যে স্থায়ীমাপের ক্ষতিকারক কোন পরিবর্তন না ঘটে বসে।

কক্ষচারী মহাকাশ স্টেশন

মহাকাশে সুদীর্ঘকাল যাপনের প্রয়োজনীয় একটি সর্ত হল—অক্সিজেন, খাদ্য, জল, এবং জ্বালানীজাতীয় উপাদানগুলো যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। এই উপাদানগুলোকে একবারে কুড়ি তিরিশ দিনের চেয়ে বেশি পরিমাণে মহাকাশে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর নয়। নানাদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা এবং কয়েকজন মহাকাশযাত্রীর স্বচ্ছন্দে থাকার ব্যবস্থাসমেত একটি বড় মাপের গবেষণাগারকে মহাকাশে প্রতিষ্ঠা সহজ কাজ নয়। তাই সোভিয়েট ও আমেরিকার বিজ্ঞানীরা যে উপায়টির আশ্রয় গ্রহণ করলেন, তা হল এই—প্রথমে মনুষ্যবিহীন একটি গবেষণাগারকে মহাকাশে পাঠানো এবং তারপর আর একটি মহাকাশযানে অভিযাত্রীদের সেখানে পৌঁছে দেয়া। গবেষণাগারে প্রয়োজনীয়

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার কাজ সম্পূর্ণ করে আবার একই মহাকাশযানে তারা পৃথিবীতে ফিরে আসবেন।

কক্ষচারী মহাকাশ স্টেশনের মধ্যে রয়েছে স্বাভাবিকভাবে কাজ করা ও থাকার পরিবেশ, বায়ু সঞ্চালন ও তাপীয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, পৃথিবীর সঙ্গে বেতার ও টেলিভিসন যোগাযোগ ব্যবস্থা, গবেষণা এবং জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের যন্ত্রপাতি। বসবাসের জন্যে নির্দিষ্ট কক্ষটিতে সব সময়ে বিশুদ্ধ বাতাসের সরবরাহ চালু এবং, বাতাসের নির্দিষ্ট চাপকে বজায় রাখতে হবে. নিশ্বাসের সঙ্গে নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে শুষে নেবার ব্যবস্থাকেও চালু রাখতে হবে।

স্কাইল্যাব

একটি দীর্ঘস্থায়ী মহাকাশ স্টেশন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে স্কাইল্যাবকে প্রথম মহড়া হিসেবে গণ্য করা যায়। আমেরিকার বিশেষজ্ঞদের উদ্ভাবিত স্কাইল্যাব ১৯৭৩ সালের ১৪ই মে একটি বিশাল স্যাটার্ন-৫ রকেটের ঘাড়ে চেপে পৃথিবী থেকে ৪৩৫ কিলোমিটার দূরে একটি কক্ষপথে পৃথিবী পরিক্রমার কাজ শুরু করল। স্টেশনটির দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৩৬ মিটার এবং ওজন ৮৮ টন।

এগার দিন বাদে ২৫শে মে তিন অভিযাত্রী চার্লস কনরাড, জোসেফ আরউইন এবং পল ভাইত্জ আর একটি মহাকাশযানে স্কাইল্যাবে হাজির হলেন। মহাকাশ স্টেশনটি ইতিমধ্যে একটি যান্ত্রিক ত্রুটির জন্যে প্রায় অকেজো হতে বসেছিল। সূর্যের তাপ-প্রতিরোধক একটি আবরণী সঠিকভাবে উন্মুক্ত না হবার ফলে স্টেশনটির আভ্যন্তরীন তাপমাত্রা ১১০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে পৌঁছে যায়, যেখানে থাকার কথা ৬০ থেকে ৭০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের মধ্যে। পৃথিবী থেকে বিশেষজ্ঞেরা বেতার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে কিছুটা ত্রুটি সারাতে পেরেছিলেন। বাকিটা সারালেন অভিযাত্রীরা স্টেশনটির বাইরে বেরিয়ে এসে এবং ওকে বাসযোগ্য করে তুললেন। উন্মুক্ত মহাকাশে স্টেশন মেরামতির কাজ হিসেবে এটাই ছিল প্রথম প্রচেষ্টা।

স্কাইল্যাব গবেষণার প্রথম পর্যায়ে অভিযাত্রীরা ২৮ দিন স্টেশনটিতে কাটিয়েছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের অভিযাত্রীরা ছিলেন যথাক্রমে প্রায় দু মাস ও ৮৪ দিন। বিভিন্ন পর্যায়ের অভিযাত্রীরা পৃথিবী ও সূর্যের অসংখ্য ছবি নিয়েছেন। (স্কাইল্যাব থেকে তোলা ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং হিমালয় পাহাড়ের দুটি ছবি এই বইতেই রয়েছে।) পৃথিবীর সম্পদ অনুসন্ধানকারী যান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে স্কাইল্যাব আমেরিকার নেভাডা মরুভূমিতে তামার একটি সঞ্চয়ের সন্ধান পায় যার মূল্য হবে বহু বিলিয়ন ডলারের কোঠায়।

স্কাইল্যাবের অভিযাত্রীরা মহাকাশে বিভিন্ন ধাতুর গলন, ওয়েলডিং এবং ব্রেজিং জাতীয় কাজ করেছেন সম্পূর্ণ ওজনবিহীন পরিস্থিতিতে। পরীক্ষামূলক-ভাবে মিশ্র ধাতু এবং কেলাস (ক্রিস্ট্যাল) তৈরির কাজও অতি নিখুঁতভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল।

স্কাইল্যাবের মহাকাশে থাকার কথা ছিল প্রায় দশ বছর। কিন্তু ১৯৭৯ সালেই তা ভেঙ্গে পড়ে। স্কাইল্যাবের ধ্বংসাবশেষ নাকি ভারতের পশ্চিম প্রান্তে গুজরাট, মহারাষ্ট্রের কোন কোন অঞ্চলের ওপর এসে পড়তে পারে এই অমূলক আশঙ্কায় এবং তার হাত থেকে বাঁচার জন্যে দেবতাদের উদ্দেশ্যে বহু যজ্ঞের আয়োজন ওখানে করা হয়। বহু লক্ষ টাকার ঘি নাকি ঢালা হয়েছিল ঐ সব যজ্ঞে। মানুষের মনের অন্ধতার প্রকাশ ছাড়া একে আর আমরা কি বলব।

সইয়ুজ

সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা আরোহীসমেত সইয়ুজ পর্যায়ের চল্লিশটি মহাকাশযানকে ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে শুরু করে ১৯৮১ সালের মে মাস পর্যন্ত বিভিন্ন অভিযানে নিয়োগ করেন। সইয়ুজ জাতীয় মহাকাশযানের মধ্যে একদিকে ছিল নিজস্ব পরিচালন, গতিবিধির নিয়ন্ত্রণ, কক্ষচারী মহাকাশ স্টেশনের সঙ্গে সংযুক্তিকরণের ব্যবস্থা, অন্যদিকে ছিল মানুষের জৈবিক ব্যবস্থার ওপর সুদীর্ঘকালীন মহাকাশজীবনের প্রতিক্রিয়াকে বিচার করা, পৃথিবী ও তার বায়ুমণ্ডল, মহাকাশের বায়ুহীন অঞ্চল, ওজনবিহীন পরিস্থিতি এবং মহাকাশে বিকীরণ সম্বন্ধে বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কাজের সুচারু আয়োজন। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে গ্রহজগত, সূর্য এবং নক্ষত্রঅঞ্চল সম্বন্ধে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের সুষ্ঠু ব্যবস্থাতেও সজ্জিত ছিল প্রতিটি সইয়ুজ।

স্যালিয়ুট

সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা চাইছিলেন পৃথিবীর কক্ষচারী এমন এক বিশেষ পর্যায়ের মহাকাশ স্টেশনদের প্রতিষ্ঠা করা, যারা হবে দীর্ঘস্থায়ী। পৃথিবী থেকে পালা করে মহাকাশযানের আরোহীরূপে অভিযাত্রীরা আসবেন, ঐ স্টেশনে নির্দিষ্ট সময়কাল জুড়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শেষ করে আবার পৃথিবীতে ফিরে যাবেন। স্যালিয়ুটেরা ছিল এই পর্যায়ের মহাকাশে স্টেশন।

স্যালিয়ুটের মধ্যে একদিকে যেমন ছিল অতি সূক্ষ্ম মাপের গবেষণার যন্ত্রপাতি, আর একদিকে ছিল মানুষের মহাকাশে সুদীর্ঘকালীন কাজ এবং বাসের সম্ভাব্য সব রকমের ব্যবস্থা। এই স্টেশনগুলোর গঠনগত মূল উপাদান ছিল টাইটেনিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামঘটিত মিশ্রধাতু। মহাকাশের বায়ুহীন প্রদেশ এবং তাপমাত্রার বিপুল তারতম্যকে ধারণ করার মত সামর্থ্য স্টেশনটির প্রতিটি যন্ত্র এবং উপাদানকে অর্জন করতে হয়েছিল। অতি বিশেষ পর্যায়ের যান্ত্রিক কলাকৌশল এজন্যে বিশেষজ্ঞদের উদ্ভাবন করতে হয়।

কক্ষপথে পরিক্রমাকালীন অবস্থায় মহাকাশযানের সূর্যালোকিত অংশের তাপমাত্রা পৌঁছত ১৩০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডে, আবার পৃথিবীর ছায়া অংশে এই তাপমাত্রা নেবে আসত ১৫০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডের কোঠায়। তাই মহাকাশযানের বাইরের অংশে তাপীয় নিয়ন্ত্রণের একটি বিশেষ ব্যবস্থা বিশেষজ্ঞদের উদ্ভাবন করতে হয়। ভার্নিসজাতীয় অজৈব পিগমেণ্ট এবং সিলিকেট পর্যায়ের পদার্থদের আস্তরণকে ব্যবহার করা হয়েছিল বাইরের তাপ আবরণীর অন্তরকের (ইনসুলেশন) ভূমিকায়। ভেতরের দিকে নিউম্যাটিক এবং হাইড্রলিক (ঔদক) ব্যবস্থার মাধ্যমে তরল পদার্থের পরিবহনকে চালু রেখে কেবিনঘরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছিল ২৫ থেকে ৩৫ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডের কোঠায়। বাতাসের চাপ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল পারদের মাত্রার ৭৫০ মিলিমিটারে।

মহাকাশযানের বাসকক্ষে অভিযাত্রীদের জন্যে রয়েছে বিশ্রাম এবং ঘুমোনোর ব্যবস্থা আর কর্মশালারূপী ঘরটিতে রয়েছে নানাদি নিয়ন্ত্রক এবং বেতার ও টেলিভিসন যোগাযোগ ব্যবস্থা। ব্যায়াম করার উপযোগী একটি জিমনাসিয়াম এবং মলত্যাগের জন্যে একটি বিশেষ জায়গা এবং ব্যবহৃত জলকে পরিশোধনেরও ব্যবস্থা রয়েছে মহাকাশযানের মধ্যে।

অভিযাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্যে গরম এবং ঠাণ্ডা জলে স্নানেরও আয়োজন করা হয়েছে। ওজনবিহীন অবস্থায় জল নিচের দিকে পড়বে না। তাই বিশেষভাবে তৈরি আধার থেকে দুটি মুখযুক্ত একটি স্থিতিস্থাপক (ইলাসটিক) সিলিণ্ডার জল ও বাতাসের মিশ্রণকে ছুঁড়ে মারে এবং একটি পাম্পের সাহায্যে ব্যবহৃত জলকে কেবিনঘর থেকে বাইরে বের করে নিয়ে আসা হয়।

স্যালিয়ুট-৬ মহাকাশ স্টেশনটি সাড়ে তিন বছর মহাকাশে যাপনের পরেও সম্পূর্ণ কর্মক্ষম অবস্থায় ছিল। দীর্ঘমেয়াদী মহাকাশ স্টেশন তৈরির প্রথম মহড়ায় কার্যকরী সাফল্য অর্জনের ফলে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন।

অ্যাপোলো-সইয়ুজ যুক্ত মহড়া

মহাকাশে সোভিয়েট এবং আমেরিকার বিজ্ঞানীদের মিলিত প্রচেষ্টার কর্মসূচী পৃথিবীর মানুষ দীর্ঘকাল ধরে আকাঙ্ক্ষা করে আসছিলেন। ১৯৭৫ সালে সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হল দুই দেশের দুটি মহাকাশযানের যুক্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে।

মহাকাশযান অ্যাপোলো ও সইয়ুজের সংযুক্তির জন্যে দুই দেশের বিজ্ঞানীদের একটি সম্পূর্ণ নতুন ধাঁচের সংযোজক ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে হয়েছিল। তাঁরা এর নাম দিয়েছিলেন অ্যাণ্ড্রোগিনাস পেরিফেরাল 'ডকিং সিস্টেম। এই ব্যবস্থাটির আর একটি বড় বৈজ্ঞানিক ও মানবিক তাৎপর্যও ছিল। দুই দেশের আরোহীসমেত কোন মহাকাশযান যদি মহাকাশে কোন কারণে বিপন্ন হয়ে পড়ে তাহলে একে অপরের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হতে পারবে। বিপন্ন মহাকাশযানটি অন্য দেশের পৃথিবী পরিক্রমারত কোন মহাকাশযানের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে মহাকাশযাত্রীদের একটি যান থেকে আর একটি যানে স্থানান্তরিতও করতে পারবে।

১৯৭৫ সালের ১৫ই জুলাই দু-জন সোভিয়েট মহাকাশযাত্রীকে নিয়ে সইয়ুজ-১৯ বাইকোনুর মহাকাশবন্দর থেকে মহাকাশে পাড়ি জমায়। তার একদিন বাদে অ্যাপোলো মহাকাশযানের তিনজন আমেরিকান অভিযাত্রী মহাকাশে এসে হাজির হলেন। সইয়ুজের তখন চারবার পৃথিবী পরিক্রমার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগ থেকে ২২৫ কিলোমিটার দূরত্বে একটি প্রায় বৃত্তাকার কক্ষপথে দুটি মহাকাশযানের সংযুক্তিকরণ ঘটে ১৭ই জুলাই তারিখে।

দুই দেশের পাঁচজন অভিযাত্রী পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হলেন। পুরো চারদিন তাঁরা যুক্তভাবে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী নানাদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ সম্পন্ন করেন। ২৬শে জুলাই দুটি মহাকাশযান পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং ২৫শে জুলাই ওরা নিরাপদে পৃথিবীতে নেমে আসে।

দুই দেশের যুক্ত মহাকাশ মহড়ার সাফল্যে সোভিয়েট আমেরিকান যুক্ত বৈজ্ঞানিক কমিশন গড়ে ওঠে মহাকাশ সংক্রান্ত আবহবিদ্যা, পরিবেশবিদ্যা, চাঁদ এবং গ্রহজগত সংক্রান্ত গবেষণা এবং মহাকাশ প্রাণীবিদ্যা এবং চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে। ১৯৮২ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিগান দুই দেশের যুক্ত বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রচেষ্টার চুক্তিকে নবীকরণে অস্বীকৃত হলেন। এই ঘটনায় আশাহত হয়েছিলেন পৃথিবীর শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষেরা। বর্তমানে মাত্র একটি

ক্ষেত্রে সোভিয়েট আমেরিকার যুক্ত মহাকাশসংক্রান্ত কর্মপ্রচেষ্টা টিকে আছে। তা হল বিপন্ন সাগরগামী জাহাজ বা আকাশচারী বিমানের অনুসন্ধান কাজ এবং বিপন্ন অবস্থা থেকে তাদের মুক্ত করার ক্ষেত্রে।

প্রগ্রেস

মহাকাশে দীর্ঘকালীন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা স্যালিয়ুট পর্যায়ের মহাকাশযানের উদ্ভাবন করেছিলেন। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী মাসে স্যালিয়ুট-৬ মহাকাশ স্টেশনের সঙ্গে সইয়ুজ-২৫ ও সইয়ুজ-২৭ নামে আরোহীসমেত দুটি মহাকাশযানকে একের পর এক সংযুক্ত করে তাঁরা এক অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাকাজকে সম্পূর্ণ করলেন। সমগ্র সংগঠনটির ওজন দাঁড়িয়েছিল ৩২ টন এবং দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০ মিটারের কাছাকাছি। স্টেশনও মহাকাশযানসমেত এত বড় মাপের একটি গঠন এই প্রথম মহাকাশে তৈরি করা সম্ভবপর হল।

এরপরে স্বাভাবিকভাবেই যে কর্মসূচীটি রূপায়নের কাজে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা তৎপর হলেন, তা হল—মহাকাশে পৃথিবীর কক্ষচারী গবেষণাগারে প্রয়োজনীয় মালমশলাসমেত আরোহীবিহীন যানকে পাঠানো। মহাকাশে দীর্ঘস্থায়ী কর্মসূচীর জন্যে মানুষসমেত মালবাহী যান পাঠানোর পরিবর্তে এ জাতীয় ব্যবস্থা একদিকে যেমন কম ব্যয়সাধ্য হবে তেমনি অভিযাত্রীদেরও অনেক অপ্রয়োজনীয় পরিশ্রমকে এ লাঘব করবে। এই শ্রেণীর মালবাহী যানেদের নাম দেয়া হয়েছিল প্রগ্রেস।

প্রগ্রেস পর্যায়ের যানেরা ছিল সইয়ুজেরই মত দেখতে। এরা দৈর্ঘ্যে ছিল আট মিটার লম্বা ও আড়াই মিটার চওড়া। এদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা ছিল না প্রথম দিকে। তাই যানগুলোর বাইরের দিকে গঠন থেকে ভারী তাপ প্রতিরোধক ব্যবস্থাকে বাদ দিতে পেরেছিলেন বিশেষজ্ঞেরা। ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থাসমেত কসমস পর্যায়ের আর একদল মহাকাশচারী উদ্ভাবনের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা।

প্রগ্রেস-১ স্যালিয়ুট-৬কে ৬৩০০ কিলোগ্রামের মত প্রয়োজনীয় নানাদি সামগ্রী এবং এক টনের মত জ্বালানি গ্রহণের উপযোগী মালমশলা পৌঁছে দেয়। এবারে ও যে কাজটি করল, তা ছিল অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ; সমগ্র স্যালিয়ুট-৬, সইয়ুজ-২৭ ও প্রগ্রেস-১ যুক্ত গঠনটিকে এক কক্ষপথ থেকে আর এক কক্ষপথে পৌঁছে দিল।

ঘটনাটিকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে একটি সাধারণ ঘটনা। কিন্তু ভবিষ্যতে

মহাকাশে একটি নতুন কর্মসূচীর ক্ষেত্র এভাবে তৈরি হল। আরোহীবিহীন ফেরিরূপী মহাকাশযানেরা পৃথিবী থেকে একটি কক্ষচারী গবেষণাগার তৈরির সব মালমশলা ঘাড়ে করে মহাকাশে বয়ে নিয়ে এসে ওদের এক জায়গায় জড়ো করে একটি স্টেশন তৈরি করবে এবং প্রয়োজন হলে স্টেশনের এক একটি অংশকে এক কক্ষপথ থেকে আর একটি কক্ষপথে পৌঁছে দেবে। মহাকাশে এভাবে রীতিমত একটি কারখানা তৈরির পটভূমি গড়ে উঠতে পারে অদূর ভবিষ্যতেই।

আমেরিকার স্কাইল্যাব নামে যে মহাকাশযানটি তার আয়ুষ্কাল শেষ হবার আগেই ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে ভারত মহাসাগরে এসে আছড়ে পড়েছিল তাকে রক্ষার উপায় প্রগ্রেস পর্যায়ের যানের হাতে ছিল। ব্যবস্থাটি হত এই—বিপন্ন কম্পমান স্কাইল্যাবের সঙ্গে প্রগ্রেস নিজেকে সংযুক্ত করত এবং ওকে আরো দূরের নিরাপদ কক্ষপথে পৌঁছে দিয়ে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারত।

মহাকাশে দিন যাপনের রেকর্ড

মহাকাশে দীর্ঘকাল নিঃসঙ্গ জীবনযাপনের একটা ক্লান্তি রয়েছে। তাকে দূর করার জন্যে মহাকাশ স্টেশনে বসবাসকারী অভিযাত্রীদের সঙ্গে পৃথিবী থেকে পালা করে এক এক দল অভিযাত্রী এসে যদি কিছুদিন থেকে আবার পৃথিবীতে ফিরে যান, তাহলে নিঃসঙ্গতা আর বোঝা হয়ে ওঠে না। এজাতীয় ব্যবস্থার ফলে মহাকাশে দীর্ঘদিন থাকার নতুন নতুন রেকর্ড তৈরি হয়ে চলল।

স্কাইল্যাব-৩ মহাকাশযানে উইলিয়াম পোগ, গেরাল্ড কার এবং এডওয়ার্ড গিবসনের বসবাসের ৮৪ দিনের রেকর্ড ভাঙ্গলেন ১৯৭৮ সালের ১৬ই মার্চ দুই সোভিয়েট মহাকাশযাত্রী ইউরি রোমানেঙ্কো এবং জির্য়জি গ্রেচকো। তাঁরা মহাকাশে ছিলেন ৯৬ দিন ৬০ ঘণ্টা। ১৯৭৮ সালের নভেম্বর মাসে দুই সোভিয়েট অভিযাত্রী ভ্লাদিমির কোভালেনক এবং আলেকজাণ্ডার আইভানচেনকো ১৪০ দিন স্যালিয়ুট-৬-এ থেকে এই রেকর্ডকেও ভাঙ্গলেন। সোভিয়েট অভিযাত্রীরা ধারাবাহিকভাবে রেকর্ড ভেঙ্গেই চললেন—১৯৭৯ সালের ১৯শে আগাষ্ট, ১৯৮০ সালের ১১ই অক্টোবর, ১৯৮২ সালের ১০ই ডিসেম্বর যথাক্রমে ১৭৫ দিন, ১৮৫ দিন ও ২১১ দিন মহাকাশে থাকার রেকর্ড তৈরি হল।

১৯৮৩ সালে দুই সোভিয়েট অভিযাত্রী লিওনিড কিজিম এবং ভ্লাদিমির সলোভিয়ভের ২৩৭ দিনের অবস্থানই এখনো পর্যন্ত মহাকাশে যাপনের সুদীর্ঘতম

রেকর্ড হয়ে রয়েছে। সম্পূর্ণ ওজনবিহীন অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে অভিযাত্রীদের শারীরব্যবস্থার মধ্যে কোন স্থায়ীমাপের অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায় নি।

সইয়ুজ-টি ও স্যালিয়ুট-৭

সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা মহাকাশচারী যানেদের নানাভাবে উন্নতিবিধান করেই চলেছিলেন। সইয়ুজ-টি হল এই প্রচেষ্টারই স্বাভাবিক পরিণতি। এর আভ্যন্তরীন ইলেকট্রনিক ব্রেন বা কম্পিউটারেরা ছিল এত সূক্ষ্ম ও উন্নতমানের যে অভিযাত্রীদের বেশির ভাগ কাজের দায়িত্ব ওরাই গ্রহণ করে নেয়। জটিল পরিস্থিতিতে নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেবার সামর্থও ছিল ওদের। মাইক্রো-ইলেকট্রনিকসের দৌলতে এই কম্পিউটারেরা জায়গা নেয় কম, শক্তির চাহিদাও কম।

স্যালিয়ুট-৭ ছিল সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত দ্বিতীয় পর্যায়ের মহাকাশ স্টেশন। আভ্যন্তরীন যন্ত্রপাতি, পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ সব ব্যাপারেই এ ছিল আগের তুলনায় অনেক উন্নত মানের। বাড়তি ব্যবস্থার মধ্যে স্টেশনের বসবাসের এলাকায় শয়নকক্ষ যেমন ছিল, তেমনি খাবার টেবিল, বাসনপত্রসমেত রান্নাঘরের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

ওজনবিহীন পরিবেশে অভিযাত্রীদের মনস্তাত্বিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্যে মহাকাশকক্ষের মেঝের রং একটু গাঢ় এবং ছাদের রং রাখা হয়েছিল একটু হালকা। এভাবে মেঝে এবং ছাদের একটা আলাদা ধারণা তৈরি করা যাবে। ওজনবিহীন পরিবেশে কোন বস্তুর ওপর নিচুটান না থাকার ফলে বুঝে ওঠাই যায় না কোন দিকটা মেঝে আর কোনটা ছাদ।

স্যালিয়ুট-৭-এর সবচেয়ে বড় কার্যকারিতা ছিল এই, ওর যে কোন যন্ত্রাংশ বিকল হয়ে গেলে তার জায়গায় আর একটিকে স্বচ্ছন্দেই বসিয়ে দেয়া চলত যেটা পূর্ববর্তী পর্যায়ের মহাকাশ স্টেশনগুলোতে ছিল না। এর ফলে স্টেশনটির কার্যক্ষম থাকার মেয়াদও গেল বেড়ে।

ভারতের মহাকাশযাত্রী রাকেশ শর্মা ও তাঁর দুই সোভিয়েটযাত্রী মহাকাশযান সইয়ুজ-১১-র যাত্রীরূপে স্যালিয়ুট-৭-এ সাতদিন কাটিয়েছিলেন, এ প্রসঙ্গে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

স্পেস সাট্‌ল্

আমেরিকার মহাকাশ বিজ্ঞানীরা আশির দশকের গোড়ায় একটি অভিনব মহাকাশযানের উদ্ভাবন করলেন, যার নাম দিয়েছিলেন তাঁরা স্পেস সাট্‌ল্। পৃথিবী থেকে এর যাত্রা শুরু হয় একটি রকেটের মত, পৃথিবী পরিক্রমা চলে

একটি মহাকাশযানের মত এবং তারপর বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে ও নেমে আসে একটি সাধারণ বিমানের মত।

প্রথম স্পেস সাট্‌ল্ কলম্বিয়া মহাকাশে পাড়ি জমায় ১৯৮১ সালের ১২ই এপ্রিল, পৃথিবীর প্রথম মহাকাশযাত্রী ইউরি গাগারিনের মহাকাশযাত্রার বিশতম বার্ষিকীর দিনটিতে। কলম্বিয়ার মধ্যে ছিল রিমোট ম্যানিপুলেটর সিস্টেম (দূরবর্তী বস্তুকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা) নামে রোবটরূপী একটি বাহু। কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত ১৫ মিটার দৈর্ঘ্যের এই বাহুটি পৃথিবীর কক্ষপথে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ বা অন্য কোন বস্তুকে যেমন প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তেমনি কক্ষপথ থেকে প্রয়োজন হলে ওদের উদ্ধার করেও নিতে পারে। একটি মহাকাশ স্টেশন তৈরির বিভিন্ন উপাদানকে স্পেস সাট্‌ল্ স্বচ্ছন্দেই পৃথিবী থেকে বয়ে নিয়ে এসে পৌঁছে দিতে পারে মহাকাশে।

কৃত্রিম উপগ্রহের ভূমিকায় মহাকাশযাত্রী

অন্যতম স্পেস সাট্‌ল্ চ্যালেঞ্জার ১৯৮৪ সালের তেসরা ফেব্রুয়ারী মহাকাশে পাড়ি জমায়। স্পেস সাট্‌লের দশম অভিযান ছিল এটি। সাট্‌লের অন্যতম অভিযাত্রী ম্যাকক্যাণ্ডলেস একটি ঐতিহাসিক ঘটনার নায়ক হয়ে দাঁড়ালেন। সাতই ফেব্রুয়ারী তিনি একটি ম্যান্‌ড্ ম্যানুভারিং ইউনিটে (মানুষ সমেত নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা) সজ্জিত হয়ে মহাকাশযান কলম্বিয়া থেকে বেরিয়ে এসে মহাকাশে নব্বই মিনিট বিচরণ করলেন। মহাকাশযান থেকে তাঁর দূরত্ব ছিল প্রায় ৫০ মিটারের মত এবং মহাকাশে ভাসমান অবস্থায় নব্বই মিনিট সময়ে গোটা পৃথিবীকে এক চক্কর ঘুরে এলেন তিনি। মহাকাশযান থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মহাকাশে দীর্ঘ সময় যাপনের এটাই ছিল বৃহত্তম রেকর্ড।

ম্যাকক্যাণ্ডলেসের সহযাত্রী ষ্টুয়ার্টও লাইফলাইনের (বন্ধনরজ্জু) সাহায্য ছাড়াই দশ মিটারের মত দূরে থেকে মহাকাশযানকে পরিক্রমা করে এলেন। ভবিষ্যতে মহাকাশে বিভিন্ন মালমশলাকে একত্র করে মহাকাশ ষ্টেশন তৈরি করা, বিকল মহাকাশযানকে মেরামত করা বা বিপন্ন কোন অভিযাত্রীকে উদ্ধার করা জাতীয় কাজের একটা মহড়া যেন হয়ে গেল এভাবে।

সোলার ম্যাক্স নামে একটি কৃত্রিম উপগ্রহের যান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে ত্রুটি ঘটেছিল। কলম্বিয়া সাতই ফেব্রুয়ারী তারিখে উপগ্রহটির কাছাকাছি এসে হাজির হয়। কলম্বিয়ার দুই অভিযাত্রী ম্যাকক্যাণ্ডলেস ও ষ্টুয়ার্ট একটি যান্ত্রিক বাহুর সাহায্যে সোলার ম্যাক্সকে কলম্বিয়ার মালপত্র রাখার গুদামঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেন এবং ওর যান্ত্রিক ত্রুটিকে সারাই করে আবার কক্ষপথে ওকে ছেড়ে দিলেন।

ঘটনাটির যেমন বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য রয়েছে, তেমনি সামরিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির এ হতে পারে একটি মাধ্যম। এই পদ্ধতিতে একটি দেশ আর একটি দেশের পৃথিবী পরিক্রমারত কোন কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশ থেকে যে কোন সময়েই অপহরণ করে নিতে পারে। ভবিষ্যতে মহাকাশে উত্তেজনা সৃষ্টির একটি সম্ভাবনা ঘটনাটির মধ্যে নিহিত রয়েছে সন্দেহ নেই। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন যে কোন মানুষই চাইবেন মহাকাশকে যেন পুরোপুরি শান্তিপূর্ণভাবেই ব্যবহার করা হয়, ঠাণ্ডা লড়াইর ক্ষেত্র হিসেবে নয়।

মহাকাশে ট্র্যাজেডি

স্পেস সাট্‌লের পঁচিশতম অভিযান এবং চ্যালেঞ্জারের দশম অভিযান মহাকাশ বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক পরম শোকাবহ ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৮৬ সালের ২৮শে জানুয়ারী ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল মহাকাশবন্দর থেকে যাত্রা শুরুর ঠিক ৭৩ সেকেণ্ড বাদে হাজার হাজার দর্শনার্থীর চোখের সামনে কলম্বিয়ার মধ্যে এক বিরাট বিস্ফোরণ ঘটে এবং সাতজন মহাকাশ-যাত্রীসমেত কলম্বিয়া ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল আটলাণ্টিক মহাসাগরের জলে। সাতজন অভিযাত্রীর মধ্যে দু-জন ছিলেন মহিলা। এতবড় শোকাবহ ঘটনায় গোটা পৃথিবীর মানুষই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগ থেকে পনের কিলোমিটার দূরে। আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ন্যাসার তোলা ছবি এবং অন্যান্য রেকর্ড থেকে বোঝা যাচ্ছিল, কঠিন জ্বালানিপূর্ণ একটি বুষ্টার রকেটের মধ্যে গোলযোগের জন্যেই দুর্ঘটনাটা ঘটে। রকেটের বাইরের আবরণীর মধ্যে একটি বড় মাপের ভাঙ্গন ঘটেছিল ; ভাঙ্গনরূপী সেই ফাটলের মধ্য দিয়ে তপ্ত আগুনের শিখা বেরিয়ে এসে প্রায় একটি জ্বালানীরূপী টর্চের ভূমিকা নেয়। বাইরের জ্বালানী ট্যাংকের মধ্যে ছিল ১৭০০ টনের মত জ্বালানী, যেখান থেকে প্রতি মিনিটে রকেটের দহনকাজের ঘরে ১৮০,০০০ লিটার তরল হাইড্রোজেন এবং ৬৫০০০ লিটার তরল অক্সিজেন যোগান দেয়া হচ্ছিল। এই হারে জ্বালানি-অক্সিজেন যুটিকে যোগান দিতে হয় রকেটের যাত্রা শুরুর পর ৮½ মিনিট সময় ধরে। আগুনের শিখার স্পর্শে জ্বালানী ট্যাংক বোমার মত ফেটে পড়ে।

সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপারটা ছিল এই, অসাধারণ সূক্ষ্ম, উন্নত এবং জটিল পর্যায়ের কম্পিউটারের তদারকি ব্যবস্থার আয়োজনও রকেটের আবরনীর ভাঙ্গনকে দুর্ঘটনার আগে নির্ণয় করে উঠতে পারে নি। এই সব সুপার কম্পিউটারেরা প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৩১ লক্ষের মত তথ্য পাঠাবার সামর্থ্যযুক্ত। আগুনের শিখা বেরোনোর পরেও এবং মহাকাশযানের ভেতরের

বায়ুর চাপ কমে আসা সত্ত্বেও মূল যোগাযোগ কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞেরা বা চ্যালেঞ্জারের অভিযাত্রীরাও আসন্ন বিপর্যয় সম্বন্ধে কোন ধারণাই করে উঠতে পারেন নি। যদি বিপদের সংকেত আগেই পাওয়া যেত—তাহলে হয়তো অভিযাত্রীদের বাঁচাবার জন্যে একটা শেষ চেষ্টা করে দেখা যেত, অভিযাত্রীদের আবাসকক্ষরূপী অরবিটারটিকে রকেট ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে। এটা অবশ্য সহজেই বোঝা যায় যে জ্বালানীসমেত ট্যাংকগুলো থেকে অরবিটারকে বিচ্ছিন্ন করলে জ্বালানীর অভাবে ও এমনিতেই অচল হয়ে পড়ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও অরবিটারের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা একটি গ্লাইডারের মত নেমে আসার চেষ্টা করে দেখতে পারত।

১৯৮৬ সালের এপ্রিল মাসে চ্যালেঞ্জারের দুর্ঘটনার ওপর প্রেসিডেন্সিয়াল কমিশনের রিপোর্ট বেরোল। কঠিন জ্বালানীপূর্ণ বুস্টার রকেটটিই ছিল আসল অপরাধী। কিন্তু দুঃখের বিষয়টা ছিল এই, ন্যাসার কর্তৃপক্ষের কাছে এই সম্ভাব্য অচলাবস্থার ব্যাপারটা অজানা ছিল না। রিপোর্টের বক্তব্য ছিল, টেকনিকাল এবং নিরাপত্তামূলক বিবেচনার বিষয়গুলোকে বহু ক্ষেত্রেই গুরুত্ব দেয়া হয় নি। রিপোর্ট ন্যাসা কর্তৃপক্ষকে সরাসরি অভিযুক্ত করে এই কারণে যে স্পেস সাট্‌ল্ পাঠাবার নির্ঘণ্টকে পুরোপুরি মাত্রায় বজায় রাখার জন্যেই তারা নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মারাত্মক গাফিলতির পরিচয় দিয়েছিলেন।

শান্তির জন্যে মহাকাশ

মহাকাশযুগের সূচনা পৃথিবীর মানুষের জীবনে যে কল্যাণকর ভূমিকা গ্রহণ করেছে সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ইতিপূর্বেই করা হয়েছে। মহাকাশকে সম্পূর্ণভাবে শান্তির জন্যেই ব্যবহার করা হোক স্বভাবতই পৃথিবীর সব মানুষই তা চাইবেন। মহাকাশে যুদ্ধের মহড়ার (স্টার ওয়ার) যে পরিকল্পনার কথা আমরা শুনছি, স্বভাবতই আমাদের তা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছে। এই যুদ্ধের মূল নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব থাকবে যে সুপার কম্পিউটারদের হাতে, ওদের কার্যকারিতার জ্বলন্ত নিদর্শন স্পেস সাট্‌ল্ চ্যালেঞ্জারের বিয়োগান্ত পরিণতির মধ্যেই আমরা দেখেছি।

মহাকাশে গোয়েন্দারূপী কৃত্রিম উপগ্রহেরা পৃথিবীকে পরিক্রমা করছে, তা আমরা জানি। পারস্পরিক শক্তিসামর্থ্য সমন্ধে সঠিক ধারণা বজায় রাখার জন্যেই দুই তরফ থেকে এই ব্যবস্থাকে যে কার্যকরী করা হয়েছে তা বোঝা যায়। এজাতীয় প্রচেষ্টা আরো বেশ কিছুকাল ধরেই চলতে থাকবে। আমরা কিন্তু অ্যাপোলো-সইয়ুজ জাতীয় মহাকাশে যুক্ত বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রচেষ্টার পুনরাবৃত্তি দেখতে চাই আরো ব্যাপক বিস্তৃততর কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে। গোটা পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষের সেটাই হল আন্তরিক আকাংখা।

মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বর্তমানে আরো কয়েকটি দেশ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে রয়েছে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, চীন, জাপান প্রভৃতি। এরা প্রত্যেকেই কিছু কিছু কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশে প্রতিষ্ঠাও করেছে।

ইয়োরোপের এগারটি দেশ মিলিতভাবে গঠন করেছে ইয়োরোপীয় মহাকাশ সংস্থা (ইয়োরোপীয়ান স্পেস এজেন্সী)। এরা বাহক রকেটের ভাড়ার বিনিময়ে বিভিন্ন দেশের কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশে প্রতিষ্ঠার কাজও শুরু করেছে। আমেরিকার ন্যাসার এক প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে এরা। স্পেস সাট্‌লের মাল রাখার কক্ষে (কার্গো বে) কৃত্রিম উপগ্রহকে পুরে নিয়ে মহাকাশে প্রতিষ্ঠার জন্যে ন্যাসা যে টাকা নিয়ে থাকে, একই কাজের জন্যে ইয়োরোপীয় মহাকাশ সংস্থার ভাড়ার পরিমাণটা অনেক কম। সে যাই হোক, মহাকাশে এজাতীয় শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতায় আমাদের কোন আপত্তি নেই।

আরো সুদূরে

পৃথিবী ছাড়িয়েও মহাকাশ বিজ্ঞানের কর্মক্ষেত্র আজ সুদূরে প্রসারিত। সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং আমেরিকার বিজ্ঞানীরা শুক্র এবং মঙ্গলগ্রহের জমিতে স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযানেদের নামিয়েছেন। ঐ দুটি গ্রহ সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তথ্য আজ আমাদের আয়ত্তে এসেছে।

আমেরিকার বিজ্ঞানীদের পাঠানো পায়োনীয়ার ও ভয়েজার পর্যায়ের স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযানেরা আরো সুদূরের গ্রহজগত বৃহস্পতি, শনি ও ইউরেনাসের বহু অজানা রহস্যের অবগুণ্ঠনকে মোচন করেছে। এই শতাব্দীর শেষাশেষি পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের এই দূতেরা সৌরজগতের সীমানাকে পেরিয়ে যাবে।

ছায়াপথরূপী যে তারাজগতের আমরা বাসিন্দা এবং এই মহাবিশ্ব গড়ে উঠেছে যে অসংখ্য কোটি তারাজগতের সমবায়ে, সেখানে আমরা যে নিঃসঙ্গ নই, আমাদের মত বুদ্ধিমান সভ্যতা যে আরো অগণিত রয়েছে, বেশির ভাগ বিজ্ঞানীই তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেনা। সেই সব অজানা সভ্যতার অধিকারীদের উদ্দেশ্যে তাঁরা বেতার সংকেত পাঠিয়ে চলেছেন, যদি কোনদিন তার জবাব পাওয়া যায় এই ভরসায়। কবে তাঁদের সে আকাংখা পূরণ হবে জানা নেই। পায়োনীয়ার ও ভয়েজারেরা হল পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের এই আশা আকাংখারই প্রতিমূর্তি।

মহাকাশ বিজ্ঞানের কর্মক্ষেত্রে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা যে সাফল্যকে ইতিমধ্যেই অর্জন করেছেন তা আমাদের সবাইকে অনুপ্রাণিত করেছে। আগামী ভবিষ্যতে মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরো বড় মাপের শান্তিপূর্ণ প্রয়োগকে আমরা প্রত্যক্ষ করব এবং বিভিন্ন দেশের যুক্ত বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রচেষ্টাকে ফলবতী হতে দেখব, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

নির্ঘণ্ট

মহাকাশের অসীম রহস্য চিরদিন পৃথিবীর মানুষকে আকর্ষণ করেছে। কল্পনার রথে চড়ে মানুষ বিচরণ করেছে মহাকাশে, চেতনার প্রতিটি অণুতে উপলব্ধি করতে চেয়েছে তার আনন্দকে। মানুষের ভূমিকা আজ আর কল্পনাশ্রয়ী নয়। এই মহাকাশের সঙ্গে আজ তার অচেছদ্য বৈজ্ঞানিক বন্ধন। মহাকাশকে সে জয় করেছে। মহাকাশের বুক থেকে পৃথিবীর এক নতুন রূপ উদঘাটিত হয়েছে তার কাছে, অনেকদিনের চেনা পৃথিবী আজ রূপে রসে বর্ণে অতুলনীয়া হয়ে উঠেছে।

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অকটোবর থেকে পৃথিবীর জল, মাটি এবং বায়ুমণ্ডলের বাইরে মহাকাশে মানুষের যে অভিযান শুরু হয়েছিল তার ধারাবাহিক বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক কাহিনী হল 'মহাকাশের কথা' গ্রন্থের উপজীব্য।

লেখক শঙ্কর চক্রবর্তীর পঠন-পাঠন, পরীক্ষা নিরীক্ষা ও ব্যবহারিক কাজের ক্ষেত্র হল বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক প্রযুক্তিবিদ্যা। তবে যে পরিচয়ে সুদীর্ঘ ৩২ বছর ধরে দেশের অগণিত মানুষের সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগাযোগ, তা হল বিজ্ঞানকে জনপ্রিয়ভাবে সাধারনের দরবারে পৌঁছে দেয়া এবং বৈজ্ঞানিক মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী গড়ার এক নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা। স্লাইড যোগে বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও বই লেখা, আকাশবাণী ও দূরদর্শনের অনুষ্ঠান, সমাজ সচেতনশীল বিজ্ঞান ক্লাব ও সংগঠন গড়ার পেছনে প্রেরণা যোগানো-ন্যনা মাধ্যমে তিনি কাজ করে চলেছেন। তাঁর বয়স এখন প্রায় ছাপ্পান্ন। আরো সুদীর্ঘকালব্যাপী বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল ও গঠনমূলক কাজ করার পরিকল্পনা ও উৎসাহ উদ্দীপনা তাঁর অক্ষুন্ন রয়েছে।

তিরিশ টাকা

বেস্টবুক্‌স্

১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০ ০০৯